আলেক্সান্দর বেলায়েভ

উভচর মানুষ

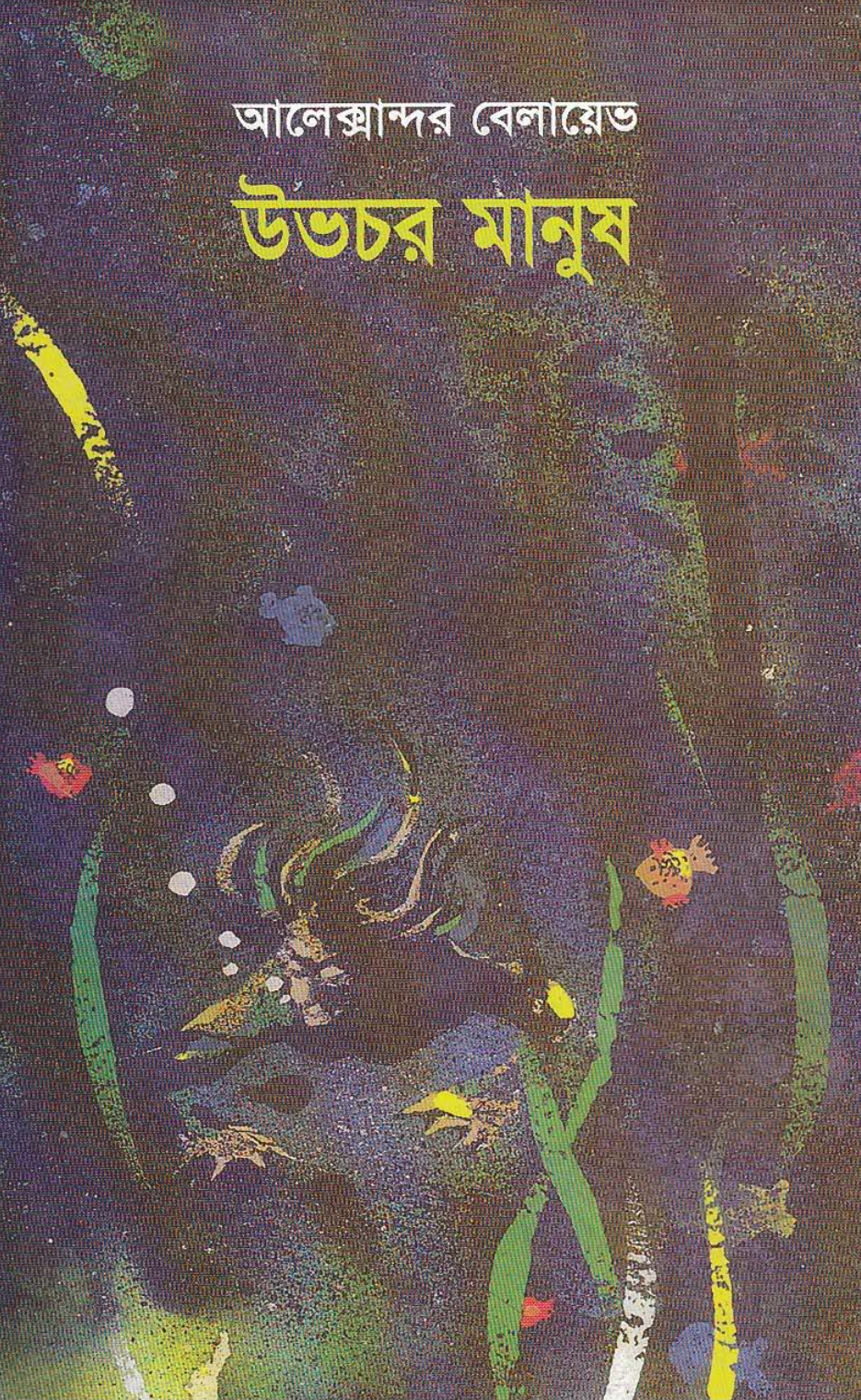

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

আলেক্সান্দর বেলায়েভ

উভচর মানুষ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১০১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

অনুবাদ
ননী ভৌমিক

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪০০ ডিসেম্বর ১৯৯৩

চতুর্থ সংস্করণ দশম মুদ্রণ
কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলঙ্করণ
গ. ইউদিন

মূল্য
দুইশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0100-x

আলেক্সান্দর বেলায়েভ ও উভচর মানুষ

জেলেদের মুখে মুখে কেবলই 'দরিয়ার দানো'র কথা : 'দরিয়ার দানো' দেখা দিয়েছে সমুদ্রের খাঁড়িতে। ডলফিনের পিঠে চেপে সে ছোটে, শঙ্খ বাজিয়ে নিজের আগমন জানায়। জাল টেনে নিয়ে যায়, জাহাজ-ভর্তি মাছ ছেড়ে দেয়, কখনো কখনো উদ্ধার করে ডুবন্তদের...কী সেই বিস্ময়ের জন্তু 'দরিয়ার দানো', যে জলে আর ডাঙায় খুব সহজেই চরে বেড়ায়!

রুশ কল্প-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ আলেক্সান্দর বেলায়েভের এক অপরূপ সৃষ্টি দুর্দান্ত তরুণ ইকথিয়ান্ডর বা 'মৎস্যকুমার'। সমুদ্রতলের অফুরান জগতকে জানার এবং মানুষের বাস করার স্বপ্ন দেখেছেন লেখক। উপন্যাসে ড. সালভাতরকে দিয়ে তা অনেকটা বাস্তব বলে প্রমাণের চেষ্টাও করেছেন।

লেখকের ধারণা ছিল, মানুষ মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার প্রথম দিকে জলে-ডাঙায় দু'জায়গাতেই অবাধে বিচরণ করত। তখন মানুষ ছিল উভচর। এ-ধারণার ওপর ভিত্তি করেই লেখক এই বিখ্যাত উপন্যাসটি লিখেছেন। বেলায়েভের এ-ধারণা যে ভ্রান্ত নয় তা মাত্র এক দশক আগে ড. মরগ্যানের এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অনেকটাই প্রমাণিত হয়েছে। ব্রিটেনের বিজ্ঞানী ড. এ্যালাইন মরগান তাঁর তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেছেন—এখন যেখানে আফ্রিকা মহাদেশ ত্রিশ থেকে নব্বই লক্ষ বছর আগে সেখানে সমুদ্রঘেরা ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ ছিল। তুষার যুগের শেষে বরফ যখন গলতে থাকে তখন অনেক স্থলভাগই সমুদ্র গ্রাস করে নিয়েছিল এবং অনেক জায়গায় খুব ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছিল। বনমানুষদের মধ্যে যারা এসব দ্বীপে আটকে পড়েছিল, তাদের বিবর্তন হতে লাগল একটু ভিন্নভাবে। ব্যাঙ আর কুমিরদের মতো এরাও হয়ে উঠল উভচর প্রাণী। ড. মরগানের এ-তত্ত্ব সম্পর্কে লেখক জানতেন না—কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানপ্রসূত চিন্তা-চেতনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক কল্পনার উভচর মানুষ।

খুব ছোটবেলা থেকেই বেলায়েভের ঝোঁক নানা রঙের স্বপ্ন দেখার প্রতি। লেখকের ইচ্ছে হতো মানুষ পাখির মতো উড়ুক। চেষ্টা করে দেখতে গিয়ে ছাদ থেকে লাফ দিলেন, মেরুদণ্ড ভাঙল তাঁর। তিনি ভেবেছিলেন ওটা সেরে গেছে। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়সে দেখা দিল অস্থি'র ক্ষয়-রোগ। সারাটা জীবন এই কাল-ব্যাধি তাঁকে ছাড়ে নি। যারা যান তিনি ১৯৪২ সালের জানুয়ারিতে। বছরের পর বছর শয্যাশায়ী থাকলেও দুর্দমনীয় এই জীবনবাদী মানুষটি অনেক অনেক বই লিখে গেছেন, রোমান্টিক কল্পনা আর বৈজ্ঞানিক দুঃসাহসে যা স্পর্ধিত।

আলেক্সান্দর বেলায়েভের জন্ম ১৮৮৪ সালে। আইন এবং সঙ্গীতের ছাত্র ছিলেন তিনি। অস্বচ্ছল সংসার এবং লেখাপড়ার খরচ মেটানোর জন্য বেলায়েভ বাজনা বাজাতেন অর্কেস্ট্রায়, রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট আঁকতেন, সাংবাদিকতা করতেন। আইনবিদ হওয়ার পরেও এই শেষ পেশাটি তিনি ছাড়েন নি। ১৯২৫ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্যে। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পোপন্যাস 'প্রফেসর ডোয়েলের মস্তক'। খুব দ্রুতই বিখ্যাত হয়ে পড়েন তিনি। এরপর একে একে 'উভচর মানুষ', 'জাহাজ-ডুবির দ্বীপ', 'শূন্যে ঝাঁপ' ইত্যাদি বই প্রকাশিত হয়। চিকিৎসাবিদ্যা, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, মহাকাশ অভিযানের নানা সমস্যা নিয়ে অর্ধশতাধিক বই লিখে গেছেন তিনি, যেগুলো বিজ্ঞান-মনস্ক পাঠকের কাছে আজও সমাদৃত।

রবিশঙ্কর মৈত্রী
৩৩ রূপচাঁন দাস লেন, ঢাকা।

অনুবাদ

ননী ভৌমিক

প্রথম অংশ

দরিয়ার দানো

জানুয়ারিতে আর্জেন্টিনার গ্রীষ্মের গুমোট রাত। কালো আকাশ ছেয়ে গেছে তারায়। শান্তভাবে নোঙর ফেলে আছে 'জেলি-মাছ' জাহাজ। জলের ছলাৎ বা মাস্তুলের ক্যাঁচক্যাঁচানি কিছুই নেই, নিঝুম রাত। মনে হয় গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে মহাসাগর।

ডেকে শুয়ে আছে অর্ধনগ্ন মুক্তো-সন্ধানীরা। কাজের চাপ ও প্রচণ্ড রোদে অবসন্ন তারা ঘুমের মধ্যেই এপাশ-ওপাশ করছে, চেঁচিয়ে উঠছে। থেকে থেকে চমকে উঠছে হাত-পা। স্বপ্নে হয়তো দেখেছে তাদের দুশমন কোনো হাঙর। নির্বাত এই তপ্ত দিনগুলোয় ওরা এতই ক্লান্ত যে নৌকাগুলোকেও ডেকে তোলে নি। তবে তার দরকারও ছিল না, আবহাওয়া বদলাবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি, নোঙরের শেকলে বেঁধে তাদের জলেই রেখে দেওয়া হয়েছে। পালটাল কিছুই কষে বাঁধা হয় নি, সামান্য বাতাসেই তিরতিরিয়ে কেঁপে উঠছে সামনের মাস্তুলের তেকোণা পালটা। ডেকের প্রায় সবটা জুড়ে ঝিনুকের স্তূপ, ভাঙা প্রবালের চুনাপাথর, ডুবুরির দড়ি, ঝিনুক জমাবার ক্যানভাসের বস্তা আর ফাঁকা পিপে ছড়ানো।

মিজেন মাস্তুলের কাছে ছিল একটা পানীয় জলের প্রকাণ্ড পিপে, তাতে শেকলে বাঁধা একটা লোহার মগ। পিপেটার আশেপাশে জল পড়ে কালো দাগ ফুটেছে।

থেকে থেকেই এক-একজন ডুবুরি উঠে আধ-ঘুমে টলতে টলতে ঘুমন্তদের মাড়িয়ে জল খাবার জন্য যাচ্ছিল পিপেটার কাছে। চোখ বুজেই এক মগ জল খেয়ে যেখানে পারছিল লুটিয়ে পড়ছিল, যেন জল নয় কড়া মদ খেয়েছে। তৃষ্ণায় এরা সবাই পীড়িত। সকালে কাজে যাবার আগে এরা খেত না, ভরা পেটে জলের তলে চাপ পড়ে ভয়ানক বেশি, জলের তলে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সারা দিন খালি পেটে থেকে খাওয়া সারত কেবল ঘুমের আগে। আর সে খাদ্যও ছিল নোনা মাংস।

রাতে ডিউটি দিচ্ছিল রেড-ইন্ডিয়ান বালতাজার। জাহাজের মালিক ক্যাপটেন পেদ্রো জুরিতার ডান হাত ছিল সে।

জোয়ান কালে বালতাজারের নাম ছিল মুক্তো সংগ্রহের জন্য। জলের নিচে সে থাকতে পারত নব্বই কি একশ' সেকেন্ড—সাধারণ ডুবুরির তুলনায় সময়টা দ্বিগুণ।

'কেমন করে? কেননা আমাদের কালে এ বিদ্যে কী করে শেখাতে হয় তা লোকে জানত আর শেখানো শুরু হত একেবারে ছেলেবেলা থেকেই'—জোয়ান ডুবুরিদের বলত বালতাজার। 'আমার বয়স যখন দশ, তখন বাবা আমায় শেখাতে পাঠায় হোসের কাছে, পাল-তোলা একটা জাহাজ ছিল তার। চেলা ছিল তার বারো জন। করত কি, জলে একটা সাদা ঢিল কি ঝিনুক ছুড়ে দিয়ে বলত : 'তুলে নিয়ে আয়!' প্রতিবার ছুড়ত আরেকটু বেশি গভীরে। না পারলে দু'এক ঘা চাবুক কষে কুকুর ছোড়ার মতো করে ছুড়ে ফেলত: 'ফের তুলে আন!' এভাবেই শেখাত আমাদের। তারপর শেখাতে লাগল কীভাবে জলের তলে

থাকতে পারি বেশিক্ষণ। পাকা ডুবুরি জলে নেমে গিয়ে নোঙরের সঙ্গে ঝুড়ি কি জাল বেঁধে রাখত। পরে ডুব দিয়ে তা খুলতে হত আমাদের। না খোলা পর্যন্ত ওপরে ওঠা চলবে না। উঠলেই বেত। 'মারত আমাদের মায়া দয়া না করে। অনেকেই টিকতে পারে নি। তবে এলাকার পয়লা নম্বরের ডুবুরি হয়ে উঠি আমি। ভালোই রোজগার করতাম।'

বয়স হতে বিপজ্জনক পেশাটা তাকে ছাড়তে হয়। বাঁ পাটা তার হাঙরের কামড়ে বিকৃত হয়ে যায়। পাশটা ছেঁচড়ে যায় নোঙরের শেকলে। বুয়েনাস-আইরেসে তার একটা ছোট দোকান ছিল। মুক্তো, প্রবাল, ঝিনুক আর সামুদ্রিক নানা বিরল দ্রব্যের ব্যবসা করত সে। কিন্তু ডাঙায় তার মন লাগত না। তাই প্রায়ই মুক্তো সংগ্রহের অভিযানে যোগ দিত। কারবারিরা কদর করত ওকে। লা-প্লাতা উপসাগর, তার উপকূল, কোন্ কোন্ জায়গায় মুক্তো পাওয়া যায় তা ওর মতো আর কেউ জানত না। ডুবুরিরাও সম্মান করত তাকে। ডুবুরি, মালিক—সবাইকেই খুশি রাখতে পারত সে।

তরুণ ডুবুরিদের সে পেশাটার আঁৎঘাৎ শেখাত—কী করে দম রাখতে হয়, ঠেকাতে হয় হাঙরের আক্রমণ এবং মেজাজ শরীফ থাকলে, কর্তার কাছ থেকে কোনো একটা দামী মুক্তা লুকিয়ে রাখতে হয় কীভাবে সেটাও।

মনিবেরা তার কদর করত এই জন্য যে এক নজরেই সে মুক্তার সঠিক দাম বলে দিত, সেরা মুক্তা বেছে দিতে পারত। সেই জন্যই সহকারী হিশেবে মনিবেরা তাকে সঙ্গে নিত সাগ্রহেই।

একটা পিপের ওপর বসে বসে মোটা একটা চুরুট টানছিল বালতাজার। মাস্তুলে ঝোলানো একটা লণ্ঠন থেকে আলো পড়ছিল তার মুখে। মুখখানা তার লম্বাটে, গালের হাড় উঁচু নয়, তরতরে নাক, সুন্দর চোখ—টিপিক্যাল আরাউকানি রেড-ইন্ডিয়ানের মুখ। বালতাজারের চোখের পাতা ঢুলে আসছিল। কিন্তু চোখ তার ঘুমলেও কান নয়। সজাগ তার দুই কান গভীর ঘুমের মধ্যেও বিপদের আঁচ পায়। কিন্তু এখন বালতাজার শুনছিল কেবল ঘুমন্তদের নিশ্বাস ফেলার শব্দ আর অস্ফুট বিড়বিড়ানি। তীর থেকে ভেসে আসছিল ঝিনুকের পচা গন্ধ—ঝিনুকগুলোকে প্রথমে পচতে দেওয়া হয়, তাতে খোলা ছাড়ানো সহজ হয়। অনভ্যস্ত লোকের কাছে গন্ধটা অসহ্য ঠেকবে, কিন্তু বালতাজারের কাছে বোধ হয় তা উপাদেয়ই লাগে।

মুক্তা বাছাইয়ের পর বড়ো বড়ো ঝিনুকগুলো নিয়ে আসা হয় জাহাজে। জুরিতা হিশেবি লোক, ঝিনুক সে বেচে দিত কারখানায়, তা থেকে বোতাম তৈরি হত।

ঘুমচ্ছিল বালতাজার, শিথিল আঙুল থেকে খসে পড়ল চুরুট। মাথা নুয়ে পড়ল বুকের ওপর।

কিন্তু চেতনায় ওর কী একটা শব্দ এসে পৌছল সুদূর থেকে। শব্দটা আবার হল একটু কাছে। চোখ মেলল বালতাজার। মনে হল কে যেন শাঁখ বাজাল, মানুষের মতো একটা তরুণ কণ্ঠস্বর বলে উঠল 'আ-!' তারপর ফের আরেকটু চড়ায় 'আ-আ!'

শাঁখের সুরেলা শব্দটা মোটেই জাহাজের খনখনে বাঁশির মতো নয়, গলার আওয়াজটাও এমন নয় যেন ডুবন্ত মানুষ সাহায্য চাইছে। কেমন একটা নতুন, অজানা আমেজ তাতে। উঠে দাঁড়াল বালতাজার, সঙ্গে সঙ্গেই চাঙ্গা হয়ে উঠল। ধারে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল সমুদ্রে। কোনো লোক নেই কোথাও। পা দিয়ে সে খোঁচাল একজন ঘুমন্ত রেড-ইন্ডিয়ানেকে।

"চেঁচাচ্ছে। নিশ্চয় ও-ই...'

কই শুনছি না তো'—সমান আস্তেই বলল গুরোনা জাতের রেড-ইন্ডিয়ানটা, হাঁটু গেড়ে সে কান পেতে ছিল। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে পড়ল শাঁখের শব্দ আর চিৎকারে :

'আ-আ!...'

শুনেই গুরোনা কুঁকড়ে গেল, যেন বেতের ঘা খেয়েছে।

'হ্যাঁ, নিশ্চয় ও-ই'—ভয়ে দাঁত ঠকঠক করে বলল গুরোনা।

অন্য ডুবুরিরাও জেগে উঠল। ছেঁচড়ে গেল তারা লণ্ঠনের আলোটার দিকে, যেন অন্ধকার থেকে ওই হলদেটে ক্ষীণ আলোটাই তাদের বাঁচাবে। উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পেতে বসে রইল সবাই ঘেঁষাঘেষি করে। শাঁখ আর গলার আওয়াজ আরেকবার শোনা গেল অনেক দূরে, তারপর মিলিয়ে গেল।

'ও-ই...'

'দরিয়ার দানো'—ফিসফিস করল জেলেরা।

'এখানে আর আমাদের থাকা চলে না!;

'হাঙরের চেয়েও ও সাঙ্ঘাতিক!'

'কর্তাকে ডাকা হোক!'

খালি পায়ের খসখসানি উঠল। হাই তুলতে তুলতে, রোমশ বুকে হাত বুলাতে বুলাতে ডেকে এসে দাঁড়াল মনিব পেদ্রো জুরিতা। গায়ে জামা নেই, পরনে ক্যানভাস প্যান্ট, বেল্ট থেকে ঝুলছে রিভলবারের খাপ। লোকগুলোর দিকে এগিয়ে এল সে। আলো পড়ল তার ঘুম-ঘুম রোদ-পোড়া ব্রোঞ্জ-রঙা মুখে, কপালের ওপর এসে পড়া কোঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলে, কালো ভুরু, ওপর দিকে একটু তোলা মোচ আর পাকন্ত ছাগলদারির ওপর।

'হল-টা কী?'

তার কর্কশ, অবিচল কণ্ঠস্বর আর সুনিশ্চিত দেহভঙ্গিতে শান্ত হয়ে এল রেড-ইন্ডিয়ানরা। একসঙ্গেই কথা বলতে শুরু করল সবাই।

হাত তুলে ওদের থামিয়ে বালতাজার বলল :

'আমরা ওর আওয়াজ শুনলাম, 'দরিয়ার দানো'র।'

'স্বপ্ন!' নিদ্রালুভাবে মাথা নেতিয়ে বলল পেদ্রো।

'না, স্বপ্ন নয়, সবাই আমরা 'আ-া!' হাঁক আর শাঁখের আওয়াজ শুনেছি!' সমস্বরে বলে উঠল ডুবুরিরা।

হাত তুলে ফের ওদের থামিয়ে বালতাজার বলল :

'আমি নিজে শুনেছি। ওভাবে শাঁখ বাজাতে পারে কেবল 'দানো'। সমুদ্রে ওভাবে কেউ শাঁখও বাজায় না, হাঁকও দেয় না। শিগগির এখান থেকে সরে পড়া দরকার।'

'গাঁজাখুরি'—সমান আলস্যে জবাব দিল পেদ্রো। তীরে এখনো ঝিনুকগুলো সব পুরো পচে ওঠে নি। সেগুলো জাহাজে এনে নোঙর তোলার কোনো ইচ্ছেই ছিল না তার। কিন্তু ডুবরিদের বোঝানো গেল না। উত্তেজিত হয়ে উঠল তারা, হাত নেড়ে চেঁচাতে লাগল, হুমকি দিলে জাহাজ না ছাড়লে কালই তারা তীরে গিয়ে পায়ে হেঁটে বুয়েনাস-আইরেসে রওনা দেবে।

'ঠিক আছে, চুলোয় যা তোরা আর তোদের এই 'দানো'! কাল ভোরেই নোঙর তোলা হবে'—বলে গজ গজ করতে করতে ক্যাপটেন চলে গেল তার কেবিনে।

ঘুম আর টুটে গিয়েছিল। বাতি জ্বালিয়ে চুরুট ধরিয়ে সে ছোট কেবিনটায় পায়চারি শুরু করল। এই যে দুর্বোধ্য একটা প্রাণী অল্প কিছুদিন হল এখানকার সাগরে দেখা দিয়েছে, ডুবুরিদের আর উপকূলের বাসিন্দাদের ভয় পাওয়াচ্ছে, তারই কথা ভাবছিল সে।

কেউ তাকে দেখেনি, সে কিন্তু তার জানানি দিয়ে গেছে বেশ কয়েকবার। কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে তাকে নিয়ে। ফিসফিস করে তা বলাবলি করত নাবিকেরা, চারপাশে তাকাত ভয়ে ভয়ে যাতে কথাগুলো দানোর কানে না যায়।

প্রাণীটা কারো-বা ক্ষতি করেছে, আবার অপ্রত্যাশিত উপকারও করেছে কারো কারো। বুড়ো রেড-ইন্ডিয়ানরা বলত, 'উনি সমুদ্রের দেবতা, হাজার বছরে একবার করে উনি সমুদ্রের গভীর থেকে উঠে আসেন দুনিয়ায় ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে।'

ক্যাথলিক পাদ্রিরা সংস্কারাচ্ছন্ন স্পেনীয়দের বোঝাত, ওটা 'দরিয়ার দানো'। লোকে পবিত্র ক্যাথলিক গির্জাকে ভুলে যাচ্ছে বলে ও দেখা দিতে শুরু করেছে।

মুখে মুখে ছড়ানো এইসব গুজব বুয়েনাস-আইরেস পর্যন্ত পৌঁছয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে 'দরিয়ার দানো' হয়ে উঠল বাজারি কাগজগুলোর প্রিয় প্রসঙ্গ। অজ্ঞাত কারণে কোনো জাহাজ কি জেলেডিঙি ডুবলে, জাল ছিঁড়লে কি ধরা মাছ হাতছাড়া হলে তা সবই 'দরিয়ার দানো'র কীর্তি বলে ধরা হত। কেউ কেউ আবার বলত যে, 'দানো' মাঝে মাঝে জেলেডিঙিতে বড়ো বড়ো মাছ ছুড়ে দিয়েছে, এমনকি ডুবন্ত লোককেও একবার বাঁচিয়েছে।

অন্তত একজন হলপ করে বলল যে, একবার যখন সে ডুবছিল তখন তল থেকে কে যেন তাকে ঠেলে তুলে তীর পর্যন্ত সাঁতরে নিয়ে আসে, আর উদ্ধার পেয়ে সে যখন বালিতে পা দিয়েছে, তক্ষুণি তা অদৃশ্য হয়ে যায় তরঙ্গভঙ্গে।

তবে সবচেয়ে তাজ্জবের কথা যে, 'দানো'কে কেউ স্বচক্ষে দেখে নি। কেমন সে দেখতে তা জানা গেল না। অবশ্যি এমন লোকও ছিল বৈকি যারা বলল 'দানো'র মাথায় শিঙ আর ছাগলেদাড়ি আছে, সিংহের মতো তার থাবা মাছের মতো লেজ, কেউ বলল তা মানুষের মতো পা সমেত শিঙওয়ালা এক প্রকাণ্ড কোলাব্যাঙের মতো দেখতে।

বুয়েনাস-আইরেসের সরকারি কর্মকর্তারা প্রথমে এসব গুজবে কোনো কান দেয় নি। আলোড়ন কিন্তু ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল বিশেষ করে জেলেদের মধ্যে। অনেক জেলেই সমুদ্রে যেতে ভয় পেলে, মাছ ধরা কমে গেল, টান পড়ল অধিবাসীদের খাবারে। তখন কর্মকর্তারা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবে ঠিক করলে। কয়েকটা স্টিমার আর পুলিশি মোটরলঞ্চ পাঠানো হল উপকূল বরাবর, হুকুম হল, 'যে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি উপকূলবাসীদের মধ্যে গোলমাল ও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

দু'সপ্তাহ সারা লা-প্লাতা উপসাগর তল্লাশ করে বেড়াল পুলিশ, মিথ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বলে কিছু রেড-ইন্ডিয়ানকে আটক করল, কিন্তু 'দরিয়ার দানো'কে ধরা গেল না।

পুলিশ-কর্তা সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল যে, 'দরিয়ার দানো' বলে কেউ নেই, সবই কিছু অজ্ঞলোকের রটনা, তারা ধরা পড়েছে, যথাযোগ্য শাস্তি তারা পাবে, জেলেরা যেন গুজবে বিশ্বাস না করে মাছ ধরায় মন দেয়।

কিছুকাল কাজ হল তাতে। কিন্তু 'দানো'র ফষ্টিনষ্টি থামল না।

একদিন রাত্রে তীর থেকে অনেক দূরের এক ডিঙিতে জেলেরা জেগে উঠল ছাগলছানার ডাকে, কী করে ওটা ওখানে পৌঁছল বোঝা গেল না। আরেক দল জেলে জাল টেনে তুলে দেখল তা একেবারে কাটা।

'দানো'র নবোদয়ে উল্লসিত হয়ে সাংবাদিকরা এবার বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা চাল।

বিজ্ঞানীরা বললেন, শুধু মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তেমন কাজ করতে পারে বলে কোনো সামুদ্রিক জীবের কথা বিজ্ঞান জানে না। 'স্বল্প বিদিত অতি গভীর কোনো সমুদ্রে তা দেখা দিলেও নয় কথা ছিল'—লিখলেন তাঁরা, তাহলেও সেরূপ জীবের পক্ষে বুদ্ধিমত্ত কাজ করা সম্ভব বলে তাঁরা মানতে পারলেন না। পুলিশ-কর্তার সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও স্থির করলেন ওটা কোনো বখাটের কারসাজি।

তবে সব বিজ্ঞানীই তা ভাবেন নি।

তাঁর ষোড়শ শতকের বিখ্যাত জার্মান প্রকৃতিবিদ কনরাড হেসনারের নজির দিলেন—ইনি সাগরকুমারী, সামুদ্রিক দানব, সামদ্রিক সাধু ও সামুদ্রিক বিশপের বিবরণ দিয়ে গেছেন।

'নব বিজ্ঞান স্বীকার না করলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পণ্ডিতেরা যা লিখে গেছেন তা অনেক কিছুই তো শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ঐশ্বরিক সৃষ্টির ভাণ্ডার অফুরন্ত, তাই সিদ্ধান্ত টানার ব্যাপারে অন্য সবার চাইতে আমাদের বিজ্ঞানীদেরই সংযম ও সতর্কতার প্রয়োজন বেশি'—লিখলেন প্রাচীনপন্থী কিছু বৈজ্ঞানিক।

তবে সংযত ও সতর্ক এই লোকদের বিজ্ঞানী বলা মুশকিল। বিজ্ঞানের চেয়ে অলৌকিকে তাঁদের বিশ্বাস ছিল বেশি, অধ্যাপনাটা হত আরাধনার মতো।

বিতর্কের মীমাংসার জন্য শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত হল।

'দানো'র দেখা অভিযানীরা পেলেন না, কিন্তু 'অজ্ঞাত ব্যক্তির' আচরণ সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন খবর তাঁরা জানলেন (প্রাচীনপন্থী বিজ্ঞানীরা জিদ ধরেছিলেন যে 'ব্যক্তির' জায়গায় 'প্রাণী' বসানো হোক)।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁদের রিপোর্টে অভিযানীরা লিখলেন :

১. কোনো কোনো স্থানে আমরা বালুচরে মানুষের সংকীর্ণ পায়ের ছাপ দেখেছি। সমুদ্রের দিক থেকে এসে আবার তা সমুদ্রে ফিরে গেছে। তবে নৌকো করে আসা লোকেও তীরে এরূপ চিহ্ন রেখে যেতে পারে।

২. কাটা জাল যা দেখেছি তা শুধু ধারালো কর্তনযন্ত্রেই সম্ভব। এটা সম্ভব যে ডুবো পাথর কি ডুবো জাহাজের ভাঙা লোহালক্কড়ে লেগে তা ছিঁড়েছে।

৩. প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে যে ঝড়ে জল থেকে অনেক দূরে এক ডলফিন তীরে নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রে কেউ তাকে আবার জলে টেনে নিয়ে আসে, বালিতে বড়ো বড়ো নখওয়ালা পায়ের দাগ দেখা গেছে। নিশ্চয় ওটা কোনো সহৃদয় জেলের কাজ।

আমরা জানি যে মাছ শিকার করতে গিয়ে ডলফিন মাছগুলোকে অগভীর জলে তাড়িয়ে এনে জেলেদের সাহায্য করে থাকে। জেলেরাও প্রায়ই ডলফিনদের বিপদ থেকে বাঁচায়। নখের চিহ্ন বলে যা মনে হয়েছিল তা মানুষের পায়ের আঙুল থেকেও হওয়া সম্ভব। কল্পনায় তা নখ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. কোনো রগুড়ে লোক সম্ভবত ছাগলছানাটিকে নৌকো করে এনে জেলেডিঙিতে অলক্ষে চালান করে দিয়ে থাকবে।

'দানো'র ফেলে যাওয়া চিহ্নের এমনি সহজ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের আরো অনেক ছিল। এই সিদ্ধান্তে তাঁরা এলেন যে, এত সব জটিল কাণ্ড করা কোনো সামদ্রিক দানবের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহলেও সবাই এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হল না। এমনকি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কারো কারো কাছে তা সংশয়ভাজন বলে মনে হল। ক্ষিপ্র ও ধূর্ত কোনো লোক এত সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে অথচ এতদিনেও লোকের চোখে পড়ল না তা হয় কী করে? তাছাড়া বড়ো কথা, 'দানো' অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একান্ত দূরদূর সব জায়গায় তার কীর্তি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। হয় অসাধারণ দ্রুতবেগে সে সাঁতরাতে পারে, নয় তার বিশেষ কোনো একটা যন্ত্র আছে, অথবা 'দানো' সংখ্যায় এক নয়, একাধিক। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কাণ্ডগুলো আরো দুর্বোধ্য ও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

পায়চারি করতে করতেই পেদ্রো জুরিতা এই প্রহেলিকার কথাটা ভাবছিল। খেয়াল ছিল না কখন ভোর হয়ে গেছে, গবাক্ষে এসে পড়েছে গোলাপি কিরণ। আলো নিবিয়ে সে মুখ হাত ধুতে লাগল।

মাথায় গরম জল ঢালার সময় ডেক থেকে ভয়ার্ত চিৎকার কানে এল তার। প্রক্ষালন শেষ না করেই পেদ্রো দ্রুত উঠল সিঁড়ি বেয়ে।

ক্যানভাসের নেংটি পরা ডুবুরিরা জাহাজের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে চিৎকার করছিল এলোমেলো। নিচে তাকিয়ে পেদ্রো দেখলে যে রাতে বেঁধে রাখা নৌকোগুলো সব খোলা, রাতের হাওয়ায় তা সমুদ্রে অনেক দূর ভেসে গিয়েছিল। এখন আবার উল্টো হাওয়ায় ধীরে ধীরে আসছে তীরের দিকে। দাঁড়গুলো ভাসছে চারদিকে ছড়িয়ে।

নৌকোগুলো জুটিয়ে আনার হুকুম দিলে পেদ্রো। কিন্তু ডুবুরিরা কেউ নড়ল না। ফের হুকুম দিতে কে যেন বলে উঠল :

'ইচ্ছে হয় নিজেই যাও 'দানো'র খাবার মধ্যে।'

রিভলবারের খাপে হাত দিলে পেদ্রো। ডুবুরিরা সরে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়াল মাস্তুলের কাছে, হিংস্রের মতো চাইল জুরিতার দিকে। মনে হল এই বুঝি সংঘাত বাধে। কিন্তু বাধা দিলে বালতাজার। বলল :

'আরাউকানিরা কিছুতেই ডরায় না, হাঙরের পেটে যায় নি, 'দানো'ও আমার বুড়ো হাড় ছোঁবে না'—বলে দুই হাত মাথার উপর জোড় করে ঝাঁপ দিল জলে, 'সাঁতরে গেল কাছের নৌকোটার দিকে। ডুবুরিয়া রেলিংয়ের কাছে এসে সভয়ে দেখতে লাগল তাকে। জখম পা আর বয়স সত্ত্বেও সাঁতরাল সে খাসা। কয়েকবার হাত নেড়েই সে নৌকোটার কাছে পৌঁছে গেল, ভাসন্ত একটা দাঁড় তুলে নিয়ে উঠে বসল নৌকোয়। চেঁচিয়ে বলল:

'দড়িটা ছুরি দিয়ে কাটা। দিব্যি কেটেছে, যেন ক্ষুর!'

বালতাজার কোনো বিপদে পড়ল না দেখে কয়েকজন ডুবুরিও এবার সাহস করে জলে ঝাঁপাল।

ডলফিনের পিঠে

সবে সূর্য উঠেছে, কিন্তু তার মধ্যেই কাঠফাটা হয়ে উঠেছে রোদ্দুর। রুপোলি-নীল আকাশে মেঘ নেই এক ফোঁটা, সাগর নিশ্চল। 'জেলি-মাছ' জাহাজ এসে পড়েছে বুয়েনাস-আইরেসের বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে। বালতাজারের পরামর্শে নোঙর ফেলা হয় জল থেকে দুই সারিতে সোজা ওঠা দুই পাহাড়ের মাঝখানে খাঁড়িতে।

নৌকোগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। প্রথামতো প্রতিটি নৌকোয় লোক ছিল দু'জন : একজন ডুবত, অন্যজন তাকে টেনে তুলত। তারপর ভূমিকা বদলাত তারা।

একটা নৌকো তীরের বেশ কাছে এসে পড়েছিল। দড়ির প্রান্তে বাঁধা বড়ো এক খণ্ড প্রবাল-ঝামা পায়ে আঁকড়ে ডুবুরি তরতরিয়ে নেমে গেল নিচে।

জল ছিল তপ্ত, স্বচ্ছ—জলতলের প্রতিটি পাথর দেখা যাচ্ছিল। তীরের কাছে সমুদ্রতল থেকে আরো প্রবাল উঠেছে যেন নিথর হয়ে আসা সামুদ্রিক বাগানের ঝাড়। সোনালি-রুপোলি ঝলক দেওয়া ছোটো ছোটো মাছ চরে বেড়াচ্ছিল তাদের মধ্যে।

একেবারে তলে নেমে ডুবুরি চটপট ঝিনুক তুলে কোমরে বাঁধা থলিটায় ভরছিল। তার দোসর, গুরোনা জাতের রেড-ইন্ডিয়ান দড়ির অন্য প্রান্তটা ধরেছিল উপরে, আর ঝুঁকে চেয়েছিল জলের দিকে।

হঠাৎ সে দেখলে ডুবুরি প্রাণপণে লাফিয়ে উঠল পায়ের ওপর, দড়ি ধরে এমন হ্যাঁচকা টান দিল যে সে প্রায় উল্টে পড়ছিল। দুলে উঠল নৌকা। গুরোনা তাড়াতাড়ি জল থেকে টেনে তুলে নৌকোয় চাপাল ডুবুরিকে। মুখ হাঁ করে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছিল সে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কালচে-ব্রোঞ্জ মুখখানা হয়ে উঠেছে ধূসর।

'হাঙর?'

কোনোই জবাব না দিয়ে ডুবুরি টলে পড়ল নৌকোর খোলে।

কিসে এত ভয় পেল সে? জলের দিকে নজর করতে লাগল গুরোনা। হ্যাঁ, সত্যিই কী যেন গোলমাল হয়েছে ওখানে। চিল দেখে ভয় পাওয়া পাখির মতো ছোটো-ছোটো মাছগুলো দ্রুত গিয়ে লুকিয়ে পড়ছে ঘন সামগ্রিক উদ্ভিদের ফাঁকে।

হঠাৎ যেন ডুবো পাহাড়ের ওপাশ থেকে লালচে ধোঁয়ার মতো কী একটা তার চোখে পড়ল। ধীরে ধীরে ধোঁয়াটা চারদিকে পড়ে গোলাপি করে তুলল জলটা। সঙ্গে সঙ্গেই কালচে কী একটা দেখা গেল—ওটা একটা হাঙরের গা। ধীরে ধীরে ঘুরে গিয়ে তা পাহাড়ের ওপাশে অদৃশ্য হল। জলতলের রক্তিম ধোঁয়াটা শুধু রক্ত হওয়াই সম্ভব। ব্যাপারটা কী? সঙ্গীর দিকে চাইল গুরোনা, কিন্তু চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে খোলে, মুখ হাঁ করে নিশ্বাস টানছে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। গুরোনা দাঁড় টেনে তাড়াতাড়ি তার অসুস্থ সঙ্গীকে নিয়ে এল জাহাজে।

শেষ পর্যন্ত আত্মস্থ হল ডুবুরি, কিন্তু বাকশক্তি যেন তার চলে গিয়েছিল, শুধু গোঁ গোঁ করল, মাথা নাড়াল, ঠোঁট ফোলাল।

জাহাজে যারা ছিল তারা অধীর হয়ে উঠেছিল ব্যাপারটা কী জানবার জন্য।

'বল্ বলছি।' শেষ পর্যন্ত তাকে ঝাঁকিয়ে ধমক দিল এক জোয়ান রেড-ইন্ডিয়ান, 'ধড় থেকে ভয়-পুঁচকে প্রাণটাকে না হারাতে চাইলে এক্ষুণি বল্।'

ডুবুরি তার মাথা ঘুরিয়ে ভাঙা গলায় বলল :

'দরিয়ার দানো'...দেখলাম...'

'বটে?'

'আরে, বল্ না বাপু!' অধৈর্যে চেঁচামেচি লাগাল ডুবুরিরা।

'দেখি হাঙর। ছুটে আসছে সোজা আমার দিকে। দফা আমার শেষ! প্রকাণ্ড চেহারা, কালচে রঙ। মুখ হাঁ করে আছে, এই আমায় খাবে। হঠাৎ দেখি...আরো আসছে...'

'আরেকটা হাঙর?'

'দানো!'

'দেখতে কেমন? মাথা আছে?'

'মাথা? মনে হচ্ছে আছে। গেলাসের মতো চোখ।'

'চোখ থাকলে মাথাও থাকবে নিশ্চয়'—নিঃসন্দেহে ঘোষণা করল জোয়ান রেড-ইন্ডিয়ান, 'চোখকে তো কোথাও বসতে হবে। থাবা আছে?'

'থাবা ঠিক ব্যাঙে মতো। লম্বা লম্বা সবজেটে আঙুল, নখ আছে। ঝকমক করছে যেন আঁশওয়ালা মাছ। হাঙরের কাছে সাঁতরে এল, ঝলক দিল থাবা—ব্যস, গলগলিয়ে রক্ত বেরল হাঙরের পেট থেকে...'

'আর পা ওর কেমন?' জিজ্ঞেস করলে একজন ডুবুরি।

'পা?' মনে করার চেষ্টা করল সে, 'পা মোটেই নেই। লম্বা লেজ আছে, লেজের ডগায় দুটো সাপ।'

'কাকে তুই ভয় পেয়েছিলি বেশি, হাঙরকে নাকি 'দানো'কে?'

'দানো'কে—বিনা দ্বিধায় জবাব দিলে ডুবুরি, 'দানো'কে, যদিও আমার জীবন সে-ই বাঁচায়। ও ছাড়া আর কেউ নয়...'

'হ্যাঁ, ও-ই।'

'দরিয়ার দানো'—বলল জোয়ান রেড-ইন্ডিয়ান।

'সাগরের দেবতা', 'গরিবের উপকার করে'—শুধরে দিলে বুড়ো।

যেসব নৌকো তখনো সাগরে ভাসছিল, খবরটা দ্রুত পৌঁছে গেল তাদের কাছে। চটপট ফিরে জাহাজে উঠল তারা।

সবাই এসে বার বার করে ডুবুরির কাছ থেকে ওই একই কাহিনীটা শুনল। সে-ও পুনরাবৃত্তি করে গেল প্রতিবার নতুন নতুন খুঁটিনাটি যোগ দিয়ে। ওর মনে পড়ল যে দত্যিটার নাক দিয়ে লাল আগুন বেরুচ্ছিল, দাঁতগুলো তার ধারালো আর আঙুলের মতো লম্বা লম্বা, কানগুলো নড়ছিল, গায়ের দু'পাশে ছিল পাখনা, পেছনে নৌকোর হালের মতো এক লেজ।

ডেকে ঘুরে ঘুরে গল্পটা শুনে বেড়াচ্ছিল পেদ্রো জুরিতা, পরনে তার সাদা হাফপ্যান্ট, গা কোমর পর্যন্ত খোলা, মাথায় প্রকাণ্ড একটা স্ট্র হ্যাট, পায়ে জুতো থাকলেও মোজা নেই।

যতই মুখ খুলছিল ডুবুরিটার, ততই পেদ্রো নিশ্চিত হয়ে উঠছিল যে ব্যাপারটা সবই হাঙর দেখে আতঙ্কিত ডুবুরির কল্পনা।

'তবে সবটাই হয়তো কল্পনা নয়। হাঙরটার পেট কেউ চিরেছে নিশ্চয়, জল তো গোলাপি হয়ে উঠেছে। রেড-ইন্ডিয়ানটা মিছে কথা বলছে, কিন্তু কিছুটা সত্যি আছে এর পেছন। ধুত্তোরি শালা, তাজ্জব ব্যাপার!'

এইখানে জুরিতার চিন্তা ছিন্ন হয়ে গেল হঠাৎ পাহাড়ের পেছন থেকে আসা একটা শাঁখের শব্দে।

শব্দটায় যেন বজ্রঘাতের কাজ হল। স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত আলাপ, ফ্যাকাশে হয়ে উঠল মুখগুলো। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্কে ডুবুরিরা চাইল পাহাড়টার দিকে।

কিছু দূরে জলের ওপরে খেলা করছিল একদল ডলফিন। একটা ডলফিন দলছাড়া হয়ে সজোরে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল এমনভাবে যেন শাঁখের শব্দে সাড়া দিলে, তারপর দ্রুত পাহাড়ের দিকে সাঁতরে গেল আর অদৃশ্য হল পাথরের খাঁজের আড়ালে। আতঙ্কিত আরো কয়েক মুহূর্ত কাটল। হঠাৎ পাহাড়ের ওপাশ থেকে দেখা দিল ডলফিনটা, পিঠে তার বসে আছে অদ্ভুত এক জীব, ডুবুরি যার কথা বলছিল সেই 'দানো'। দেহটা তার মানুষের মতো, মুখে প্রকাণ্ড দুই চোখ, রোদ্দুরে ঝকঝক করছে মোটরগাড়ির হেড-লাইটের মতো; গায়ের চামড়া মেদুর নীলাভ-রুপোলি, কব্জির কাছটা ব্যাঙের পায়ের মতো, চামড়ায় জোড়া লম্বা লম্বা আঙুল, কালচে সবুজ। হাঁটু অবধি পা জলের তলে। তাই তা মানুষের মতো দেখতে নাকি লেজ আছে কিনা বোঝা গেল না। হাতে তার পাক দেওয়া লম্বা একটা শাঁখ, আরেকবার তাতে ফুঁ দিয়ে, মানুষের মতো হেসে উঠে বিশুদ্ধ স্প্যানিশ ভাষায় হাঁক দিলে :

'জলদি, লিডিঙ, সামনে!'

ডলফিনের পিঠে হাত দিয়ে চাপড় মারল প্রাণীটা, পা দিয়ে গুঁতো দিল পেটে, ডলফিনও অমনি তেজি ঘোড়ার মতো গতি বাড়াল।

অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল ডুবুরিরা।

অসাধারণ এই সওয়ারি তাতে ফিরে চাইল। লোক দেখে সে টিকটিকির মতো লুকিয়ে পড়ল ডলফিনের দেহের আড়ালে, দেখা গেল শুধু সবুজ একটা হাত, ডলফিনের পিঠে তা চাপড় মারল। ডলফিনও বাধ্যের মতো তার সওয়ারি-সমেত সমুদ্রে ডুব দিল। আধখানা পাক দিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল ডুবো পাহাড়ের ওপাশে।

ব্যাপারটা ঘটতে মিনিট খানেকের বেশি সময় লাগে নি, কিন্তু আত্মস্থ হতে দর্শকদের লাগল অনেকক্ষণ।

চেঁচামেচি ছোটাছুটি লাগাল ডুবুরিয়া, দু'হাতে মাথা চেপে ধরতে লাগল। হাঁটু গেড়ে বসে সমুদ্রের দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল রেড-ইন্ডিয়ানরা; তরুণ একজন মেক্সিকান আতঙ্কে চেঁচাতে চেঁচাতে কেন জানি মাস্তুল বেয়ে উঠতে শুরু করে দিল। নিগ্রোরা ছুটে গিয়ে লুকোল খোলের মধ্যে।

ঝিনুক খোঁজার আর কোনো কথাই ওঠে না। বহু কষ্টে শৃঙ্খলা ফেরাল পেদ্রো আর বালতাজার। নোঙর তুলে 'জেলি-মাছ' জাহাজ যাত্রা করল উত্তরের দিকে।

জুরিতার ব্যর্থতা

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার জন্য ক্যাপটেন নেমে গেল তার কেবিনে।

'পাগল হবার ব্যাপার!' মাথায় এক কলসি তপ্ত জল ঢেলে ভাবলে জুরিতা, 'সামুদ্রিক দানো কিনা কথা বলছে বিশুদ্ধ কাস্তেল্লানো ভাষায়। ভুতুড়ে কাণ্ড? মস্তিষ্কবিকৃতি? কিন্তু একসঙ্গে সবারই তো আর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটতে পারে না। এমনকি দু'জন লোকও কখনো একই স্বপ্ন দেখে না। অথচ সবাই আমরা 'দরিয়ার দানো'টাকে দেখলাম। তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তার মানে যত অবিশ্বাস্যই হোক, ওটা আছে।' তাজা হবার জন্য ফের এক কলসি জল ঢেলে সে গবাক্ষ দিয়ে তাকাল। একটু সুস্থির হয়ে সে ভাবল, 'যতই হোক প্রাণীটার বুদ্ধি মানুষের মতো, ভেবেচিন্তে কাজ করতে পারে। দেখে মনে হয় জলে-ডাঙায় কোথাও তার অসুবিধা হয় না। তাছাড়া স্প্যানিশ ভাষাও জানে, তার মানে কথা বলা যায় ওর সঙ্গে। তাহলে যদি... যদি ওকে ধরে মুক্তো খোঁজার কাজে লাগানো যায়? জলচর এই একটি কোলাব্যাঙ দিয়েই গাদা গাদা ডুবুরির কাজ হয়ে যাবে। তাছাড়া কত লাভ! প্রতিবার মুক্তো তুলে সিকি ভাগ ডুবুরিকে দিয়ে দিতে হচ্ছে। আর এটাকে কিছুই দিতে হবে না। দু'দিনেই লাখ লাখ পেসো লোটা যাবে।'

স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল জুরিতা। টাকা করার স্বপ্ন তার বহু দিনের। মুক্তোর খোঁজে সে যায় শুধু সেখানেই কেউ যেখানে যায় না, পারস্য উপসাগর, সিংহল তীর, লোহিত সমুদ্র, অস্ট্রেলিয়া উপকূল—এসবই অনেক দূরে, মুক্তোও প্রায় নিঃশেষ। মেক্সিকান কি কালিফোর্নিয়া উপসাগর, সেরা আমেরিকান মুক্তো যেখানে পাওয়া যায় সেই ভেনেজুয়েলা উপকূলে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। জাহাজটা তার খুবই জীর্ণ, ডুবুরিও সংখ্যায় কম। ফলাও করে কাজে নামার মতো টাকা জুরিতার নেই। তাই আর্জেন্টিনার উপকূলেই সে রয়ে গেছে। কিন্তু এবার! এবার সে এক বছরেই কোটিপতি হয়ে যেতে পারে যদি কোনোক্রমে একবার ধরতে পারে ওই 'দরিয়ার দানো'টাকে।

সে হয়ে উঠবে আর্জেন্টিনার, হয়তো বা গোটা আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী। টাকায় ক্ষমতা আসবে। লোকের মুখে মুখে ফিরবে তার নাম। কিন্তু সাবধান হওয়া দরকার। ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে।

ডেকে উঠল জুরিতা, বাবুর্চি সমেত সবাইকে ডেকে বলল :

'দরিয়ার দানো'র গল্প যারা ছড়িয়েছে তাদের ভাগ্যে কী হয়েছে জানো তো? পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়েছে। তোমাদেরও সাবধান করে দিচ্ছি—'দানো' দেখেছ বলে একটি কথাও যদি ফাঁস করো, তাহলে তোমাদেরও জেলে পাঠাবে। বুঝেছ তো? প্রাণের মায়া থাকলে একটি কথা কাউকে বলবে না।'

'বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না'—ভাবলে জুরিতা, খুবই গাঁজাখুরি শোনাবে। কেবল বালতাজারকে সে নিজের কেবিনে ডেকে তার মতলবটা জানাল।

মনিবের কথা মন দিয়ে শুনলে বালতাজার, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে:
'তা ঠিক। 'দানো' থাকলে শত শত ডুবুরির কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু ধরা যাবে কী করে?'
জুরিতা বললে, 'জাল দিয়ে।'
'জাল কেটে দেবে, হাঙরের পেট যেভাবে ফেড়ে দিয়েছিল!'
'তারের জালের বায়না দেব।'
'কিন্তু ধরবে কে? 'দানো' কথাটা শোনামাত্রই আমাদের ডুবুরিদের হাঁটু খুলে আসবে। বস্তাভরে সোনা দিলেও রাজি হবে না।'
'আর তুই নিজে, বালতাজার?'
বালতাজার কাঁধ ঝাঁকাল।
'ওকে ধরা কঠিন, তবে হাড় মাংস দিয়ে তৈরি হলে মারা কঠিন হবে না। কিন্তু আপনার তো ওকে দরকার জীবন্ত।'
'ভয় পাচ্ছিস না তো বালতাজার? 'দরিয়ার দানো' সম্পর্কে কী মনে হয় তোর, বল দেখি?'
'কী আর মনে হবে যদি দেখি জাগুয়ার উড়ে যাচ্ছে, গাছে চাপছে হাঙর। অজানা জন্তুকে সর্বদাই ভয় হয়। তবে ভয়ঙ্কর জন্তু শিকার করতেই আমি ভালোবাসি।'
'প্রচুর টাকা দেব তোকে'—বালতাজারের হাত ঝাঁকিয়ে জুরিতা তার পরিকল্পনাটা পেশ করল, 'এ ব্যাপারে লোক যত কম থাকে, ততই ভালো। তুই বরং তোর আরাউকানি জাতের সঙ্গে কথা বল। সাহস আছে ওদের। জন পাঁচেককে বাছ, তার বেশি নয়। আমাদের ডুবুরিয়া রাজি না হলে বাইরের লোক দ্যাখ। মনে হচ্ছে 'দানো' তীরের কাছাকাছি থাকে। প্রথমে ওর ডেরাটা খোঁজ। তাহলে ওকে জালে ফেলা সহজ হবে।'
অবিলম্বেই কাজে লাগল ওরা। জুরিতার ফরমায়েশ অনুসারে তারের একটা জাল বানানো হল, দেখতে প্রকাণ্ড একটা তলহীন পিপের মতো। ভেতরে সাধারণ জাল রাখা হল যাতে 'দানো' তাতে জড়িয়ে পড়ে। ডুবুরিদের পাওনা মিটিয়ে বিদেয় দেওয়া হল। পুরনো খালাসিদের মধ্যে থাকতে রাজি হল শুধু আরাউকানি জাতের দু'জন রেড-ইন্ডিয়ান। আরো তিনজনকে জোটানো হল বুয়েনাস-আইরেস থেকে।
ঠিক হল 'দানো'র সন্ধান শুরু হবে সেই উপসাগর থেকে, যেখানে 'জেলি-মাছ' জাহাজের লোকেরা তাকে দেখেছিল প্রথম। 'দানো' যাতে সন্দেহ না করে তার জন্য জাহাজ নোঙর ফেলল খাঁড়িটা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। জুরিতা আর তার সহচরেরা মাঝে মাঝে মাছ ধরে বেড়াত, যেন সেইটেই তাদের প্রধান কাজ। সেই সঙ্গে পালা করে তাদের তিনজন তীর থেকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে নজর রাখত সমুদ্রের দিকে।
দ্বিতীয় সপ্তাহ পড়ল অথচ 'দানো'র কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না।
তীরে যেসব রেড-ইন্ডিয়ান চাষবাস করত, তাদের সঙ্গে আলাপ জমালে বালতাজার। সস্তায় তাদের কাছে মাছ বেচে এ-কথা সে-কথার পর আলাপ টেনে আনত 'দরিয়ার দানো' নিয়ে।
বুড়ো রেড-ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে এইসব আলাপ থেকে বোঝা গেল যে জায়গাটা তারা বেছেছে ঠিকই। অনেকেই তারা শাঁখের আওয়াজ শুনেছে, পায়ের ছাপ দেখেছে বালিতে। তারা বলল, 'দানোর' গোড়ালির ছাপটা মানুষের মতো, কিন্তু আঙুলগুলো লম্বা লম্বা। মাঝে মাঝে বালিতে গায়ের ছাপও দেখেছে, চিত হয়ে শুয়ে থাকার মতো।
বাসিন্দাদের কোনো ক্ষতি করে নি 'দানো', তাই তারাও ওর চিহ্নগুলো নিয়ে আর মাথা ঘামাত না। তবে চাক্ষুষ কেউ কখনো 'দানো'কে দেখে নি।
দু'সপ্তাহ জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব করল যেন মাছ ধরছে। দু'সপ্তাহ জুরিতা, বালতাজার আর তাদের ভাড়াটেরা সমুদ্র থেকে নজর সরায় নি, কিন্তু 'দরিয়ার দানো'কে

দেখা গেল না। অস্থির হয়ে উঠল জুরিতা। সে ছিল অসহিষ্ণু প্রকৃতির আর কৃপণ। এক-একটা দিন যাওয়া মানেই টাকা খরচ, অথচ 'দানো' তাদের বসিয়েই রাখছে। এমনকি সন্দেহই শুরু হল পেদ্রোর : 'দানো' যদি সত্যিই অপ্রাকৃত কোনো সত্তা হয়, তাহলে জালে তাকে আদৌ ধরা যাবে না। আর সেটা বিপজ্জনকও হবে—কুসংস্কারে বিশ্বাস করত জুরিতা। ভূত তাড়াবার জন্য ক্রুশ সমেত কোনো পাদ্রিকে নেমন্তন্ন করবে সে? আরো টাকা খরচ তাতে। কিন্তু 'দানো' হয়তো মোটেই দানো নয়, আসলে হয়তো কোনো ভালো সাঁতারু, দানোর বেশ নিয়ে লোককে ভয় দেখিয়ে রগড় করছে? কিন্তু ডলফিনের ব্যাপারটা? তা যে কোনো জন্তুর মতো ডলফিনকেও পোষ মানিয়ে কাজে লাগানো আশ্চর্য নয়। ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো হবে নাকি?

যে প্রথম 'দানো'কে দেখতে পাবে সে পুরস্কার পাবে বলে ঘোষণা করলে জুরিতা। ঠিক করলে আরো দিন কয়েক দেখা যাক।

আর আনন্দের কথা যে তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ায় 'দানো' দেখা দিতে শুরু করল।

সারা দিনের মাছ ধরার পর বালতাজার তীরের কাছে মাছভরা নৌকো রেখে যায়। খরিদ্দাররা আসবে ভোরে। বালতাজার নৌকো রেখে চেনা-পরিচিত একজন রেড-ইন্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে যায়। ফিরে এসে দেখে নৌকো ফাঁকা। সঙ্গে সঙ্গেই বালতাজার বুঝল এটা 'দানো'র কাজ।

'এত মাছ ও খেয়ে ফেলল?' ভেবে অবাক লাগল বালতাজারের।

সেই রাত্রেই ডিউটিরত একজন রেড-ইন্ডিয়ান খাঁড়ির দক্ষিণ দিক থেকে শাঁখের শব্দ শুনলে। আরো দু'দিন পরে নওজোয়ান এক আরাউকানি খবর দিলে যে 'দানো'র সন্ধান সে পেয়েছে। একবারও তাকে দেখা গেছে ডলফিনের সঙ্গে, তবে পিঠের ওপর নয়। ডলফিনের পাশে পাশেই সে সাঁতরাচ্ছিল চামড়ার চওড়া একটা লাগাম ধরে। খাঁড়িতে এসে 'দানো' বেল্টটা খুলে নেয়, পিঠ চাপড়ে দেয় ডলফিনের, তারপর খাড়াই একটা পাহাড়ের তলে জলের গভীরে মিলিয়ে যায়। ডলফিন ভেসে যায় জলের ওপর দিয়ে, তারপর তাকে আর দেখা যায় না।

সবটা শুনে জুরিতা ধন্যবাদ জানাল লোকটাকে, তারপর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলল:

'দানো' আজ তার ডেরা ছেড়ে বেরুবে না বলেই মনে হয়। তাই খাঁড়ির তলটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। কে রাজি?'

কিন্তু সমুদ্রের গভীরে নেমে 'দানোর' সঙ্গে মুখোমুখি হতে কারও সাধ ছিল না।

'আমি'—বললে বালতাজার। এক কথার মানুষ সে।

জাহাজে কয়েকজন চৌকি রেখে সবাই তারা তীরে গিয়ে রওনা দিলে খাঁড়াই পাহাড়টার দিকে।

কোমরে দড়ি বাঁধল বালতাজার, জখম হলে যাতে তাকে টেনে তোলা যায়, তারপর একটা ছোরা নিয়ে দু'পায়ে পাথর আঁকড়ে ডুব দিলে।

তার ফেরার জন্য অধীর হয়ে রইল আরাউকানিরা, তাকিয়ে রইল সেখানে, পাহাড়ের ছায়ায় যেখানে জল হয়ে উঠেছে নীলাভ অন্ধকার। সময় কেটে যাচ্ছে, পঞ্চাশ সেকেন্ড, এক মিনিট, শেষ পর্যন্ত টান পড়ল দড়িতে। ওপরে টেনে তোলা হল বালতাজারকে, খানিকটা সুস্থির হয়ে বালতাজার বলল :

'সরু একটা পথ গেছে মাটির তলের গুহায়। অন্ধকার যেন হাঙরের পেট। ওখানে ছাড়া আর কোথাও 'দানো' ডেরা নিতে পারে না। তার চারপাশেই পাথরের ন্যাড়া দেয়াল।

চমৎকার! উল্লসিত হয়ে উঠল জুরিতা—অন্ধকার হওয়াতে বরং ভালোই হয়েছে। ওইখানেই আমাদের জাল পাতব, বাছাধন এবার আটকা পড়বে।'

সূর্যাস্তের পরই গুহার মুখে তারের জালটা নামানো হল শক্ত দড়ি বেঁধে। প্রান্তগুলো বেঁধে রাখা হল তীরে, ছোটো ছোটো ঘন্টি লাগানো হল তাতে, জালে একটু ছোঁয়া লাগলেই যাতে তা বেজে ওঠে।

জুরিতা, বালতাজার আর পাঁচজন রেড-ইন্ডিয়ান তীরে বসে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। জাহাজে কেউ সেদিন রইল না।

দ্রুত গভীর হয়ে উঠল অন্ধকার। বাঁকা চাঁদ উঠল, সাগরের জলে পড়ল তার ছায়া। চারদিকে চুপচাপ। উত্তেজনায় সবাই উৎকণ্ঠ। হয়তো এক্ষুণি তারা দেখতে পাবে সেই অদ্ভুত জীবটাকে, জেলে আর ডুবুরিদের যা আতঙ্কিত করে তুলেছে।

সময় কাটল ধীরে ধীরে। লোকে ঢুলতে শুরু করলে।

হঠাৎ ঘন্টিগুলো বেজে উঠল। লাফিয়ে উঠল সবাই, দড়ির কাছে ছুটে গিয়ে টেনে তুলতে লাগল জাল। ভয়ানক ভারী হয়ে উঠেছে সেটা, টান পড়ল দড়িতে, কেউ যেন আঁকুপাঁকু করছে জালের মধ্যে।

তারপর ওপর ভেসে উঠল জাল, চাঁদের ফ্যাকাশে আলোয় দেখা গেল তার মধ্যে ছটফট করছে আধা-মানুষ আধা-পশুর এক দেহ। জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করছে তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চোখ আর রুপোলি আঁশ। জালে জড়ানো হাতটা ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল 'দানো'। এবং শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়েও নিলে। কোমরের কাছে সরু বেল্টে বাঁধা ছুরিটা খসিয়ে সে জাল কাটতে লাগল।

'ও আর কাটতে হচ্ছে না বাছাধন!' শিকারের উত্তেজনায় চাপা গলায় বলল বালতাজার।

কিন্তু অবাক হয়ে সে দেখল যে ছুরিতে সত্যিই তার কাটছে। নিপুণ কায়দায় 'দানো' ফুটোটা বাড়িয়ে চলল, আর তাড়াতাড়ি তাকে ডাঙায় টেনে তোলার চেষ্টা করল ডুবুরিরা।

'জোরে, জোরে, হেঁইয়ো—হোঁ!' চেঁচাতে শুরু করল বালতাজার।

কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে মনে হল শিকার মুঠোয় এসে গেছে, তখনই 'দানো' কাটা ফুটোটা দিয়ে গলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঝকমকে জলবিন্দুর ফোয়ারা তুলে মিলিয়ে গেল গভীরে!

হতাশ হয়ে জাল ছেড়ে দিল সবাই।

'খাসা ছুরি, তার পর্যন্ত কাটে!' তারিফ করে বলল বালতাজার, সাগরতলের কামাররা দেখছি আমাদের চেয়েও ভালো।'

মাথা নিচু করে জুরিতা এমনভাবে জলের দিকে চেয়ে রইল যেন তার সমস্ত ধনের ভরাডুবি হয়েছে ওখানে।

তারপর মাথা তুলে পুরুষ্ট গোঁফ নেড়ে লাথি মারল মাটিতে। চেঁচালে : 'উঁহু, এ চলতে পারে না! বরং তোর গুহায় তুই পটল তুলবি, কিন্তু আমি ছাড়ব না।

টাকার পরোয়া না করে ডুবুরি নামাব, গোটা খাঁড়ি ছেয়ে ফেলব জালে আর ফাঁদে। আমার হাত থেকে তোকে পালাতে হচ্ছে না।'

নির্ভীক, একরোখা লোক সে। ধমনীতে তার এককালের বিজয়ী স্পেনিয়ার্ডদের রক্ত তো আছে। উপলক্ষটাও লড়বার যোগ্য।

বোঝা গেল 'দরিয়ার দানো' অপ্রাকৃত, সর্বশক্তিমান কোনো সত্তা নয়। বালতাজার যা বলেছিল, হাড়-মাংসেই তা তৈরি। তার মানে তাকে ধরে শেকলে বেঁধে রাখা যায়, জুরিতার জন্য সমুদ্রগর্ভ থেকে সম্পদ তোলানো যায় তাকে দিয়ে। সমুদ্রের দেবতা স্বয়ং নেপচুন তাঁর ত্রিশূল নিয়ে ওকে রক্ষা করতে এলেও সে পিছবে না।

ডাক্তার সালভাতর

কাজে নামল জুরিতা। খাঁড়ির তলে নানা দিকে তারের বেড়া দিল সে, মাঝে-মাঝে ফাঁদ পাতল। কিন্তু আপাতত তাতে ধরা পড়ল কেবল মাছ, 'দরিয়ার দানো' যেন একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে, কোনো চিহ্নই তার দেখা গেল না। পোষা ডলফিনটা রোজ দেখা দিত খাঁড়িতে, ঘোঁৎঘোঁৎ করত, ডুব দিত, যেন বেড়াতে যাবার জন্য ডাক দিচ্ছে তার বন্ধুকে। বন্ধুকে কিন্তু দেখা গেল না, ডলফিনটাও শেষ বারের মতো রেগে ঘোঁৎঘোঁৎ করে সাঁতরে গেল খোলা সমুদ্রে।

খারাপ হয়ে উঠল আবহাওয়া। পুবালি হাওয়া দিতে লাগল সমুদ্রে, তল থেকে ওঠা বালিতে ঘোলা হয়ে উঠল জল। তলে কী হচ্ছে সেটা ঠাহর করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

তরঙ্গভঙ্গের দিকে জুরিতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে পারত তীরে। একের পর এক ঢেউ আসত উত্তাল, আছড়ে পড়ত সশব্দে, ফোঁসফোঁস করে তা ভেজা বালিতে নুড়ি আর ঝিনুক নিয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পৌঁছত জুরিতার পায়ের কাছে।

'না, এতে কিছু হবে না'—বললে জুরিতা, 'অন্য কিছু একটা পন্থা বার করা দরকার। 'দানো' ডেরা নিয়েছে সমুদ্রের তলে, বেরুতে চাইছে না সেখান থেকে। ওকে ধরতে হলে ওই তলেই নামতে হবে, তাকে সন্দেহ নেই।'

বালতাজার নতুন একটা জটিল ফাঁদ বানাচ্ছিল। তার দিকে ফিরে জুরিতা বলল, 'বুয়েনাস-আইরেসে গিয়ে অক্সিজেন সেট সমেত দুটো ডুবুরি পোশাক কিনে আন। সাধারণ পোশাকে হবে না। 'দানো' অনায়াসে টিউব কেটে দেবে। তাছাড়া জলের তলে কিছুটা সফরও করতে হবে। ইলেকট্রিক টর্চ আনতেও ভুলিস না।'

'দানো'র বাড়ি বেড়াতে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল বালতাজার।

'তুইও সঙ্গে থাকবি বৈকি, বুড়ো।'

মাথা নেড়ে যাত্রা করল বালতাজার। শুধু ডুবুরির পোশাক আর টর্চ নয়, সেই সঙ্গে আনল ব্রোঞ্জের দুটো অদ্ভুত বাঁকা ছোরা। বলল :

'আজকাল আর এগুলো বানায় না। আরাউকানিদের সাবেকি ছোরা, আমাদের প্রপিতামহরা আপনাদের সাদাদের প্রপিতামহদের পেট চিরত এ দিয়ে—কথাটার জন্যে রাগ করবেন না।'

ঐতিহাসিক নজির প্রীতিকর না ঠেকলেও ছোরা দুটো জুরিতার পছন্দ হল।

'তুই হুঁশিয়ার লোক, বালতাজার।'

পরের দিন ভোরে প্রচণ্ড ঢেউ সত্ত্বেও জুরিতা আর বালতাজার ডুবুরি পোশাক পরে জলে নামল। বেশ একটু মুশকিলই হয়েছিল গুহামুখের জালগুলো ছাড়াতে, তাহলেও সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথটায় ঢুকল তারা। নিরন্ধ্র অন্ধকার ঘিরে ধরল তাদের। পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছোরা বার করে টর্চ জ্বালাল তারা। ছোট ছোট মাছগুলো প্রথমটা ভয় পেয়ে সরে গেল, তারপর শ্যামা-পোকার মতো ঝাঁক ধরে এল তার নীলাভ কিরণের দিকে।

হাত দিয়ে তাদের তাড়াল জুরিতা, ওদের আঁশের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল তার। গুহাটা বেশ বড়ো, অন্তত চার মিটার উঁচু, পাঁচ-ছয় মিটার চওড়া। কোণাকানাচ খুঁজে দেখল ওরা। সব ফাঁকা, কেউ এখানে থাকে না। শুধু সমুদ্রের ঢেউ আর বড়ো বড়ো মাছদের বিপদ থেকে ছোট ছোট মাছগুলো আশ্রয় নেয় এখানে।

সন্তর্পণে পা ফেলে জুরিতা আর বালতাজার এগিয়ে গেল সামনের দিকে। গুহাটা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিল। হঠাৎ বিস্ময়ে থেমে গেল জুরিতা। টর্চের আলো পড়ল পথ আটকানো একটা মোটা লোহার গরাদের ওপর।

নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না জুরিতার। লোহার ডাণ্ডা ধরে সে ঝাঁকুনি দিয়ে তা খোলার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। আলো ফেলে ফেলে জুরিতা বুঝলে যে গরাদটা পাথরের গা ফুটো করে পাকাপোক্ত বসানো, ভেতরে শেকল আর তালাও আছে।

এ এক নতুন প্রহেলিকা।

'দরিয়ার দানো'র শুধু বুদ্ধি আছে তাই নয়, অসাধারণ সব দক্ষতাও আছে। ডলফিনকে তালিম দিয়েছে সে, লোহার কাজও জানে, তার সামদ্রিক আশ্রয় রক্ষার জন্য লোহার মজবুত বেড়াও দিতে পেরেছে। কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য! জলের তলে কামারশালা হয় কী করে। তার মানে সে শুধু জলে বাস করে না, অন্তত বেশি কিছু কালের জন্য ডাঙায় এসে থাকে।

রগ দপদপ করতে লাগল জুরিতার, যেন অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে, অথচ জলের তলে ও আছে মাত্র মিনিট কয়েক।

বালতাজারকে ইশারা করলে জুরিতা, গুহা থেকে বেরিয়ে এল তারা। এখানে আর তাদের করবার কিছু নেই। উঠে এল উপরে। আরাউকানিরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। অক্ষত দেহে ওদের ফিরতে দেখে খুশি হয়ে উঠল তারা।

হেলমেট খুলে দম নিয়ে জুরিতা বলল :

'কী মনে হল তোর বালতাজার?'

বালতাজার হতাশার ভঙ্গি করল।

'আমার মনে হচ্ছে অনেক দিন আমাদের ওখানে বসে থাকতে হবে। 'দানো' নিশ্চয় মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে, আর মাছ ওখানে অজস্র। খিদের জ্বালায় বেরিয়ে আসবে এমন নয়। বাকি থাকছে শুধু ডিনামাইট দিয়ে গরাদটা উড়িয়ে দেওয়া।

'আর তোর মনে হচ্ছে না যে গুহাটার দুটো পথ থাকতে পারে, একটা সমুদ্রে আরেকটা ভাঙায়?'

'বালতাজার সে কথা ভাবে নি।'

'ভেবে দেখতে হয়। এলাকাটা সন্ধান করে দেখার কথা কেন যে মনে হয় নি আগে?' বলল জুরিতা।

এবার সে তীরভূমিতে সন্ধান শুরু করল। তীরে একটা সাদা পাথরের উঁচু দেয়াল দেখতে পেলে জুরিতা, অন্তত দশ হেক্টর জমি তা দিয়ে ঘেরা। দেয়াল ঘুরে দেখল জুরিতা। ঢোকার ফটক শুধু একটা, মোটা লোহার পাতে তা আটকানো। ভেতর থেকে দেখার একটা চোরা ফুটো সমেত ছোট একটা লোহার দরজা তাতে।

'এ যে একেবারে খাঁটি জেলখানা কিংবা কেল্লা'—ভাবল জুরিতা, 'আশ্চর্য ব্যাপার। চাষিরা এমন মোটা উঁচু দেয়াল তোলে না কখনো। দেয়ালে একটা ফুটোও নেই যে ভেতরে উঁকি দেওয়া যায়।'

চারদিক জনহীন, বুনো জায়গা...চারদিকে ন্যাড়া ন্যাড়া ধূসর পাহাড়, কোথাও-কোথাও তা কাঁটাঝোপ কি ফণিমনসায় ঢাকা। নিচে সাগরের খাঁড়িটা।

দেয়ালটার চারপাশে কয়েকদিন ঘুরে-ঘুরে বেড়াল জুরিতা, নজর রাখল ফটকটার দিকে। কিন্তু ফটক খুলল না, ভেতরে ঢুকতে দেখা গেল না কাউকে, কেউ বেরুল না; একটা শব্দও শোনা গেল না দেয়ালের ওপাশ থেকে।

সন্ধ্যায় জাহাজে ফিরে জুরিতা বালতাজারকে ডেকে বলল :

'খাঁড়ির ওপরকার কেল্লাটায় কে থাকে তুই জানিস?'

'জানি। খামারে যেসব রেড-ইন্ডিয়ান কাজ করে তাদের আগেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওখানে থাকেন সালভাতর।'

'কে এই সালভাতর?'

'ঈশ্বর'—বলল বালতাজার।

অবাক হয়ে জুরিতা তার মোটা কালো ভুরু তুলে কপালে।

'ঠাট্টা করছিস, বালতাজার?'

অলক্ষে একটু হাসলে রেড-ইন্ডিয়ান :

'যা শুনেছি তাই বললাম। বহু রেড-ইন্ডিয়ানই সালভাতরকে ঈশ্বর, তাদের রক্ষক বলে মনে করে।'

'কী থেকে সে রক্ষা করে তাদের?'

'মরণ থেকে। লোকে বলে উনি সর্বশক্তিমান। অলৌকিক কাণ্ড করতে পারেন সালভাতর। জীবন-মৃত্যু সবই ওঁর হাতে। খোঁড়াকে তিনি জীবন্ত পা দেন, অন্ধকে দেন ঈগলের মতো জোরালো চোখ, এমনকি মরাকেও বাঁচিয়ে তোলেন।'

'ধুত্তোরি সব!' আঙুল দিয়ে তার পুরুষ্টু গোঁফ ওপর দিকে ঠেলে তুলে গজগজ করে উঠল জুরিতা, 'খাঁড়িতে 'দরিয়ার দানো', ওপরে 'ঈশ্বর'! আচ্ছা, তোর এ কথা মনে হচ্ছে না যে, 'ঈশ্বর' আর 'দানো'র মধ্যে কোনো সাঁট আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো, নইলে টোকো দুধের মতো এইসব ভেল্কিতে আমাদের মাথার ঘিলু ছানা কাটতে থাকবে।'

'তুই নিজে সালভাতরের চিকিৎসা করা কোনো লোককে দেখেছিস?'

'দেখেছি। পা-ভাঙা একটা লোককে দেখেছি, সালভাতরের কাছে যাবার পর সে এখন বুনো ঘোড়ার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া মরা থেকে বাঁচিয়ে তোলা একটা লোককেও দেখেছি। সবাই বলে, লোকটাকে যখন সালভাতরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার গা একেবারে ঠাণ্ডা, মাথার খুলি ভাঙা, ঘিলু বেরিয়ে পড়েছে। অথচ সালভাতরের কাছ থেকে সে ফিরল চাঙ্গা, জীবন্ত। মরার পর বিয়ে করেছে। বৌটি বেশ। তাছাড়া রেড-ইন্ডিয়ানদের ছেলেপিলেও দেখেছি...'

'তার মানে সালভাতর বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করে?'

'শুধু রেড-ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে। দিগ্বিদিক থেকে তারা আসে তাঁর কাছে—আগুনে মাটি, আমাজন, আতাকামা মরুভূমি, আসুনসিওন—সবখান থেকে।'

এ খবরটা পেয়ে জুরিতা ঠিক করল বুয়েনাস-আইরেসে যাবে।

সেখানে সে জানল যে সালভাতর রেড-ইন্ডিয়ানদের চিকিৎসা করেন, তাদের মধ্যে অলৌকিক-কর্মা বলে তাঁর খ্যাতি আছে। ডাক্তারদের কাছ থেকে জানা গেল সালভাতর গুণী এমনকি প্রতিভাবান সার্জন, কিন্তু বহু বিখ্যাত লোকের মতোই একটু খাপছাড়া। ইউরোপ, আমেরিকা দুই মহাদেশেই সালভাতরের খুব নাম আছে। দুঃসাহসিক এবং অস্ত্রোপচারের জন্য আমেরিকায় তিনি বিখ্যাত। রোগীর যখন আর আশা নেই, অন্য সার্জন হাল ছেড়ে দিয়েছে, তখন ডাকা হত সালভাতরকে। কখনো তিনি আপত্তি করতেন না। তাঁর সাহস

আর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল সীমাহীন। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ফ্রান্সের ফ্রন্টে। সেখানে প্রায় একমাত্র খুলির অপারেশন করতেন। হাজার হাজার লোক তাদের জীবনের জন্য তাঁর কাছে ঋণী। যুদ্ধের পর তিনি স্বদেশ আর্জেন্টিনায় ফেরেন। নিজের পেশার এবং জমির কারবারে সালভাতর টাকা করেন প্রচুর। বুয়েনাস-আইরেসের কাছে মস্ত এক খণ্ড জমি কেনেন তিনি, প্রকাণ্ড দেয়াল দিয়ে তাকে ঘেরেন,—এটা তাঁর অন্যতম একটা পাগলামি—এবং সেখানে বাসা নিয়ে ডাক্তারি একেবারে ছেড়ে দেন। কেবল নিজের গবেষণাগারে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন, এখন তিনি কেবল রেড-ইন্ডিয়ানদের চিকিৎসা করেন, তারা তাঁকে মর্ত্যে আবির্ভূত দেবতা বলে মানে।

সালভাতরের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পেল জুরিতা। সালভাতরের বিশাল সম্পত্তি এখন যেখানে রয়েছে সেখানে যুদ্ধের আগে ছিল বড় একটি বাগান আর বাড়ি, সেটাও পাথুরে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। যতদিন তিনি ফ্রন্টে ছিলেন, ততদিন বাড়িটা পাহারা দিত একজন নিগ্রো আর প্রকাণ্ড কতকগুলো কুকুর। কাউকে তারা ভেতরে ঢুকতে দিত না।

সম্প্রতি সালভাতর আরো বেশি গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সতীর্থদের সঙ্গেও তিনি দেখা করতেন না।

খবরগুলো সংগ্রহ করে জুরিতা স্থির করলো : 'সালভাতর যখন ডাক্তার, তখন রোগীকে ফেরাবার কোনো অধিকার তার নেই। আমার তাহলে রোগ হতে বাধা কি? রোগী হয়ে তার কাছে সে ধরা দেবে এবং তারপর দেখা যাবে।'

ফের লোহার ফটকটার কাছে গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল জুরিতা। অবিরাম অনেকক্ষণ ধাক্কাল, কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। ক্ষেপে গিয়ে জুরিতা মস্ত এক পাথর নিয়ে বাড়ি মারতে লাগল দরজায়—সে শব্দে মরা মানুষও জেগে উঠতে পারে।

অনেক ভেতর থেকে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল কুকুর, শেষ পর্যন্ত দরজার ফুটোটা একটু খুলল :

'কী চাই?' কে একজন জিজ্ঞেস করলে ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায়।

'রোগী, শিগগির খুলুন'—বলল জুরিতা।

'রোগী অমন করে ধাক্কাতে পারে না'—শান্ত জবাব এল ভেতর থেকে, কার একটা চোখ দেখা গেল ফুটোটায়, 'ডাক্তার কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।'

'রোগীকে ফেরাবার কোনো অধিকার তাঁর নেই'—উত্তেজিত হয়ে উঠল জুরিতা।

ফুটোটা বন্ধ হয়ে গেল, দূরে সরে গেল পায়ের শব্দ। শুধু প্রাণপণে চেঁচাতে থাকল কুকুরগুলো।

গালাগালির ঝুলি শূন্য করে জাহাজে ফিরল জুরিতা।

বুয়েনাস-আইরেসে সালভাতরের নামে নালিশ করবে? কিন্তু কোনো লাভ হবে না তাতে। রাগে জুরিতা কাঁপছিল। তার কালো মোটা মোচখানার অবস্থা হয়ে উঠল সঙ্গীন, কেননা মুহূর্তে মুহূর্তে সে তাকে টান দিচ্ছিল নিচের দিকে, যেন ব্যারোমিটার নিচে নামছে।

শেষ পর্যন্ত ডেকে এসে হঠাৎ হুকুম দিলে নোঙর তুলতে।

বুয়েনাস-আইরেসের দিকে যাত্রা করল 'জেলি-মাছ'।

'সেই ভালো'—বললে বালতাজার, 'খামকা কেবল সময় নষ্ট হল। চুলোয় যাক ওই 'দানো' আর এই 'ঈশ্বর'!'

রুগ্‌ণা নাতনি

রোদ খাঁ খাঁ করছে। গম, ভুট্টা আর ওট খেত বরাবর ধুলো—ভরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল এক শীর্ণ বুড়ো রেড-ইন্ডিয়ান। গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক, কোলে তার রুগ্‌ণ শিশু, রোদ আড়াল করার জন্য পুরনো কম্বল দিয়ে ঢাকা। শিশুর চোখ আধবোজা। গলায় একটা প্রকাণ্ড ফোড়া। থেকে থেকে বুড়ো হোঁচট খাচ্ছিল আর ভাঙা ভাঙা গলায় কাতরিয়ে একটুখানি চোখ মেলছিল বাচ্চাটা। বুড়ো থেমে সন্তর্পণে তাকে আরাম দেবার জন্য ফুঁ দিচ্ছিল তার মুখে।

'শুধু প্রাণ থাকতে থাকতে পৌঁছতে পারলে হয়!' গতি বাড়িয়ে বিড়বিড় করল বুড়ো।

লোহার ফটকটার কাছে এসে বুড়ো শিশুটিকে বাঁ কোলে নিয়ে ডান হাতে চারবার ধাক্কা মারল দরজায়।

ফুটোটায় কার যেন চোখ দেখা গেল, ঝনঝন করে উঠল হুড়কো, দরজা খুলে গেল।

সসঙ্কোচে চৌকাট পেরল বুড়ো। সামনে তার সাদা স্মক পরা এক বুড়ো নিগ্রো, কোঁকড়া চুল তার একেবারে সাদা।

বুড়ো বলল, 'ডাক্তারের কাছে এসেছি, রোগে পড়েছে এটা।'

নীরবে মাথা নাড়ল নিগ্রো, দরজা বন্ধ করে ইশারা করলে তার সঙ্গে যেতে।

চারদিকে চেয়ে দেখল বুড়ো; চওড়া পাথর বাঁধানো একটা আঙিনায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। তার একদিকে বাইরের উঁচু দেয়াল, অন্যদিকে আরেকটু নিচু দেয়াল দিয়ে ভেতরকার অংশ থেকে তা বিচ্ছিন্ন। একটা ঘাস নেই কোথাও, একটি গাছ নেই—ঠিক যেন জেলখানা। আঙিনার কোণে, দ্বিতীয় দেয়ালের ফটকের কাছে একটি সাদা বাড়ি, বড়ো বড়ো জানলা তাতে। বাড়ির কাছে মাটির ওপর বসে আছে একদল রেড-ইন্ডিয়ান নরনারী, অনেকের সঙ্গেই ছেলেমেয়ে।

প্রায় সবকটি বাচ্চাকেই পুরোপুরি সুস্থ বলে মনে হয়। কেউ কেউ কড়ি খেলছে, কেউ বা কুস্তি লড়ছে, বুড়ো নিগ্রো কড়া নজর রাখে যাতে কেউ গোলমাল না করে।

বুড়ো রেড-ইন্ডিয়ান বাধ্যের মতো বাড়ির ছায়াটার তলে মাটিতে বসল, ফুঁ দিতে লাগল শিশুটির নিশ্চল, নীলচে হয়ে আসা মুখে। পাশেই তার বসে ছিল ফুলো পা এক বুড়ি রেড-ইন্ডিয়ান। কোলের ওপর শোয়ানো শিশুটিকে দেখে সে জিজ্ঞেস করল:

'মেয়ে?'

'নাতনি।'

মাথা নেড়ে বুড়ি বলল:

'জলা ভূত ধরেছে তোমার নাতনিকে। তবে ওনার জোর সব ভূতের চেয়ে বেশি। জলা ভূতকে তাড়িয়ে দেবে উনি, নাতনি তোমার ভালো হয়ে যাবে।'

বুড়ো সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

সাদা স্মক পরা নিগ্রো রোগীদের চক্কর দিয়ে বাচ্চা মেয়েটিকে দেখল, তারপর দরজার দিকে ইঙ্গিত করল।

মস্ত একটা ঘরে ঢুকল রেড-ইন্ডিয়ান। পাথর বাঁধানো মেঝে, মাঝখানে সাদা চাদর বিছানো লম্বা সরু একটা টেবিল। ঘষা কাচের একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ডাক্তার সালভাতর, গায়ে সাদা ঝক, লম্বা চওড়া চেহারা, ময়লাটে রঙ। কালো কালো ভুরু আর চোখের পাতা ছাড়া মাথায় একটিও চুল নেই। মনে হয় মাথা কামানো তাঁর বরাবরের অভ্যেস, কেননা চাঁদির চামড়া ঠিক মুখের মতোই রোদপোড়া। প্রকাণ্ড বাঁকা নাক, সুপ্রকট ছুঁচলো থুতনি আর চাপা ঠোঁটে মুখখানা দেখায় কেমন নিষ্ঠুর হিংস্র। বাদামি চোখে নিরুত্তাপ দৃষ্টি। সে দৃষ্টির সামনে রেড-ইন্ডিয়ানটা বিব্রত হয়ে উঠল। মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে সে শিশুটিকে এগিয়ে দিল।

ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে সালভাতর সাবধানে তুলে নিলেন মেয়েটিকে, গায়ে জড়ানো ন্যাতাকানিগুলো খুলে ছুড়ে ফেললেন কোণের কাছে রাখা একটা বাক্সে। রেড-ইন্ডিয়ানটা সেগুলো ফের কুড়িয়ে নেবার উপক্রম করতেই সালভাতর কড়া ধমক দিলেন :

'খবরদার ছুঁয়ো না!'

তারপর মেয়েটিকে টেবিলের ওপর শুইয়ে ঝুঁকে পড়লেন তার ওপর। রেড-ইন্ডিয়ানটা তাঁর মুখের পাশটা দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল উনি যেন আদৌ ডাক্তার নন, অতিকায় এক শকুন যেন ছোট্ট একটা পাখির ওপর ছোঁ মারছে। আঙুল দিয়ে মেয়েটির ফোড়া টিপে দেখতে লাগলেন সালভাতর। সে আঙুল দেখেও অবাক হল রেড-ইন্ডিয়ানটা। লম্বা লম্বা, অসাধারণ চঞ্চল আঙুল। দুর্বোধ্য এই মানুষটাকে দেখে রেড-ইন্ডিয়ানটার কেমন যেন ভয়ই করতে লাগল।

'চমৎকার'—বললেন সালভাতর, ফোড়াটা টিপে দেখতে তাঁর যেন ভারি ভালো লাগছে। রেড-ইন্ডিয়ানটার দিকে চেয়ে সালভাতর বললেন :

'আজ অমাবস্যা, পরের অমাবস্যায় আসিস, মেয়ে তোর ভালো হয়ে যাবে, নিয়ে যাস।'

মেয়েটিকে তিনি নিয়ে গেলেন কাচের দরজার ওপাশে। স্নানাগার, অপারেশন কক্ষ, আর রোগীদের থাকার ঘর আছে সেখানে।

নতুন আরেকটি রোগীকে নিয়ে এল নিগ্রো—পায়ের রোগী এক বুড়ি।

সালভাতরের পেছনে বন্ধ হয়ে যাওয়া কাচের দরজাটার দিকে লম্বা কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল রেড-ইন্ডিয়ানটি।

ঠিক আটাশ দিন পরে আবার খুলল সেই কাচের দরজা।

দরজায় দেখা গেল মেয়েটিকে, গায়ে তার নতুন পোশাক, সুস্থ, সবল লালচে গাল। ভয়ে ভয়ে সে চাইল দাদুর দিকে। রেড-ইন্ডিয়ান ছুটে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে চুমু খেলে, দেখল গলাটা। ফোঁড়ার চিহ্নমাত্র নেই। শুধু স্মৃতি হিশেবে আছে একটু প্রায় অলক্ষ লালচে ক্ষতচিহ্ন।

চুমু খাওয়ার সময় বহু দিন না-কামানো দাড়িতে খোঁচা লাগতেই মেয়েটি হাত দিয়ে তার দাদুকে ঠেলা দিল, এমনকি চেঁচিয়েই উঠল। কোল থেকে তাকে নামিয়েই দিতে হল। পিছু-পিছু এলেন সালভাতর। এবার হাসি দেখা গেল ডাক্তারের মুখে, মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন :

'নে, এবার ওকে নিয়ে যা। খুব সময়ে এসেছিলি যা হোক। আর ঘণ্টাকয়েক দেরি করলেই আমার সাধ্যে কুলাত না।'

বুড়ো রেড-ইন্ডিয়ানের মুখ কুঁচকে উঠল বলিরেখায়, ঠোঁট কাঁপতে লাগল, জল গড়িয়ে পড়ল চোখ দিয়ে। মেয়েটিকে সে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরল বুকে, তারপর সালভাতরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কান্না-ভাঙা গলায় বলল :

'আমার নাতনির জীবন বাঁচালেন আপনি। গরিব রেড-ইন্ডিয়ান আমি, নিজের জীবন ছাড়া আপনাকে আমার দেবার কিছু তো আর নেই।'

'কিন্তু তোর জীবন নিয়ে আমার কী হবে?' অবাক হলেন সালভাতর।

'আমি বুড়ো, কিন্তু এখনো ভাগৎ আছে গতরে'—মাটি থেকে না উঠেই বলতে লাগল সে, 'নাতনিকে তার মায়ের কাছে, আমার মেয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে আসব আপনার কাছে। আপনি যে উপকার করলেন তার জন্যে জীবনের যেটুকু আমার বাকি আছে তা আপনাকে দিতে চাই। কুকুরের মতো আপনার কাজ করে দেব। এইটুকু কৃপা আমায় করুন।'

কী যেন ভাবলেন সালভাতর।

নতুন চাকরবাকর তিনি নিতেন খুবই অনিচ্ছায় এবং সাবধানে। যদিও করার মতো কাজ কম ছিল না। জিম বাগানটা দেখে উঠতে পারছে না। এই রেড-ইন্ডিয়ানটিকে দিয়ে মনে হয় চলবে, যদিও নিগ্রো নেওয়াই ডাক্তারের বেশি পছন্দ।

'তুই আমায় জীবন দিতে চাস, সেটা কৃপা করে আমায় নিতে বলছিস? বেশ, তাই হোক। কবে আসতে পারবি?'

'চতুর্থীর আগেই'—সালভাতরের স্মকের প্রান্তে চুমু খেয়ে বললে রেড-ইন্ডিয়ান।

'তোর নামটা কী?'

'আমার নাম? ক্রিস্টো...ক্রিস্টোফোর।'

'তাহলে আসিস, ক্রিস্টো। তোর অপেক্ষায় থাকব।'

'চল্‌রে নাতনি!' মেয়েটিকে দিকে ফিরে তাকে কোলে নিলে বুড়ো। মেয়েটি কেঁদে ফেলল। তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল ক্রিস্টো।

আজব বাগান

ক্রিস্টো ফিরল দিল কয়েক পরে। ডাক্তার সালভাতর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন:

'মন দিয়ে শোন্, ক্রিস্টো। কাজে নিচ্ছি তোকে। খোরপোষ আর ভালো মাইনে পাবি...'

ক্রিস্টো হাত নেড়ে আপত্তি করল :

'আমার কিছু লাগবে না, শুধু আপনার কাজ করতে চাই।'

'চুপ করে শোন'—বললেন সালভাতর, 'তুই সবকিছু পাবি। শুধু এক শর্তে : এখানে যা দেখবি, সে সম্পর্কে একটি কথাও বলা চলবে না কাউকে।'

'বরং নিজের জিভ কেটে কুকুরকে খাওয়াব, কিন্তু কথা বলব না।'

'সে দুর্ভাগ্য যাতে না হয় সেটা দেখবি'—হুঁশিয়ার করে দিলেন সালভাতর। সাদা স্মক পরা নিগ্রোটাকে ডেকে বললেন :

'ওকে বাগানে নিয়ে যা, জিমের হাত তুলে দিবি।

নীরবে মাথা নেড়ে নিগ্রো সাদা বাড়িটার বাইরে নিয়ে এল ক্রিস্টোকে, তারপর পরিচিত সেই আঙিনাটা পেরিয়ে দ্বিতীয় দেয়ালের লোহার ফটকে টোকা দিলে।

দেয়ালের ওপাশ থেকে শোনা গেল কুকুরের ডাক, ক্যাঁচকেঁচিয়ে ধীরে ধীরে খুলল ফটকটা, নিগ্রোটা বাগানের মধ্যে ক্রিস্টোকে ঠেলে দিয়ে ওপাশে দাঁড়ানো দ্বিতীয় নিগ্রোটাকে কাঁকর-চিবানো গলায় কী বলে চলে গেল।

ভয়ে দেয়ালের সঙ্গে সিঁটিয়ে রইল ক্রিস্টো : ভয়াবহ গর্জনে কতকগুলো অদৃষ্টপূর্ব জানোয়ার ছুটে এল তার দিকে, লালচে-হলুদ গায়ের রঙ, তাকে কালো কালো ছোপ। পাম্পাসে এগুলোকে দেখলে ক্রিস্টো নিঃসন্দেহে ধরে নিত যে ওগুলো জাগুয়ার। কিন্তু এ জন্তুগুলোর গর্জন যেন কুকুরের ডাকের মতো। তবে এই মুহূর্তে জন্তুগুলো ঠিক কী তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না ক্রিস্টোর। পাশের গাছটা ধরে সে চট করে উঠে পড়ল তার ওপর। কুকুরগুলোর দিকে কেউটের মতো হিসিয়ে উঠল নিগ্রোটা। সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হয়ে গেল তারা। ডাক থামিয়ে থাবার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, কটাক্ষে চাইতে লাগল নিগ্রোটার দিকে।

ফের হিসিয়ে উঠল নিগ্রো, এবার গাছে বসা ক্রিস্টোকে লক্ষ করে হাতের ইশারায় তাকে নামতে বলল।

'সাপের মতো হিসহিস করছিস কেন?' আশ্রয়টা না ছেড়েই বলল ক্রিস্টো, 'জিভ নেই নাকি?'

জবাবে শুধু গোঁগোঁ করে উঠল নিগ্রোটা।

'নিশ্চয়ই বোবা'—ভাবলে ক্রিস্টো, সালভাতরের হুঁশিয়ারটা তার মনে পড়ল। 'গোপন কথা ফাঁস করলে সত্যিই কি চাকরবাকরের জিভ কেটে নেন সালভাতর? এই নিগ্রোটারও

হয়তো জিভ কাটা গেছে..' ভাবতেই এমন আতঙ্ক হল ক্রিস্টোর যে আরেকটু হলেই উল্টে পড়ত গাছ থেকে। নিগ্রোটা এদিকে গাছের কাছে এসে তার পা ধরে টানতে শুরু করেছে। কী আর করা যায়, গাছ থেকে ঝাঁপ দিল ক্রিস্টো, যথাসম্ভব অমায়িক হেসে হাত বাড়িয়ে দিল, বন্ধুর মতো জিজ্ঞেস করল :

'জিম?'

মাথা নাড়ল নিগ্রোটা।

সজোরে করমর্দন করল ক্রিস্টো। মনে মনে ভাবল, 'নরকে যখন পড়েছি তখন শয়তানকে তোয়াজ করে চলাই ভালো।' মুখে বলল :

'তুই বোবা?'

জবাব দিল না নিগ্রোটা।

'জিভ নেই?'

আগের মতোই চুপ করে রইল সে।

'ওর মুখের ভেতরটায় একবার উঁকি দিতে পারলে হত'—ভাবলে ক্রিস্টো। জিম কিন্তু এমনকি আকারে-ইঙ্গিতেও আলাপ চালাবার কোনো লক্ষণ দেখাল না। হাত ধরে সে ক্রিস্টোকে নিয়ে গেল লালচে-হলুদ জন্তুগুলোর কাছে, হিসহিসিয়ে কী বলল। জন্তুগুলো উঠে ক্রিস্টোকে শুঁকে দেখে শান্তভাবে সরে গেল। একটু হাঁপ ছাড়ল ক্রিস্টো।

হাত নেড়ে ডেকে জিম ক্রিস্টোকে নিয়ে গেল বাগান দেখাতে। পাথর বাঁধানো বিষণ্ণ আঙিনাটার পর সবুজ পাতা আর রঙিন ফুলের প্রাচুর্যে অবাক করে বাগানটা। ছড়িয়ে গেছে সেটা পুবের দিকে, ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রতীরে। লালচে লালচে কড়িগুলো ছড়ানো বীথিগুলো চলে গেছে নানান দিকে। দু'পাশে তাদের অপরূপ সব ফণিমনসা, নীলাভ সবুজ আগাভা* আর অসংখ্য হলদে-সবুজ ফুল। পিচ আর অলিভকুঞ্জের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে রঙচঙা ফুলে ভরা ঘন ঘাস। ঘাসের মাঝে মাঝে সাদা পাথরে বাঁধানো ঝকঝকে পুকুর; উঁচু উঁচু ফোয়ারায় তাজা হয়ে উঠছে বাতাস।

সেই সঙ্গে যত রাজ্যের পশুপাখির শিস, গান, হুঙ্কারে সারা এলাকাটা মুখরিত। এমন অসাধারণ সব পশুপাখি ক্রিস্টো জীবন কখনো দেখে নি।

হলদে-সবুজ আঁশের ঝলক তুলে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল এক ছয়-পেয়ে টিকটিকি। গাছ থেকে ঝুলে আছে দু'মুখো এক সাপ! সাপটা লালচে দুই মুখে হিসিয়ে উঠতেই ক্রিস্টো আঁৎকে সরে এল লাফিয়ে। জিম আরো জোরে হিসিয়ে ওঠাতে সাপটা লাফিয়ে নেমে লুকিয়ে গেল ঘন সব বনের মধ্যে। আরো একটা লম্বা সাপ সরে গেল পথ থেকে—দুটো পা আছে তার। লোহার জাল ঘেরা একটা শুয়োরছানা ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল, কপালের ঠিক মাঝখানে তার একটি মাত্র চোখ।

গোলাপি রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল দুটো সাদা ইঁদুর, এক সঙ্গে পাশাপাশি তারা জোড়া, ফলে দাঁড়িয়েছে দুই মুখ আট পায়ের এক কিম্ভূত। দুই অর্ধেক মাঝে মাঝে লড়াই বাধাচ্ছিল নিজেদের মধ্যে—বাঁয়েরটা বাঁ দিকে, ডাইনে যাবার চেষ্টা করছিল, দুটোই কিঁচকিঁচ করছিল রেগে। তবে জিত হচ্ছিল সর্বদাই ডাইনেরটার। কাছেই চলছিল আরেক জোড়া যুগ্মভেড়া, ইঁদুরের মতো তারা ঝগড়া করছিল না। বোঝা যায় তাদের মধ্যে ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার পুরো ঐক্য স্থাপিত হয়ে গেছে অনেক দিন। একটা দৃশ্য ভারি অবাক করল ক্রিস্টোকে।

* শাঁসালো পাতার একরকম গাছ, তার রস থেকে পানীয় হত আর আঁশ দিয়ে বোনা হত কাপড়।
—(লেখকের টীকা)

একেবারে ন্যাড়া একটা গোলাপি কুকুর, তার পিঠ থেকে গজিয়ে উঠেছে বাঁদরের মতো এক জীব, সেই রকম হাত, মাথা, বুক। লেজ নাড়াতে নাড়াতে কুকুরটা ক্রিস্টোর কাছে এলো। মাথা নাড়াচ্ছিল বাঁদরটা, হাত দিয়ে চাপড় মারছিল কুকুরের পিঠে, ক্রিস্টোকে দেখে খেঁকিয়ে উঠল। পকেট থেকে এক টুকরো মিছরি বার করে দিতে যাচ্ছিল ক্রিস্টো, কিন্তু ঝট করে কে যেন তার হাতটা সরিয়ে দিল, হিসহিস শব্দ শোনা গেল পেছনে। ঘাড় ফেরাতেই ক্রিস্টো দেখল—জিম। ইশারা করে নিগ্রোটা বুঝিয়ে দিল যে বাঁদরটাকে কোনো খাবার দিতে নেই। এই ফাঁকে টিয়াপাখির মতো মাথাওয়ালা একটা চড়ুই ছোঁ মেরে মিছরিটা নিয়ে লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে। দূরের মাঠে হাম্বা রবে ডেকে উঠল একটা ঘোড়া, মাথাটা তার গোরুর মতো।

ঘোড়ার মতো লেজ দুলিয়ে ছুটে গেল দুটো লামা। ঘাস থেকে, ঝোপ থেকে, গাছের ডাল থেকে বিচিত্র সব প্রাণী তাকিয়ে দেখতে লাগল ক্রিস্টোকে : বেড়াল-মুণ্ডু কুকুর, মোরগ-মুণ্ডু হাঁস, শিঙওয়ালা শুয়োর, ঈগল-চঞ্চু উটপাখি, পুমা-দেহী ভেড়া...

ক্রিস্টোর মনে হল সে এক দুঃস্বপ্ন দেখছে। চোখ রগড়াল সে, ফোয়ারার ঠাণ্ডা জলে মাথা ভেজাল, কিন্তু দুঃস্বপ্ন গেল না। পুকুরের জলে চোখে পড়ল মাছের পাখনা আর মাথাওয়ালা সাপ, ব্যাঙের পা-ওয়ালা মাছ, প্রকাণ্ড কোলাব্যাঙ টিকটিকির মতো লম্বা তার গড়ন...

ফের জায়গাটা থেকে পালাবার ইচ্ছে হল ক্রিস্টোর।

বালি-ঢালা একটা আঙিনায় ক্রিস্টোকে নিয়ে এল জিম। আঙিনার মাঝখানে দেখা গেল খেজুর গাছে ঢাকা শ্বেত পাথরের এক ভিলা, মুর স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। গাছের গুঁড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল খিলান আর থাম। ডলফিনের আকারের তামার ফোয়ারা থেকে জলের ধারা পড়ছে স্বচ্ছ জলাশয়গুলোয়, সোনালি মাছ ছলবল করছে সেখানে। সদর দরজার মুখে সবচেয়ে বড়ো ফোয়ারাটায় দেখা গেল ডলফিনের পিঠে-বসা এক তরুণের মূর্তি, মনে হয় যেন প্রাচীন গ্রিক পুরাকথার তরঙ্গ-দেব ট্রিটন, মুখে পাকানো একটা শাঁখ; নিশ্চয় প্রতিভাবান শিল্পীর গড়া, আশ্চর্য এ ভাস্কর্যের সজীবতা।

ভিলার পেছনে কয়েকটা বার-বাড়ি আর থাকার ঘর, তার ওপরে কাঁটাভরা ফণিমনসার জঙ্গল চলে গেছে সাদা দেয়াল পর্যন্ত। 'আরো একটা দেয়াল!' ভাবল ক্রিস্টো।

জিম তাকে নিয়ে এল অনতিবৃহৎ একটা ঠাণ্ডা কামরায়। ইঙ্গিতে বোঝাল যে ঘরটা তারই জন্য, তারপর ওকে একা রেখে অন্তর্ধান করল।

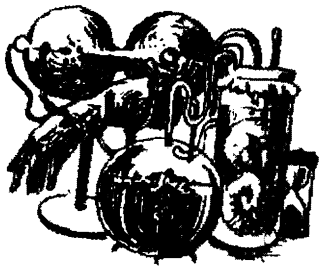

তৃতীয় দেয়াল

একটু একটু করে ক্রিস্টো তার চারপাশের এই অস্বাভাবিক জগতটায় অভ্যস্ত হয় এল।

বাগানের সমস্ত জন্তু, পাখি, সরীসৃপই পোষমানা। কয়েকটার সঙ্গে তো ক্রিস্টোর বন্ধুত্বই জমে উঠল। জাগুয়ারের মতো দেখতে যে কুকুরগুলো তাকে প্রথম দিন অমন ভয় পাইয়েছিল, সেগুলো এখন তার পায়ে-পায়ে ঘোরে, হাত চাটে, আদর কাড়ে। লামাগুলো তার হাত থেকে খায়।

টিয়ারা উড়ে এসে বসে তার কাঁধে।

বাগান আর জন্তুদের দেখাশুনা করত বারোজন নিগ্রো, সবাই জিমের মতোই নির্বাক। নিজেদের মধ্যেও কখনো তাদের আলাপ করতে দেখে নি ক্রিস্টো। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করে যেত চুপচাপ। জিম ছিল ওদের সর্দারের মতো। সবার কাজকর্ম বরাদ্দ আর দেখাশোনা করত সে। আর অবাক কাণ্ড, ক্রিস্টোকে করা হল কিনা এই জিমের সহকারী। কাজ তেমন বেশি কিছু ছিল না, খাওয়া-দাওয়া ছিল ভালোই, অন্য কোনো অসুবিধাও নেই। শুধু একটা জিনিস তাকে অস্থির করে তুলত—নিগ্রোগুলোর এই মর্মান্তিক নীরবতা। তার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে সালভাতর নিশ্চয় তাদের জিভ কেটে ফেলেছেন। তাই সালভাতর যখন মাঝে মধ্যে তাকে ডেকে পাঠান, তখন প্রতিবারই সে ভাবত, 'এই এবার জিভ কাটা যাবে।' তবে অচিরেই জিভের ভয় তার কমে এল।

একদিন তার চোখে পড়ল, অলিভ গাছের ছায়ায় চিত হয়ে শুয়ে ঘুম দিচ্ছে জিম, মুখটা তার হাঁ হয়ে আছে। এই সুযোগে ক্রিস্টো সন্তর্পণে তার মুখের ভেতরটায় উঁকি দিয়ে দেখল বুড়ো নিগ্রোর জিভ যথাস্থানেই আছে। সেই থেকে দুশ্চিন্তা তার গেল।

সালভাতরের দিন ছিল কড়া রুটিন-বাঁধা। সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত রোগী দেখতেন ডাক্তার, ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত অস্ত্রোপচার। তারপর চলে যেতে নিজের ভিলায়, ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। অস্ত্রোপচার করতে জন্তুদের ওপর, তারপর দীর্ঘদিন তাদের পর্যবেক্ষণে রাখতেন। পর্যবেক্ষণ পর্ব শেষ হলে তাদের পাঠিয়ে দিতেন বাগানে। ঘরদোর পরিষ্কার করার সময় ক্রিস্টো মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরিতে উঁকি দিয়েছে। আর যা দেখছে তাতে চোখ কপালে উঠেছে তার। কী সব তরল পদার্থে ভরা কাঁচের নানা বয়ামে সেখানে স্পন্দিত হচ্ছে নানারকম সব অঙ্গ। দিব্যি বেঁচে থাকছে কাটা হাত-পা। বিকল হলে সালভাতর তাদের সারিয়ে তোলেন, নতুন জীবন দেন।

এসব দেখে আতঙ্ক হত ক্রিস্টোর। বাগানের জীবন্ত বিকলাঙ্গদের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসত সে।

সালভাতরের বিশ্বাস অর্জন করলেও ক্রিস্টো তৃতীয় দেয়ালটির ওপাশে যাবার অধিকার পায় নি। আর এইটাই তাকে টানত বেশি। একবার দুপুরে সবাই যখন একটু গড়িয়ে নিচ্ছে,

তখন ক্রিস্টো ছুটে যায় সেখানে। দেয়ালের ওপাশ থেকে শোনা গেল শিশুর কণ্ঠস্বর, রেড-ইন্ডিয়ান ভাষা। মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে শোনা গেল সরু আরেকটা কার গলা, মনে হল যেন তর্ক করছে শিশুদের সঙ্গে, কথা কইছে দুর্বোধ্য কী এক উপভাষায়।

একদিন ক্রিস্টোকে বাগানে দেখে সালভাতর তার কাছে এসে অভ্যাসমতো সোজা চোখে-চোখে তাকিয়ে বললেন :

'একমাস তুই কাজ করছিস, ক্রিস্টো, আমি খুশি হয়েছি। নিচের বাগানে আমার একটি চাকরের অসুখ করেছে, তুই তার জায়গায় খাটবি। অনেক কিছু নতুন চোখে পড়বে তোর, কিন্তু চুক্তি মনে আছে তো? একটি কথাও নয়।'

'আপনার বোবা চাকরদের মধ্যে থেকে কথা বলা প্রায় ভুলেই গেছি, ডাক্তার'—বলল ক্রিস্টো।

'ভালোই হয়েছে। চুপ করে থাকতে পারলে, সেই যে বলে, সোনা মেলে। আশা করি সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ও ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা, তুই আন্দিজ পাহাড়ে এলাকা ভালো চিনিস?'

'পাহাড়েই আমার জন্ম।'

'চমৎকার। নতুন নতুন পশুপাখির যোগান আমার দরকার। তুই আমার সঙ্গে যাবি। আর এখন যা, জিম তোকে নিচের বাগানে নিয়ে যাবে।'

এর মধ্যেই অনেক কিছুতেই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ক্রিস্টোর, কিন্তু নিচের বাগানে যা সে দেখল সেটা তার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেল।

রোদ-ঢালা প্রকাণ্ড এক মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে ন্যাংটা ন্যাংটা শিশু আর বানর। নানা রেড-ইন্ডিয়ান উপজাতির ছেলেমেয়ে এরা। সবচেয়ে ছোটোগুলোর বয়স তিনের বেশি নয়, বড়োগুলোর বছর বারো। সবাই এরা ছিল সালভাতরের রোগী, অনেকেরই গুরুতর অপারেশন হয়েছিল, প্রাণ পেয়েছে সালভাতরের কৃপায়। পূর্ণ আরোগ্য লাভের আগে এখন খেলে বেড়াচ্ছে বাগানে, দেহে বল পেলে বাপ-মা তাদের নিয়ে যাবে বাড়িতে।

ছেলেমেয়েরা ছাড়াও এখানে ছিল বানর, লেজ নেই তাদের গায়ে, লোমও নেই।

সবচেয়ে আশ্চর্য, সব বানরই কথা বলে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তর্ক করত তারা, ঝগড়া করত, কিঁচকিঁচ করত সরু গলায়। তাহলেও তাদের সঙ্গে মোটের ওপর মিলেমিশেই থাকত তারা, ঝগড়াঝাঁটি কখনো স্বাভাবিকের মাত্রা ছাড়াত না। মাঝে মাঝে ক্রিস্টোর সন্দেহ হত, এরা সত্যিই বানর নাকি মানুষ?

ক্রিস্টো লক্ষ করল জায়গাটা ওপরকার বাগানের চেয়ে আকারে ছোটো, একেবারে খাড়াই নেমে গেছে সাগরে, দেয়ালের মতো একটা পাহাড় উঠেছে সেখানে। নিশ্চয়ই সাগরটা সে দেয়ালের ওপাশেই, তরঙ্গভঙ্গের গর্জন ভেসে আসত সেখান থেকে।

পাহাড়টাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে ক্রিস্টো দিনকয়েকের মধ্যেই টের পেল যে ওটা কৃত্রিম। আসলে ওটা আরেকটা দেয়াল—চতুর্থ! ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে ছেয়ে রঙের লোহার ফটক চোখে পড়ল তার।

কান পেতে শুনল ক্রিস্টো। সমুদ্রগর্জন ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা গেল না। কী আছে এই সঙ্কীর্ণ দরজাটার পেছনে? সমুদ্রতীর?

হঠাৎ শোনা গেল শিশুদের উত্তেজিত চিৎকার। সবাই ওরা তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ক্রিস্টোও মাথা তুলল, চোখে পড়ল ছেলেদের লাল একটা বেলুন ধীরে ধীরে উড়ে যাচ্ছে। বাতাসে সেটা ক্রমেই সাগরের দিকে ভেসে গিয়ে উধাও হয়ে গেল।

ছেলেদের সাধারণ একটা বেলুন, কিন্তু তাতে কেন জানি ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল ক্রিস্টো। চাকরটা ভালো হয়ে ফিরতেই সে সালভাতরের কাছে গিয়ে বলল :

'ডাক্তার, শিগগিরই আন্দিজ পাহাড়ে যাবো, হয়তো অনেক দিনের জন্যে। তাই অনুমতি দিন, একবারটি মেয়ে আর নাতনির সঙ্গে দেখা করে আসি।'

কেউ তাঁর বাড়ি ছেড়ে যাক এটা সালভাতর চাইতেন না। তাই নিঃসঙ্গ লোকদেরই তিনি পছন্দ করতেন। সালভাতরের চোখের দিকে তাকিয়ে নীরবে অপেক্ষা করে রইল ক্রিস্টো।

নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে ক্রিস্টোর দিকে চেয়ে ডাক্তার বললেন :

'শর্ত ভুলিস না। মুখ বন্ধ রাখবি। এখন যা, তিন দিনের মধ্যে ফিরবি! আচ্ছা, দাঁড়া!'

পাশের ঘরটা থেকে সালভাতর একটা সোয়েদের থলে আনলেন, ভেতরে ঠুনঠুন করে উঠল সোনার মোহর।

'তোর নাতনির জন্যে, আর তোর মুখ বুজে থাকার জন্যে।'

হামলা

'আজও যদি সে না আসে, তাহলে তোর ভরসা আমায় ছাড়তে হবে বালতাজার, আরো পাকা লোক বহাল করব, যারা কাজ দেবে'—বলল জুরিতা, অধীরের মতো হাত বুলাল পুরুষ্টু মোচটায়। এখন তার পরনে শহুরে সাদা স্যুট, মাথায় পানামা হ্যাট। বুয়েনাস-আইরেসের উপকণ্ঠে, যেখানে চষা খেত শেষ হয়ে পাম্পাস শুরু হয়েছে, সেখানে বালতাজারের সঙ্গে জুরিতার দেখা হল।

বালতাজারের পরনে সাদা ব্লাউজ, ডোরাকাটা নীল প্যান্ট, রাস্তার ধারে বসে সে নীরবে রোদপোড়া ঘাস ছিঁড়ছিল।

সালভাতরের কাছে চর হিশেবে ভাই ক্রিস্টোকে পাঠিয়েছে বলে নিজেরই তার আফসোস হচ্ছিল।

বয়সে ক্রিস্টো বালতাজারের চেয়ে দশ বছরের বড়ো। এত বয়সেও শক্তি ও ক্ষিপ্রতা তার কমে নি। সেয়ানা সে পাম্পাসের বেড়ালের মতো। তাহলেও তার ওপর ভরসা রাখা কঠিন। প্রথমে চাষবাস করার চেষ্টা করে সে। সেটা তার কাছে একঘেয়ে লাগল। তারপর বন্দরে একটা শুঁড়িখানা খোলে; কিন্তু মদ তাকে খায়, দোকান পাটে ওঠে। কিছুকাল থেকে ক্রিস্টো নানা রকম ধড়িবাজির গোপন কাজে আছে, নিজের ধূর্ততা কাজে লাগায়, বেইমানি করতেও বাধে না। চরের কাজে এমন লোক উপযুক্ত বটে, তবে তার ওপর বিশ্বাস রাখা কঠিন। নিজের সুবিধা দেখলে আপন ভাইয়ের প্রতিও সে বেইমানি করতে পারে। বালতাজারের সেটা জানা ছিল, তাই জুরিতার চেয়ে দুশ্চিন্তা তারও কম নয়।

'তুই যে বেলুন ছেড়েছিলি সেটা ক্রিস্টোর চোখে পড়েছে বলে তুই নিশ্চিত?'

অনির্দিষ্টের মতো কাঁধ ঝাঁকাল বালতাজার। ইচ্ছে হচ্ছিল সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে বাড়ি চলে যা, ঠাণ্ডা জল আর সুরায় গলাটা একটু ভিজিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে।

সূর্যের শেষ রশ্মিতে ভেসে উঠল টিলার ওপাশ থেকে ওঠা ধুলোর কুণ্ডলী। তীক্ষ্ণ টানা একটা শিস শোনা গেল।

চঞ্চল হয়ে উঠল বালতাজার।

'ও-ই!'

'এল তাহলে!'

চটপট পা চালিয়ে আসছিল ক্রিস্টো। এখন আর তাকে মোটেই এক জীর্ণ, বৃদ্ধ রেড-ইন্ডিয়ান বলে মনে হচ্ছিল না। সে জুরিতা আর বালতাজারের কাছে এসে নমস্কার জানাল।

'তা কী, 'দরিয়ার দানো'র সঙ্গে দেখা হল?'

'এখনো হয় নি, তবে ওখানেই আছে সে। সালভাতর তাকে রাখে চার নম্বর দেয়ালের ওপাশে। বড়ো কথা, সালভাতরের চাকরি করছি। আমায় সে বিশ্বাস করে। রুগী নাতনির চালটা আমার ভালোই উৎরেছে'—ধূর্ত চোখ কুঁচকে হেসে উঠল ক্রিস্টো।

'নাতনিটিকে জুটালি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জুরিতা।

'টাকাই জোটে না, মেয়ে জুটতে কতক্ষণ'—বললে ক্রিস্টো, 'মেয়ের মা-ও খুশি। আমি পেলাম পাঁচ পেসোর নোট, মা পেল নীরোগ খুকি।'

সালভাতরের কাছ থেকে সে যে সোনার মোহরের থলেও পেয়েছে, সে কথাটা ক্রিস্টো ভাঙলে না। মেয়ের মাকে সে টাকার ভাগ দেবার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

'একেবারে আজব ব্যাপার! দিব্যি এক চিড়িয়াখানা!' বলে কী কী দেখেছে সে কথা গল্প করলে ক্রিস্টো।

'এসবই ভালো কথা'—চুরুটে টান দিয়ে বলল জুরিতা, 'কিন্তু প্রধান জিনিস 'দানো'কে তুই দেখতে পাস নি। এর পরে কী করবি ভাবছিস ক্রিস্টো?'

'পরে? অল্প একটু বেড়ানো যাবে আন্দিজ পাহাড়ে'—বলে ক্রিস্টো জানাল যে সালভাতর শিকারে যাবার আয়োজন করছেন।

'চমৎকার!' লাফিয়ে উঠল জুরিতা, 'সালভাতরের কুঠি লোকজনের বসতি থেকে অনেক দূরে। ও যখন থাকবে না, তখন হামলা করে লুটে নেব 'দরিয়ার দানো'কে।'

আপত্তি করে মাথা নাড়লে ক্রিস্টো।

'জাগুয়ারগুলো আপনার টুঁটি ছিঁড়ে নেবে। তাছাড়া 'দানো'কেও খুঁজে পাবেন না। আমিই দেখি নি, আপনারা পাবেন কোত্থেকে।'

'তাহলে শোন্'—একটু ভেবে বললে জুরিতা, 'সালভাতর যখন শিকারে যাবে, তখন আমরা হামলা করে তাকে কয়েদ করব। মুক্তিপণ হিশেবে দাবি করব 'দরিয়ার দানো'কে।'

জুরিতার পাশ-পকেটে থেকে বেরিয়ে আসা একটা চুরুট চট করে তুলে নিলে ক্রিস্টো:

'ধন্যবাদ। সেটা বরং ভালো, তবে সালভাতর ঠকাবে। বলবে দেব, কিন্তু দেব না। এইসব স্পেনীয়রা...' কাশল ক্রিস্টো।

'তাহলে তুই কী করতে বলছিস?' বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করল জুরিতা।'

ধৈর্য ধরতে হবে, জুরিতা। ধৈর্য। সালভাতর আমায় বিশ্বাস করে বটে, তবে সে শুধু ঐ চার নম্বর দেয়ালটি পর্যন্ত। আগে দরকার আমায় সে একেবারে অন্তরঙ্গের মতো বিশ্বাস করুক।

তাহলে নিজেই সে আমায় 'দানো'কে দেখাবে।'

'তাহলে?'

'তাহলে এই। ডাকাত পড়বে সালভাতরের ওপর'—জুরিতার বুকে টোকা দিল ক্রিস্টো, 'আর আমি...' নিজের বুকে চাপড় মারল সে, 'একজন প্রভুভক্ত আরাউকানি, তার জীবন বাঁচাব। তখন সালভাতরের বাড়ির কিছুই গোপন থাকবে না ক্রিস্টোর কাছে। আর আমার থলেটাও ভরে উঠবে সোনার মোহরে।' শেষ বাক্যটি অবিশ্যি সে ভাবলে মনে মনে।

'তা খারাপ নয় ফন্দিটা।'

ঠিক করে নিল কোন্ পথ দিয়ে সালভাতরকে নিয়ে যাবে ক্রিস্টো।

'রওনা দেবার আগের দিন আমি দেয়ালের ওপাশে লাল পাথর ছুড়ে দেবে। তৈরি থাকবেন।'

পরিকল্পনাটি খুবই সুচিন্তিত হলেও একটি অভাবিত ঘটনায় ব্যাপারটা প্রায় পণ্ড হতে বসেছিল।

পাম্পাস অধিবাসী আধা-বুনো উপজাতি গাউচো'দের পোশাকে সেজে জুরিতা, বালতাজার এবং বন্দরে ভাড়া করা জনদশেক খুনে রীতিমতো সশস্ত্র হয়ে ঘোড়ার পিঠে ওঁৎ পেতে ছিল বসতি থেকে অনেকখানি দূরে।

রাতটা ছিল অন্ধকার। সবাই কান পেতে আছে কখন ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠবে।

হঠাৎ ডাকুদের কানে এল দ্রুত একটা মোটরের গুঞ্জন কাছিয়ে আসছে। তারপর চোখ ধাঁধিয়ে ঝলসে উঠল দুটো হেড-লাইটের আলো। ব্যাপার কী বুঝতে না বুঝতেই মস্ত একটা কালো মোটরগাড়ি ছুটে গেল সওয়ারিদের সামনে দিয়ে।

ক্ষেপে মুখ খিস্তি করতে লাগল জুরিতা। বালতাজারের হাসি পেল।

বলল, 'ভাবনা নেই মালিক, দিনে খুব গরম, তাই রাতে যাচ্ছে। দিনে জিরুবে। আমরা ওদের নাগাল ধরতে পারব'—বলে ঘোড়া ছোটালে বালতাজার, তার পেছু পেছু বাকিরা।

ঘণ্টা দুয়েক ছোটার পর হঠাৎ সামনে দেখা গেল অগ্নিকুণ্ড।

'এ ওরাই। কিছু একটা ঘটেছে। দাঁড়িয়ে থাকো। আমি বুকে হেঁটে দেখে আসি।'

ঘোড়া থেকে নেমে বালতাজার সাপের মতো বুকে হাঁটতে লাগল। ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে।

'গাড়ি বিকল। সারাচ্ছে ওরা। ক্রিস্টো আছে পাহারায়। তাড়াতাড়ি করতে হয়।'

পরের ঘটনাগুলো ঘটল খুবই দ্রুত। হুড়মুড়িয়ে ডাকাত এসে পড়ল, দেখতে না দেখতেই তারা সালভাতর, ক্রিস্টো আর তিনজন নিগ্রোর হাত-পা বেঁধে ফেলল।

জুরিতা রইল আড়ালে, ভাড়াটে ডাকুদের সর্দার মস্ত একটা মুক্তিপণ দাবি করল সালভাতরের কাছে। সালভাতর বললেন :

'টাকা দিয়ে দেব, এখন ছেড়ে দাও।'

'ওটা শুধু তোমার জন্যে। সঙ্গীর জন্যেও সমান টাকা লাগবে'—বলল ডাকাত। 'চট করেই অত টাকা দিতে পারব না'—একটু ভেবে বললেন সালভাতর।

'তাহলে মরতে হবে ওকে।' গর্জন করল ডাকুরা।

'আমাদের শর্তে রাজি না হলে ভোরেই খুন করব'—বলল সর্দার।

'হাতে আমার অত টাকা নেই'—কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন সালভাতর।

সালভাতরের স্থৈর্য দেখে ডাকুরাও অবাক হল।

মোটরের পেছনে বন্দিদের ঠেলে দিয়ে ডাকুরা তল্লাশ শুরু করল। কোত্থেকে টেনে বার করল বেশ কিছু স্পিরিট।

সেটা খেয়ে মাতাল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সবাই।

ভোরের কিছু আগে সন্তর্পণে কে যেন ছেঁচড়ে এল সালভাতরের কাছে।

'আমি'—আস্তে করে বলল ক্রিস্টো, 'বাঁধন আমি খুলে ফেলেছি। গুড়ি মেরে বন্দুকধারী ডাকাতটার কাছে গিয়ে শেষ করে দিয়েছি ওকে। বাকিরা সবাই নেশায় বেঘোর। ড্রাইভার গাড়ি সারিয়ে রেখেছে। তাড়াতাড়ি করা দরকার।'

ঝটপট গাড়িতে উঠে বসল সবাই। নিগ্রো ড্রাইভার স্টার্ট দিলে। ছুটে বেরিয়ে গেল মোটর। পেছনে শোনা গেল হল্লা আর এলোমেলো গুলির শব্দ।

সজোরে ক্রিস্টোর হাতে চাপ দিলেন সালভাতর।

সালভাতর চলে যাবার পর জুরিতা তার ডাকুদের কাছ থেকে জানল যে সালভাতর মুক্তিপণ দিতে রাজি হয়েছিলেন। 'মুক্তিপণ নেওয়া ভালোই ছিল নাকি'—ভাবল সে, 'দরিয়ার দানো'। জিনিসটা কী কে জানে, হরণ করে আদৌ লাভ হবে কিনা ঠিক নেই। কিন্তু সুযোগ ততক্ষণে ফসকে গেছে। এখন ক্রিস্টোর কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

উভচর মানুষ

ক্রিস্টো ভেবেছিল, সালভাতর তার কাছে এসে বলবেন, 'ক্রিস্টো তুই আমার জীবন বাঁচিয়েছিস। এবার তোর কাছ থেকে আমার লুকোবার কিছু নেই। চল তোকে 'দানো দেখাব।'

কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ সালভাতর দেখালেন না। প্রাণলাভের জন্য ক্রিস্টোকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে নিজের বৈজ্ঞানিক কাজে ডুবে রইলেন তিনি।

সময় নষ্ট না করে ক্রিস্টো চতুর্থ দেয়াল আর গোপন দরজাটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। অনেক প্রচেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত রহস্য সে ভেদও করল। একদিন দরজাটা হাতড়াতে হাতড়াতে ছোটো একটা ফুলো মতো কী হাতে ঠেকল। সেটা টিপতেই হঠাৎ খুলে গেল দরজাটা। লোহার সিন্দুকের পাল্লার মতো তা ভারী আর পেল্লায়। ক্রিস্টো চট করে ভেতরে ঢুকতেই ঝট করে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। হতভম্ব ক্রিস্টো তন্নতন্ন করে খুঁজে সবকটি ফুলোতে টিপে দেখল, দরজা কিন্তু খুলল না।

'নিজেই ফাঁদে পড়ে গেলাম'—গজগজ করল ক্রিস্টো।

কিন্তু করবার কিছু ছিল না। তাই সালভাতরের এই শেষ, অদৃশ্য বাগানটাই সে দেখবে ঠিক করল।

প্রচণ্ড ঝোপঝাড়ে-ভরা বাগান সেটা, দেখতে একটা গহ্বরের মতো, কৃত্রিম পাহাড়ের উঁচু দেয়ালে চারদিকে ঘেরা। শুধু তরঙ্গের ডাক নয়, বালুর ওপর নুড়ির সড়সড়ানিও বেশ শোনা যাচ্ছিল।

এখানকার গাছপালাগুলো সব সেই ধরনের যা সোঁদা মাটিতে গজায়। বড়ো বড়ো গাছ ভেদ করে রোদ নামে না নিচে, তলায় অজস্র প্রস্রবণ। ডজনখানেক ফোয়ারায় জল ছিটাচ্ছে, আর্দ্র হয়ে আছে বাতাস। মিসিসিপির ভাঁটি অঞ্চলের মতো জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে। বাগানের মাঝখানে সমতল ছাদের এই ছোট্ট পাথুরে বাড়ি। দেয়ালগুলো সব লতায় ঢাকা, জানলার সবুজ খড়খড়ি বন্ধ, মনে হয় কোনো লোক থাকে না এখানে।

বাগানের প্রান্ত পর্যন্ত এগোলো ক্রিস্টো। বাগান আর উপসাগরের মাঝখানকার দেয়ালটার কাছে দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা চৌকো সুইমিংপুল, চারদিকে গাছ বসানো, আয়তনে অন্তত পাঁচশ বর্গমিটার, গভীরতায় পাঁচ মিটারের কম নয়।

ক্রিস্টো কাছে আসতেই কী একটা প্রাণী সভয়ে ঝোপ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলে, ছিটকে উঠল জল। দুরুদুরু বুকে থেমে গেল ক্রিস্টো। ও-ই বটে! 'দরিয়ার দানো'। শেষ পর্যন্ত ক্রিস্টো তাকে দেখতে পাবে তাহলে।

কাছে এসে স্বচ্ছ জলে তাকিয়ে দেখল ক্রিস্টো।

পুলের তলে শ্বেত পাথরের পাটার ওপর বসে আছে একটা মস্ত বানর। কিছুটা ভয় আর কিছুটা কৌতূহলে সে জলের তল থেকে চেয়ে দেখছিল ক্রিস্টোর দিকে। বিস্ময়ে ক্রিস্টো

কূল পাচ্ছিল না : জলের তলে নিশ্বাস নিচ্ছে বানরটা, ওঠা-নামা করছে তার বুক।

অবাক হয়ে ক্রিস্টো আপনা থেকেই হেসে উঠল : যে 'দানো'র ভয়ে জেলেরা মরছে, সে কিনা এক স্থল-জলবাসী বানর ; 'কী না ঘটে দুনিয়ায়'—ভাবল সে।

খুশি হয়েছিল ক্রিস্টো, শেষ পর্যন্ত সবকিছুই ওর দেখা হল। কিন্তু সেই সঙ্গে হতাশও লাগল, প্রত্যক্ষদর্শীরা যে বর্ণনা দেয়, বানরটা মোটেই সেরকম পৈশাচিক নয়। ভয়ে লোকে কী না দেখে।

কিন্তু এবার ফেরার কথা ভাবতে হয়। দরজার কাছে ফিরে এল ক্রিস্টো, বেড়ার কাছে মস্তো এক গাছে উঠে লাফ দিলে উঁচু দেয়ালটা থেকে। পা ভাঙারও পরোয়া করল না।

মাটি থেকে দাঁড়িয়ে উঠতেই শোনা গেল সালভাতরের গলা :

'ক্রিস্টো, কোথায় তুই?'

পথের ওপর পড়ে থাকা একটা আঁচড়া নিয়ে শুকনো পাতা সরাতে লাগল ক্রিস্টো। বলল:

'আমি এইখানে।'

'চল্ ক্রিস্টো, যাই'—পাহাড়রে গায়ে গোপন দরজাটার কাছে এসে বললেন সালভাতর, 'দেখে রাখ, দরজাটা খোলে এইভাবে। খসখসে দরজাটার ওপরকার সেই ফুলোটা টিপলেন সালভাতর, যা ক্রিস্টো আগেই জানে।

ভাবল, 'ডাক্তারের একটু দেরি হয়ে গেছে। 'দানো'কে আমি আগেই দেখে নিয়েছি।'

বাগানে ঢুকল দু'জনে। লতায় ঢাকা বাড়িটা ঘুরে সালভাতর এগিয়ে গেলেন সুইমিং পুলটার দিকে। বানরটা তখনো বসে আছে জলের তলে, ভুড়ভুড়ি ছাড়ছে। বিস্ময়ের শব্দ করে উঠল, ক্রিস্টো যেন জিনিসটা সে এই প্রথম দেখল। কিন্তু তার পরেই সত্যি করেই অবাক হতে হল তাকে।

বানরটার দিকে কোনো মন দিলেন না সালভাতর, শুধু হাত নেড়ে যেন ওটাকে সরে যেতে বললেন। বানরটাও ভেসে ওপরে উঠে গা ঝাড়া দিলে, তারপর চেপে বসল একটা গাছে। সালভাতর নিচু হয়ে ঘাসের মধ্যে লুকানো একটা ছোট্ট সবুজ পাতে জোরে চাপ দিলেন। একটা চাপা শব্দ শোনা গেল, পুলের চারপাশ দিয়ে খুলে গেল কতকগুলো হ্যাচ, মিনিটখানেকের মধ্যেই অদৃশ্য হল সমস্ত জল। কোত্থেকে বেরিয়ে এল একটা লোহার সিঁড়ি, নেমে গেছে তা তল পর্যন্ত।

'চল্ ক্রিস্টো।'

পুলের নিচে নামল তারা। একটা পাটায় চাপ দিলেন সালভাতর, সঙ্গে সঙ্গেই পুলের মাঝখানে এক বর্গামিটার চওড়া একটা নতুন হ্যাচ খুলে গেল। সেখান থেকে লোহার সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির কোন অতলে।

সালভাতরের পেছন পেছন সেটা বেয়ে নামতে লাগল ক্রিস্টো। নামল অনেকক্ষণ ধরে। হ্যাচের মধ্যে দিয়ে ফিকে আলো আসছিল নিচে, অচিরে সেটাও ফুরিয়ে গেল। চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ধরল জমাট অন্ধকার। শুধু পদশব্দের একটা ফাঁপা প্রতিধ্বনি উঠছিল ভূগর্ভের করিডোরে।

'হোঁচট খাস নে ক্রিস্টো, প্রায় এসে গেছি।'

থেমে দেয়াল হাতড়াতে লাগলেন সালভাতর। সুইচের শব্দ হল, জ্বলে উঠল ঝলমলে আলো। দেখা গেল তারা দাঁড়িয়ে আছে একটা চুনা পাথুরে গুহায়, সামনে একটা ব্রোঞ্জের দরজা, তাতে সিংহের মুখ থেকে ঝুলছে কড়া। একটা কড়া টানলেন সালভাতর। ভারী পাল্লাটা আলগোছে খুলে গেল, অন্ধকার একটা হলে ঢুকল ওরা। ফের সুইচের শব্দ হল।

অস্বচ্ছ একটা গোলাকার বাতিতে আলো হয়ে উঠল বিস্তীর্ণ গুহাটা, একটা দেয়াল তার কাচের। আরেকটা সুইচ টিপলেন সালভাতর, গুহা ঢেকে গেল অন্ধকারে আর কাচের ওপাশের এলাকাটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল জোরালো সার্চ লাইটে। মনে হল সেটা যেন একটা প্রকাণ্ড অ্যাকুয়ারিয়ম, অথবা সমুদ্রের তলদেশে কাচের একটা বাড়ি। মাটি থেকে উঠেছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ, প্রবালের ঝাড়, ছলবলিয়ে উঠছে মাছ। হঠাৎ ক্রিস্টোর চোখে পড়ল ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষের মতো দেখতে একটা প্রাণী, দুই চোখ তার টিপ-টিপ, বড়ো ব্যাঙের মতো পায়ের পাতা। গায়ে নীলাভ রুপোলি আঁশ। ক্ষিপ্র সাঁতার দিয়ে প্রাণীটা উঠে এল কাচের দেয়ালের কাছে। সালভাতরের উদ্দেশে মাথা নেড়ে, দরজা খুলে, একটা আবদ্ধ কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দ্রুত নিঃসৃত হয়ে গেল কামরার জল। তখন অন্য দরজা খুলে প্রাণী এসে দাঁড়াল গুহায়।

সালভাতর বললেন, 'চশমা, দস্তানা খুলে ফেল।'

বাধ্যের মতো অজানা প্রাণীটা চশমা, দস্তানা, খুলতেই ক্রিস্টো দেখলে সামনে তার দাঁড়িয়ে আছে সুকুমার এক তরুণ।

'আলাপ করে নে। এ হল ইকথিয়ান্ডর, অথবা মৎস্যপুরুষ, কিংবা উভচর, এই হল 'দরিয়ার দানো।' পরিচয় দিলেন সালভাতর।

অমায়িক হেসে তরুণ হাত বাড়িয়ে দিল ক্রিস্টোর দিকে। স্প্যানিশ ভাষায় বলল :

'নমস্কার।'

নীরবে করমর্দন করল ক্রিস্টো। বিস্ময়ে তার মুখে কথা ফুটল না।

'ইকথিয়ান্ডরের নিগ্রো চাকরটির অসুখ করেছে'—বললেন সালভাতর, 'দিন কয়েকের জন্যে তুই ইকথিয়ান্ডরের কাজ করবি। যদি ঠিকমতো করতে পারিস তাহলে এখানেই তোর পাকা চাকরি হবে।'

নীরবে মাথা নাড়ল ক্রিস্টো।

ইকথিয়ান্ডরের একদিন

তখনো রাত, তবে ভোর হতে বাকি নেই।

উষ্ণ আর্দ্র বাতাস, ম্যাগ্নোলিয়া, টিউবরোজ, মিনোনেটের গন্ধে ভরা। একটি পাতাতেও কাঁপন নেই। চারিদিকে স্তব্ধ। বাগানের বালু-ঢালা পথ দিয়েই হাঁটছে ইকথিয়ান্ডর। কোমরের বেল্ট থেকে দুলছে ছোরা, চশমা, হাত-পায়ের দস্তানা—তার 'ব্যাঙের থাবা'। শুধু পায়ের তলে মুড়মুড়িয়ে উঠছে শাঁখের গুঁড়ো। রাস্তা প্রায় চোখেই পড়ে না। ঝোপঝাড়গুলো আন্দাজ করা যায় তাদের নিরাকার কালো কালো ছাপ দেখে। কুয়াশা উঠছে জলাশয়গুলো থেকে। মাঝে মাঝে এক-একটা ডাল সরিয়ে দিচ্ছে ইকথিয়ান্ডর—শিশির ঝরে পড়ছে তার চুল আর তপ্ত গালে।

ডাইনে একটা খাড়া মোড় নিয়ে পথটা নেমে গেছে ঢালুতে। বাতাস হয়ে উঠছে আরো তাজা আর সোঁদা। পায়ের নিচে পাথরের পাটাগুলো টের পেল ইকথিয়ান্ডর, গতি কমিয়ে থেমে গেল সে। ধীরেসুস্থে পরলে তার চশমা, হাত-পায়ের দস্তানা। ফুসফুস থেকে সমস্ত নিশ্বাস বার করে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। একটা তাজা আমেজে ছেয়ে গেল তার দেহ, ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগল কানকোয়, তালে তালে তা এখন ওঠা-নামা করতে শুরু করেছে, মানুষ পরিণত হয়ে গেছে মাছে।

হাতের কয়েকটা সাপটে একেবারে তলে নেমে এর ইকথিয়ান্ডর।

পরিপূর্ণ অন্ধকারেও সাঁতরাতে তার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। হাত বাড়িয়ে সে পাথুরে দেয়ালে একটার পর একটা লোহার আঙটা ধরে চলে যায় জলভরা টানেলটা পর্যন্ত। সামনে থেকে আসা ঠাণ্ডা স্রোত উজিয়ে সে হাঁটে। পায়ে ধাক্কা দিয়ে উঠে আসে ওপরে, গরম জলের স্রোত সেখানে। বাগানের তপ্ত জল টানেলের ওপর দিকটা দিয়ে বয়ে যায় খোলা সাগরে। এবার ইকথিয়ান্ডর স্রোতে গা ভাসাতে পারে। বুকে হাত জড়ো করে চিত হয়ে সে ভেসে যায় মাথা এগিয়ে দিয়ে।

শেষ হয়ে আসছে টানেল। সমুদ্রে পড়ার মুখে শিলার ফাটল থেকে তোড়ে বেরিয়ে আসছে তপ্ত স্রোত, সড়সড় করে উঠছে পাথর, শাঁখ।

উপুড় হয়ে ইকথিয়ান্ডর তাকিয়ে দেখে সামনে অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে দেয় সে। জল সামান্য তাজা হয়ে উঠেছে। হাত ঠেকে লোহার গরাদে। শিকলগুলো নরম পিছল শ্যাওলা আর খড়খড়ে শামুকে ঢাকা। জটিল তালাটা খোলে সে। টানেলের গোল, গরাদে-দেওয়া ভারি দরজাটা সরে যায় ধীরে ধীরে। গহ্বরে বেরিয়ে আসে ইকথিয়ান্ডর, পেছনে বন্ধ হয়ে যায় দরজা।

খোলা সাগরে রওনা দেয় উভচর মানুষ, হাতে পায়ে জল কাটে। এখনো সবই অন্ধকার। অন্ধগভীরে কোথাও কোথাও ঝলসে ওঠে নকটিলুসির নীলাভ ফুলকি, জেলি-মাছের

লালছে আভা। তবে শিগগিরই ভোর হবে, আলো-দেয়া জীবগুলো একে পর এক নিবিয়ে দেবে তাদের বাতি।

কানকোয় হাজার হাজার সুঁই ফোটার অনুভূতি ইকথিয়ান্ডরের। কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। তার মানে পাথুরে অন্তরীপটা পেরিয়ে সে কাদা, বালি আর নানারকম আবর্জনাভরা জলস্রোতটায় এসে পড়েছে। একটা নদী এখানে এসে মিলেছে সাগরে। জল লোনা নয়।

'সত্যি, নদীর মাছেরা এই রকম অলবণাক্ত ঘোলা জলে থাকে কী করে'—ভাবলে ইকথিয়ান্ডর, 'ওদের কানকোগুলো নিশ্চয় পলি কাদা টের পায় না।'

একটু ওপরে উঠল ইকথিয়ান্ডর, সোজা বাঁক নিল ডাইনে, দক্ষিণের দিকে, তারপর নামতে লাগল গভীরে। জল এখানকার পরিষ্কার। ঠাণ্ডা একটা স্রোতের মধ্যে পড়ল সে। তীর বরাবর দক্ষিণ থেকে উত্তরে এটা চলে গেছে পারানা নদীর সঙ্গম পর্যন্ত, ঠাণ্ডা স্রোতটা এখানে ধাক্কা খেয়ে বেঁকে যায় পুবের দিকে। স্রোতটা এমনিতে অনেক গভীরে, তবে ওপরকার সীমাটা সাগরপৃষ্ঠ থেকে মাত্র পনের-কুড়ি মিটার নিচে। ফের এবার স্রোতে গা ছেড়ে দিতে পারে ইকথিয়ান্ডর—খোলা সমুদ্রে অনেক দূর তা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একটু চোখ বুজলেও ক্ষতি নেই। বিপদ নেই কিছু, এখনো অন্ধকার, সমুদ্রের হিংস্র প্রাণীরা এখনো ঘুমোচ্ছে। সূর্য ওঠার আগে একটু গড়িয়ে নিতে কী আরাম! চামড়ায় টের পাওয়া যায় বদলিয়ে যাচ্ছে জলের তাপমাত্রা, স্রোতের ধারা।

কানে লাগে চাপা ঝনঝনে শব্দ—আরো, আরো। ওটা নোঙরের শেকলের শব্দ। ইকথিয়ান্ডরের কাছ থেকে কয়েক কিলোমটার দূরে মাছ-ধরা জাহাজগুলো নোঙর তুলছে। সকাল হতে আর বাকি নেই। আর ঐ যে বহু দূরের তালমাপা গুঞ্জন—ওটা হল ব্রিটিশ জাহাজ 'হরোক্স'-এর ইঞ্জিনের আওয়াজ—মস্ত এই জাহাজটা চলাচল করে বুয়েনাস-আইরেস আর লিভারপুলের মধ্যে। এখনো ওটা চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, কিন্তু শোনা যাচ্ছে কী স্পষ্ট। সমুদ্রের জলে ধ্বনির গতিবেগ যে সেকেন্ডে দেড় হাজার মিটার। রাত্রে কী সুন্দর দেখায় 'হরোক্স' জাহাজকে—ঠিক যেন এক ভাসন্ত শহর, আলোয় আলোময়। তবে রাত্রে ওটাকে দেখতে হলে সন্ধে থেকেই পাড়ি দিতে হয় খোলা সাগরের অনেকখানি। বুয়েনাস-আইরেসে ওটা আসে প্রভাতী সূর্যের আলোয়, নিজের বাতিগুলো তখন ওর নেভানো। না, আর ঝিমুলে চলবে না। ওর প্রপেলার, ইঞ্জিন, আলো আর দুলুনি দিয়ে 'হরোক্স' শিগগিরই সমুদ্রের সব বাসিন্দাদের জাগিয়ে দেবে। নিশ্চয় 'হরোক্স' আসার খবর সবার আগে ডলফিনরাই টের পেয়েছে, মিনিট কয়েক আগে যে একটা হালকা তরঙ্গে ইকথিয়ান্ডর সচকিত হয়ে উঠেছিল, সেটা ওদেরই কীর্তি। নিশ্চয় ওরা এতক্ষণ জাহাজের দিকে সাঁতরাতে শুরু করেছে।

চারিদিক থেকে শোনা গেল জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ, জেগে উঠছে বন্দর আর খাঁড়ি। চোখ মেলে ইকথিয়ান্ডর, মাথা নেড়ে শেষ তন্দ্রাটুকুও যেন ঝেড়ে ফেলে, হাত-পা নেড়ে উঠতে থাকে জলের ওপরে।

সন্তর্পণে সে মাথা তোলে, তাকিয়ে দেখে। না, আশেপাশে নৌকো কি জাহাজ কিছু নেই। জলের ওপর কোমর পর্যন্ত উঠে সে ধীরে ধীরে সাঁতরাতে থাকে পা দিয়ে।

জলের ওপর নিচু দিয়ে উড়ছে বালিহাঁস আর গাঙচিল। মাঝে মাঝে তাদের বুক কী পাখার ছোঁয়ায় গোলগোল তিরতিরানি ছড়িয়ে পড়েছে জলের উপর। গাঙচিলগুলোর ডাক শুনে মনে হয় শিশুর কান্না। বিশাল ডানা মেলে, হাওয়ার ঝড় তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা তুষারধবল অ্যালবাট্রস। বিশাল ডানার ওপরটা তার কালো, লালচে চঞ্চু হলুদে শেষ হয়েছে, কমলারঙা পা। উড়ে গেল সে খাঁড়ির দিকে। একটু ঈর্ষাভরেই ইকথিয়ান্ডর

ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে। দুই পাখার প্রসার চার মিটারের কম নয়। কী ভালোই হত অমন পাখা পেলে।

পশ্চিমে রাত লুকুচ্ছে দূর পাহাড়গুলোর পেছনে। লাল হয়ে উঠছে পুব। সমুদ্রের বুকে আবছা তরঙ্গ, তাতে সোনালি ছটা। ওপরে ওড়া সাদা গাঙচিলগুলো হয়ে উঠছে গোলাপি।

সমুদ্রের ফ্যাকাশে জলে নীল-ফিরোজা নক্সা। বাতাসের প্রথম ঝাপটার স্বাক্ষর। নীল নক্সাগুলো বড়ো হয়ে উঠছে, জোর বাড়ছে বাতাসের। বালুময় তটে দেখা দিচ্ছে তরঙ্গভঙ্গের প্রথম হলুদ-সাদা ফেনা। তীরের কাছে জল হয়ে উঠছে সবুজ।

কাছিয়ে আসে পুরো একদল মেছো জাহাজ। বাবার নির্দেশ আছে লোকের চোখে যেন না পড়ি। ইকথিয়ান্ডর জলের গভীরে ডুব দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতটায় গিয়ে পড়ল। ভেসে যেতে লাগল সে তীর থেকে দূরে, পুবের দিকে, খোলা সাগরে। চারদিকেই সমুদ্রগভীরে নীল-বেগুনি অন্ধকার। সাঁতরে যাচ্ছে মাছ, মনে হয় ডোরাকাটা, কালচে বুটিদার, জ্বলজ্বলে সবুজ তাদের রঙ। লাল, হলুদ, বাসন্তী, বাদামি রঙের মাছগুলোকে মনে হয় ঝাঁক-বাঁধা প্রজাপতি।

ওপর থেকে গুরুগুরু আওয়াজ আসে, জল হয়ে উঠে অন্ধকার। নিশ্চয় নিচ-দিয়ে উড়ে গেল কোনো সামরিক সি-প্লেন।

একবার এমনি একটা সি-প্লেন নেমেছিল জলে। ইকথিয়ান্ডর চুপিচুপি তার লোহার ফ্লোটটা ধরে উঁকি দিতে গিয়েছিল এবং...আরেকটু হলেই প্রাণটি তার যেত। হঠাৎ স্টার্ট নিলে সি-প্লেন, মিটার দশেক উঁচু থেকে উল্টে পড়ে ইকথিয়ান্ডর।

মাথা তুললে ইকথিয়ান্ডর। সূর্য প্রায় মাথার ওপরেই। দুপুর হয়ে আসছে। জলের উপরিভাগটা এখন আর তেমন আয়নার মতো নয় যাতে চড়ার পাথর, বড়ো বড়ো মাছ, খোদ ইকথিয়ান্ডরকেও চোখে পড়বে। সে আয়না এখন বেঁকে গেছে, অবিরাম বদলে যাচ্ছে।

ওপরে উঠে এল ইকথিয়ান্ডর, চারদিকে তরঙ্গের দোলা। জল থেকে চেয়ে দেখল সে, উঠল ঢেউয়ের চূড়োয়, ফের নেমে এল, আবার উঠল। আরে, কী শুরু হয়েছে এখন! তীরের তরঙ্গভঙ্গ এখন গর্জন তুলেছে, ছিটকে ফেলছে নুড়ি-পাথর। উপকূলের জল হয়ে উঠেছে হলুদ-সবুজ। চড়া হাওয়া বইছে দক্ষিণ-পশ্চিমে। বেড়ে উঠছে ঢেউ। চূড়ায় তাদের সাদা সাদা ফেনা। অনবরত জলের ছিটে লাগছে ইকথিয়ান্ডরের গায়ে, ভালো লাগছে তার।

'আচ্ছা, এটা কেন মনে হয় বলো তো'—ভাবলে ইকথিয়ান্ডর 'ঢেউয়ের মুখোমুখি সাঁতরালে মনে হয় ওটা কালচে-নীল, আর পেছনে তাকালে দেখা যায় সাদা?'

ঢেউয়ের চূড়ো থেকে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক মাছ। কখনো উঠে কখনো নেমে ঢেউয়ের চুড়ো আর খাদগুলো এড়িয়ে উড়ন্ত মাছেরা শত শত মিটার উড়ে গিয়ে ডুব দিচ্ছে, ফের লাফিয়ে উঠছে জল থেকে। কেঁদে কেঁদে পাক খাচ্ছে সাদা গাঙচিল। বাতাস কেটে যাচ্ছে সবচেয়ে দ্রুতগতি পাখি—ফ্রিগেট। মস্ত বাঁকা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ নখর, সবুজ ধাতব ঝলকের গাঢ় বাদামি পালক আর কমলা রঙের থলিওয়ালা এ ফ্রিগেট হল মদ্দা। আর একটু দূরে ঐ যে সাদা ফ্রিগেট—ওটা মাদী। ঢিলের মতো ওটা ঝুপ করে পড়ল জলে, মুহূর্তের মধ্যেই উঠে এল তার বাঁকা ঠোঁটে নীল-রুপোলি মাছ কামড়ে। অ্যালবাট্রাসগুলো উড়ছে, তার মানে ঝড় হবে।

ঝড়ো পাখিগুলো নিশ্চয় এর মধ্যে উড়তে শুরু করেছে বজ্রভরা মেঘের দিকে। সর্বদাই এরা গান গায় বজ্রের মুখে। অন্যদিকে আবার ছোটো জাহাজ আর পাল-তোলা নৌকোগুলো প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেছে তীরের দিকে।

চারদিকেই সবুজাভ গোধূলি, তাহলেও প্রকাণ্ড উজ্জ্বল ছোপটা দেখে জলের তল থেকেই ঠাহর করা যায় সূর্য এখন কোথায়। দিক নির্ণয়ের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ার আগেই চড়ায় পৌঁছনো চাই, নইলে দুপুরের খাওয়াটা মাঠে মারা যাবে। আর খিদে তো পেয়েছে অনেকক্ষণ থেকেই। অন্ধকার হয়ে গেলে চড়া বা ভূগর্ভ শৈল, কোনোটাই ঠাহর করা যাবে না। পুরাদমে হাত-পা চালাতে লাগল ইকথিয়ান্ডর—ব্যাঙ যেভাবে সাঁতরায়।

মাঝে মাঝে চিত হয়ে সে নিরেট নীল-সবুজ আধো আঁধারির মধ্যে তার পথ যাচাই করে নিচ্ছিল প্রায় অলক্ষ সূর্যের আভাটা দেখে। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিল সামনে, দেখা যাচ্ছে কি চড়াটা? নিজের কানকো আর চামড়ায় সে টের পাচ্ছিল যে জল বদলে যাচ্ছে : চড়ার কাছে জল তেমন ঘন হয় না কিন্তু লবণাক্ত, অক্সিজেন সেখানে বেশি, জল হালকা, আরাম দেয়। জলটা একটু জিভে চেখে দেখল সে। অভিজ্ঞ নাবিক এইভাবেই চেখে দেখে বলতে পারে তার চেনা স্থলভূমি কাছে এসেছে কিনা।

ক্রমে ক্রমে ফরসা হয়ে এল। ডাইনে-বাঁয়ে জলতলের পাহাড়গুলোর পরিচিত চেহারা টের পাচ্ছিল সে। মাঝখানে তাদের অল্প মালভূমি; তারপর পাথরের প্রাচীর। এ জায়গাটাকে ইকথিয়ান্ডর বলে তার জলতলের আশ্রয়, প্রচণ্ড ঝড়েও এ জায়গাটা থেকে শান্ত।

কত মাছই-না এসে জুটেছে জলতলের আশ্রয়ে! গিজগিজ করছে চারদিকে। হলদে লেজ আর পেটের মাঝখান দিয়ে টানা হলদে ডোরার কুচো মাছ, কারো-বা আবার বাঁকা বাঁকা কালো ডোরা, কেউ লাল, কেউ ফিরোজা, কেউ নীল। হঠাৎ উধাও হয়ে যায় তারা, আবার তেমনি হঠাৎ আবির্ভূত হয় যথাস্থানে। ওপর থেকে দেখা যায় চারদিকে কিল্‌বিল্‌ করছে মাছ, কিন্তু নিচের দিকে কেউ কোথাও নেই। সেটা কেন তা অনেকক্ষণ ধরতে পারে নি ইকথিয়ান্ডর। তারপর একবার নিজেই একটা মাছ ধরেছিল সে। আকারে সেটা তার হাতখানার মতো, কিন্তু আয়তনে একবার চ্যাপ্টা। তাই ওপর থেকে তাদের ঠাহর হয় না।

এইবার দিবাহার। খাড়াই শিলাটার কাছে সমভূমি জায়গাটায় ঝিনুক আছে অনেক। সেখানে গিয়ে গা এলিয়ে দেয় ইকথিয়ান্ডর, খোলা ভেঙে ভেতরকার শাঁস একটার পর একটা মুখে পুরতে থাকে, ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে বার করে দেয় লোনা জল। খাদ্যের সঙ্গে কিছুটা সামুদ্রিক জল অবশ্য পেটে যায়, কিন্তু ওটা ওর অভ্যেস হয়ে গেছে।

চারদিকে তার জলজ উদ্ভিদ—আগারের সচ্ছিদ্র ছোটো ছোটো সবুজ পাতা, মেক্সিকান কাউলেরপের শ্যামল পালক-পল্লব, নরম গোলাপি 'আলগে'। আজ কিন্তু সবই দেখাচ্ছে ধূসর কৃষ্ণ, গোধূলি রঙা জল, ঝড় ফুঁসেই চলেছে। মাঝে মাঝে ফাঁপা আওয়াজ ভেসে আসে বজ্রের। ওপর দিকে চেয়ে শুয়ে আছে ইকথিয়ান্ডর।

হঠাৎ অমন আঁধার হয়ে উঠল কেন? মাথার ওপর দেখা দিল কালো একটা ছোপ। কী ওটা? খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এখন ওপরে একটু উঁকি দেওয়া যায়। খাড়াই পাহাড়টা বেয়ে সন্তর্পণে ইকথিয়ান্ডর এগোলো মাথার ওপরকার কালো ছোপটার দিকে। দেখা গেল জলের ওপর এসে বসেছে বিশাল এক অ্যালবট্রস। ওর কমলা রঙের পাদুটো একেবারে ইকথিয়ান্ডরের হাতের নাগালেই। হাত বাড়িয়ে সে পাদুটো চেপে ধরল। ভয় পেয়ে পাখিটা প্রকাণ্ড ডানা মেলে উড়তে শুরু করল, জল থেকে টেনে তুলতে লাগল ইকথিয়ান্ডরকে। কিন্তু জল ছাড়াতেই বাতাসে ভারি হয়ে উঠল ইকথিয়ান্ডরের শরীর। ইকথিয়ান্ডর সমেত ফের ঝুপ করে জলে পড়ল পাখিটা, তার বিশাল নরম বুকের তলে ঢাকা পড়ল ইকথিয়ান্ডর। তবে ওর লাল চঞ্চুর ঠোকর খাবার ইচ্ছে ছিল না ইকথিয়ান্ডরের। ডুব দিয়ে সে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ফের উঠল অন্য একটা জায়গায়। পুবের দিকে উড়ে গেল অ্যালবট্রস, হারিয়ে গেল পাহাড়-প্রমাণ ঢেউয়ের আড়ালে।

তৃপ্তিতে চোখ বুজে চিত হয়ে শুয়ে আছে ইকথিয়ান্ডর। ঝড় কেটে গেছে। পুবের দিকে অনেক দূরে কোথায় শোনা যাচ্ছে মেঘের ডাক। আর অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে এদিকটায়। সবশেষে চোখ মেললে সে, জলের ওপর আধখানা শরীর তুললে, তাকিয়ে দেখলে চারদিকে মস্ত এক ঢেউয়ের মাথায় উঠল সে। চারদিকের আকাশ, সমুদ্র, হাওয়া, মেঘ-বৃষ্টি, ঢেউ—সবকিছুই এক সিক্ত কুণ্ডলীতে একাকার হয়ে গোঁ গোঁ, শনশন গর্জন করে চলেছে। ঢেউয়ের মাথায় কুঁকড়ে উঠছে ফেনা, ঢেউয়ের পাশ দিয়ে রাগে নেমে আসছে সাপের মতো। ফুঁসে ফুঁসে উঠছে জলের পাহাড়, ভেঙে পড়ছে, আবার মাথা তুলছে। ঝমঝম করছে বৃষ্টি, শনশন করছে অশান্ত হাওয়া।

পার্থিব লোকের যাতে ভয়, তাতেই ইকথিয়ান্ডরের আনন্দ। অবিশ্য হুঁশিয়ার থাকা দরকার, জলের পাহাড় আছড়ে পড়তে পারে তার ওপর। তবে ঢেউ ইকথিয়ান্ডর সামলাতে পারে মাছের চেয়ে খারাপ নয়। শুধু ওদের রকমটা জানা দরকার। কোনো ঢেউ কেবল ওপর নিচে দোলায়, কোনোটা আবার ছুড়ে ফেলে দেয় চ্যাঙ-দোলা করে। জলের নিচে কী ঘটে সেটাও তার জানা আছে। জানে যে ঝড় থেমে গেলে প্রথমে অদৃশ্য হয় ছোটো ঢেউ, তারপর বড়োগুলো, তবে মাপা তালের স্ফীতিটা থেকে যায় অনেকক্ষণ। তীরের তরঙ্গভঙ্গে হুটোপুটি করতে তার ভালো লাগে, যদিও জানত যে তাতেও বিপদ আছে। একবার তরঙ্গ হঠাৎ উল্টে দেয়, সমুদ্রতলে চোট লাগে মাথায়, জ্ঞান হারায় সে। সাধারণ লোক তাতে তলিয়ে যেত, কিন্তু জলের তলেই সুস্থ হয়ে ওঠে সে।

বৃষ্টি থেমে গেল। বজ্র-ঝড়ের মতো সেটাও চলে গেল পুবের কোন্ একটা দিকে। দিক বদলালে হাওয়া। গ্রীষ্মমণ্ডলীর উত্তর থেকে ভেসে এল গরম আমেজ। মেঘের ফাঁকে দেখা দিল নীল আকাশের গা। রোদ আছড়ে পড়ল ঢেউয়ে। দক্ষিণ-পূর্বের তখনো গোমরা আকাশে ফুটল দু'খানা রামধনু। সাগরকে এখন আর চেনা যায় না। এখন সে আর সীসার মতো কালো নয়, নীল; যেসব জায়গায় রোদ এসে পড়েছে সেখানে জ্বলজ্বলে সবুজ।

সূর্য। এক মুহূর্তেই আকাশ আর সাগর, তীর আর দূরের পাহাড় হয়ে উঠল একেবারে অন্যরকম। ঝড়বৃষ্টির পর কী অপরূপ হালকা আর্দ্র বাতাস! কখনো বুক ভরে সমুদ্রের নির্মল বাতাস টানে ইকথিয়ান্ডর, কখনো জোরে জোরে নিশ্বাস নেয় কানকো দিয়ে। মানুষের মধ্যে একা ইকথিয়ান্ডরই জানে কীভাবে ঝড়বৃষ্টি বজ্রে তরঙ্গে একাকার হয়ে যায় সমুদ্র আকাশ, জল ভরে ওঠে অক্সিজেনে। সমস্ত মাছ, সমস্ত সামুদ্রিক জীব তখন চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ঝড়ের পর সামুদ্রিক জঙ্গলের ঝোপ আর পাথরের ফাটল থেকে প্রবাল আর স্পঞ্জের ঝাড় থেকে প্রথমে বেরিয়ে আসে ছোটো মাছেরা, তাদের পেছু পেছু আসে গভীরে লুকিয়ে থাকা বড়ো মাছগুলো। আর সব শেষে, তরঙ্গ একেবারে থেমে যাবার পর আসে নরম ক্ষীণপ্রাণ জেলি-মাছ। স্বচ্ছ প্রায় নির্ভার চিঙড়ি, পর্পিতা, স্টেনোফোরা, সেস্টাস ভেনেরিস।

রোদ এসে পড়ল তরঙ্গ; সঙ্গে সঙ্গেই চারপাশের জল হয়ে উঠল সবুজ, ঝকমক করে উঠল ছোটো ছোটো বুদ্বুদ, হিসহিসিয়ে উঠল ফেনা। একটু দূরে হুটোপুটি করছে ইকথিয়ান্ডরের বন্ধু ডলফিনেরা, হাসিখুশি কৌতূহলী চোখে তার দিকে চাইছে সেয়ানার মতো। জলের মধ্যে ঝলসে উঠছে তাদের তেলতেলে কালো পিঠ। লাফালাফি করছে, ঘোঁৎঘোঁৎ করছে, তাড়া করছে পরস্পরকে। হাসে ইকথিয়ান্ডর, চেপে ধরে ডলফিনদের, সাঁতরায়, ডুব দেয় এদের সঙ্গে। তার মনে হয় এই সমুদ্র আর ডলফিন, এ আকাশ আর সূর্য যেন তার জন্যই গড়া।

মাথা তুলে চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকায় ইকথিয়ান্ডর। পশ্চিমে তা ঢলে পড়ছে। সন্ধ্যা হবে শিগগির। আজ তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার ইচ্ছে না তার। ঢেউয়ের দোলায় এমনিভাবে দুলবে সে, যতক্ষণ-না কালো হয়ে উঠছে নীল আকাশ, দেখা দিচ্ছে তারা।

তবে শিগগিরই কুঁড়েমি করতে তার আর ভালো লাগল না। ওখান থেকে খানিকটা দূরেই মারা পড়ছে ছোটো ছোটো সামুদ্রিক জীবেরা। তাদের সে বাঁচাতে পারে। দূরের তীরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে। হ্যাঁ, ওখানেই বালিয়াড়িটার কাছে! ওইখানেই তার সাহায্য দরকার সবচেয়ে বেশি ; তরঙ্গভঙ্গে ছারখার হচ্ছে ওখানটায়।

প্রতিটি ঝড়ের পরেকার এই উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে রাশি রাশি শৈবাল আর সামুদ্রিক জীব উৎক্ষিপ্ত হয় তীরে—জেলি-মাছ, কাঁকড়া, তারা-মাছ, এমনকি অসতর্ক থাকলে ডলফিনও। জেলি-মাছ মারা যায় খুবই তাড়াতাড়ি। কোনো কোনো মাছ জলে ফিরে আসতে পারে বটে, কিন্তু অধিকাংশই তীরেই প্রাণ হারায়। কাঁকড়াগুলো প্রায় সবই জলে ফেরে। মাঝে মাঝে নিজেরাই তারা জল ছেড়ে উঠে আসে, তরঙ্গভঙ্গের কবলে পড়া প্রাণীগুলোকে খায়। ইকথিয়ান্ডর এই হতভাগ্য জীবগুলোকে বাঁচাতে ভালোবাসে।

ঝড়ের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তীরে ঘুরে বেড়াত, বাঁচাত যাদের বাঁচানো সম্ভব। জলে ছেড়ে দেওয়া মাছগুলো যখন ফুর্তিতে লেজ নেড়ে ভেসে চলে যেত, কাত হয়ে বা চিত হয়ে ভাসন্ত আধ-মরা কোনো মাছ যখন শেষ পর্যন্ত চাঙ্গা হয়ে উঠত, তখন ভারি খুশি লাগত তার। তীরের বড়ো মাছ কুড়িয়ে ইকথিয়ান্ডর হেসে তাকে হাতে করে নিয়ে যেত, হাতের মধ্যে তিরতির করত মাছ, ইকথিয়ান্ডর তাকে প্রবোধ দিত, বলত আরেকটু ধৈর্য ধরতে। অবিশ্যি সমুদ্রে ক্ষিদে পেলে হয়তো এই মাছটাকেই সে খেতে পারত। কিন্তু তবে সেটা অনিবার্য অভিশাপ। ডাঙায় সে ছিল সমুদ্রবাসীদের পৃষ্ঠপোষক, বন্ধু, রক্ষক।

সাধারণত ইকথিয়ান্ডর রওনা দিত যেমন তেমনি বাড়ি ফিরত সমুদ্রগর্ভের তলস্রোতকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আজ তার অতক্ষণ জলের তলে ডুবে থাকতে ইচ্ছে হল না—সমুদ্র আর আকাশ আজ বড়োই মনোহর। ডুব দিয়ে কিছুটা ডুব-সাঁতার কেটে ফের উপরে উঠতে লাগল সে পানকৌড়ি যা করে।

রোদের শেষ ঝলকও নিভে গেল। পশ্চিমে হলুদ একফালি আকাশ তখনো জ্বলছে। ধূসর কালো ছায়ার মতো গোমড়া ঢেউগুলো আসছে একের পর এক।

বাতাস ঠাণ্ডা, কিন্তু জলের ভেতরটা উষ্ণ। চারদিকে অন্ধকার, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। এ সময়টা হামলা করবে না কেউ। দিনের হিংস্র জীবেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, নিশাচরেরা এখনো শিকারের বেরোয় নি।

হ্যাঁ, এইটে তার দরকার। উত্তরে স্রোতটা গেছে জলপৃষ্ঠের খুব কাছ দিয়ে। সমুদ্রের অশান্ত স্ফীতিতে সেটা খানিকটা ওপর-নিচে দুলছে, কিন্তু তপ্ত উত্তর থেকে শীতল দক্ষিণের দিকে তার ধীরগতি থামে নি। আর অনেক নিচে রয়েছে উলটো স্রোতটা—শীতল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তীর বরাবর অনেকক্ষণ সাঁতরাতে হলে ইকথিয়ান্ডর প্রায়ই এই স্রোতগুলো কাজে লাগায়।

আজ সে অনেক দূরে ভেসে গেল উত্তরে। এবার এই তপ্ত স্রোতটা তাকে পৌঁছে দেবে টানেলের মুখে। শুধু একবার যা ঘটেছিল ঘুম যেন না আসে, টানেলটা যেন ছাড়িয়ে না যায়। কখনো সে মাথার নিচে দু'হাত জড়ো করে, কখনো কখনো দু'পাশে ছড়িয়ে দেয় হাত; কখনো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে আবার জড়ো করে দুই পা। এটা হল তার ব্যায়াম। স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দক্ষিণের দিকে। তপ্ত জল আর ধীরে অঙ্গ সঞ্চালনে কেমন একটা প্রশান্তি নামে।

ওপর দিকে চাইল ইকথিয়ান্ডর—সামনে যেন ধূলিকণার মতো ছোটো ছোটো তারা ছিটানো এক আকাশ। ওটা আর কিছুই নয়, নকটিলুসিরা তাদের ছোটো ছোটো বাতি নিয়ে

সমুদ্রপৃষ্ঠে উঠে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও অন্ধকারে দেখা যায় নীলাভ গোলাপি নীহারিকা—ছোটোছোটো জোনাকি-জীবেরা ঝাঁক বেঁধেছে সেখানে। মৃদু সবুজ আলো ছড়ানো গোলক ভেসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কাছেই একটা জেলি-মাছ—মনে হয় যেন লেস লাগানো জটিল একটা ঢাকনা দেওয়া বিদ্যুতের বাতি। জেলি-মাছের প্রতিটি গতিতেই ঢাকনার কানাটা ধীরে ধীরে কাঁপছে যেন হালকা হাওয়ায়। অগভীর চড়াগুলোয় আলো জ্বালিয়েছে তারা-মাছ। অনেক গভীরে দেখা যাচ্ছে বড়ো বড়ো হিংস্র নিশাচরের আলো। পরস্পর তাড়া করছে সেগুলো, পাক খাচ্ছে, একবার নিভে গিয়ে ফের জ্বলে উঠছে।

ফের একটা চড়া। প্রবালের অপরূপ সব কাণ্ড আর শাখাগুলো ভেতর থেকে নীলাভ, গোলাপি, সবুজ, সাদা ছটায় রঙিন। কোনো কোনো প্রবালের আলো মিটমিটে, ফ্যাকাশে, কোনোটা আবার তেতে সাদা হয়ে ওঠা লোহার মতো।

রাতের ডাঙার আকাশে দেখা যায় কেবল ছোটো ছোটো সুদূর তারা, কখনো বা চাঁদ। আর এখানে হাজার হাজার তারা, হাজার হাজার চাঁদ, ছোটো ছোটো রঙচঙে সূর্যও আছে হাজার হাজার, মৃদু আলোয় তা জ্বলছে। ডাঙার চেয়ে সমুদ্রের রাত হাজার গুণ অপরূপ।

যেন তুলনা করে দেখার জন্যই ইকথিয়াণ্ডর উঠে গেল ওপরে।

একটু গরম হয়ে উঠেছে বাতাস। মাথার ওপর তারা-ভরা নীলকৃষ্ণ আকাশ। দিগন্তে চাঁদের রুপোলি চাকতি। সেখান থেকে রুপোলি ছটা চলে গেছে সমুদ্রের বুক জুড়ে।

বন্দর থেকে ভেসে আসছে নিচু গাঢ় একটানা বাঁশি। তার মানে 'হরোক্স' জাহাজ ফিরতি পথে পাড়ি দেবার তোড়জোড় করছে। খুবই দেরি হয়ে গেছে তাহলে, শিগগিরই ফরসা হবে। পুরো এক দিন এক রাত সমুদ্রে কাটিয়ে দিলে ইকথিয়াণ্ডর। বাবা নিশ্চয় বকাবকি করবেন।

টানেলের দিকে ফিরল ইকথিয়াণ্ডর। শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দরজা খুললে, ঢুকে পড়ল ঘন অন্ধকারে ভরা টানেলের ভেতর। ফেরবার সময় তাকে সাঁতরাতে হয় নিচের ঠাণ্ডা স্রোতটা বেয়ে, সমুদ্র থেকে যা যাচ্ছে বাগানের পুলগুলোতে।

কাঁধে সামান্য একটা ধাক্কায় জেগে উঠল সে। পুলে এসে গেছো চট করে ওপরে ওঠে ফুসফুস দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল ইকথিয়াণ্ডর—পরিচিত ফুলের গন্ধে বাতাস ভরা।

কয়েক সেকেন্ড পরেই সে ঘুমে ঢলে পড়ল শয্যায়—তাই ছিল তার বাবার আদেশ।

মেয়েটি আর শ্যামলা রঙের লোকটা

একবার ঝড়ের পর সমুদ্রে সাঁতরাচ্ছিল ইকথিয়াণ্ডর।

ওপরে উঠতে চোখে পড়ল অদূরে সাদা মতো কী একটা জিনিস, জেলে-জাহাজ থেকে ঝড়ে উড়ে আসা এক টুকরো পালের মতো। কিন্তু কাছাকাছি আসতে অবাক হয়ে সে দেখল জিনিসটা একটা মানুষ, একটি তরুণী মেয়ে। একটা তক্তার সঙ্গে সে বাঁধা। সত্যিই কি মরে গেছে এই সুন্দর মেয়েটি? এমন বিচলিত হয়ে উঠল ইকথিয়াণ্ডর যে জীবনে এই প্রথম তার রাগ হল সমুদ্রের ওপর।

কিংবা হয়তো মাত্র জ্ঞান হারিয়েছে মেয়েটি? ওর হেলে পড়া অসহায় মাথাটি সে ঠিক করে দিয়ে তক্তা ধরে সাঁতরাতে লাগল তীরের দিকে।

সাঁতরাল সে প্রাণপণে, মাঝে মাঝে থামছিল শুধু মেয়েটির মাথাটা ঠিক করে দেবার জন্য। বিপন্ন মাছেদের সঙ্গে সে যেভাবে কথা বলে তেমনি করে ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'আর একটু, আর একটু সহ্য করে থাকো!' ইচ্ছে হচ্ছিল মেয়েটি চোখ মেলুক, আবার ভয়ও হচ্ছিল। চাইছিল মেয়েটি বাঁচুক, আবার আশঙ্কা হচ্ছিল হয়তো তাকে দেখে ভয় পেয়ে যাবে মেয়েটি। তক্তাটাকে ঠেলতে ঠেলতে তাড়াতাড়ি হাত-পা চালাতে লাগল সে।

এসে গেল তরঙ্গভঙ্গের জায়গাটায়। হুঁশিয়ার হতে হবে এখানে। ঢেউয়ের ঠেলায় আপনা থেকেই ওরা ভেসে চলল তীরে দিকে। থেকে থেকে পা দিয়ে তল খুঁজছিল সে। অবশেষে মাটি মিলল, তীরে নিয়ে এল মেয়েটিকে, তক্তার বাঁধন খুলে তাকে শোয়ালে ঝোপেভরা একটা বালিয়াড়ির ছায়ায়, মেয়েটির অঙ্গ সঞ্চালন করে শ্বাস ফেরাবার চেষ্টা করল।

মনে হল মেয়েটির চোখের পাতা কেঁপে উঠছে। বুকের কাছে কান পাতলে ইকথিয়াণ্ডর, শোনা গেল মৃদু স্পন্দন। বেঁচে আছে তাহলে...আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠার ইচ্ছে হল তার।

সামান্য চোখ মেলে ইকথিয়াণ্ডরের দিকে চাইল মেয়েটি, মুখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছাপ। চোখ বন্ধ করে দিল সে। একই সঙ্গে দুঃখ আর আনন্দ হল ইকথিয়াণ্ডরের। যাই হোক, মেয়েটি তো বেঁচেছে। এবার ওর চলে যাওয়ার কথা, মেয়েটি যেন ভয় না পায়। কিন্তু এমন অসহায় অবস্থায় একলা রেখে যায়ই-বা কী করে? এইসব যখন ভাবছে, কানে এল কার যেন দ্রুত গুরুভার পায়ের শব্দ। আর দ্বিধা করা চলে না। মাথা নিচু করে দিল ইকথিয়াণ্ডর, পাথুরে একটা জায়গার দিকে জল থেকে ভেসে উঠল, পাহাড়ের আড়াল থেকে নজর রাখল তীরের দিকে।

বালিয়াড়ির ওপাশ থেকে দেখা দিল একটি শ্যামলা রঙের লোক, মুখে মোচ আর ছাগলদাড়ি, মাথায় চওড়া-কানা একটা টুপি। মেয়েটিকে দেখে, স্প্যানিশ ভাষায় অনুচ্চে সে, 'আরে এই যে, জয় মেরি মাতার, যিশুর!' বলে প্রায় ছুটে গেল মেয়েটির দিকে, তারপর হঠাৎ দিক বদলে ঝাঁপ দিলে ঢেউয়ে। আপাদমস্তক সিক্ত হয়ে ফের সে ছুটে গেল

মেয়েটির কাছে, শুরু করল কৃত্রিম শ্বাস-প্রক্রিয়া (ওর আর এখন কী দরকার?), তারপর নিচু হয়ে...চুমু খেলে মেয়েটিকে। এবং উত্তেজিতভাবে কী যেন বলতে শুরু করল দ্রুত। তার ছেঁড়া ছেঁড়া দু'একটা কথাই কেবল ইকথিয়ান্ডরের কানে এল : 'আগেই তো আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম...এ যে একেবারে পাগলামি, ভাগ্যিস তক্তার সঙ্গে বেঁধে দেবার কথা মনে হয়েছিল...'

চোখ মেলল মেয়েটি, মাথা তুলল। মুখের ভাবে ভয়ের জায়গায় দেখা দিল বিস্ময়, ক্রোধ, বিরক্তি। ছাগলদাড়ি লোকটা উত্তেজিতভাবে কী যেন বলেই চলল, মেয়েটিকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তখনো ভারি দুর্বল সে, তাই ফের তাকে শুইয়ে দিল বালিতে। কেবল আধ-ঘণ্টা পরেই উঠে দাঁড়াতে পারল সে। যে পাথরটার আড়ালে ইকথিয়ান্ডর লুকিয়ে ছিল, তারই কাছ দিয়ে ওরা হেঁটে গেল। চোখ কুঁচকে মেয়েটি বলছিল :

'তাহলে আপনিই আমায় বাঁচিয়েছেন? ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কার দেবেন।'

'ঈশ্বর নয়, সে পুরস্কার দিতে পারেন কেবল আপনিই।'

কথাটা যেন মেয়েটির কানে গেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল :

'অথচ আশ্চর্য। আমার মনে হয়েছিল যেন কী একটা বিকটমূর্তিকে পাশে দেখছিলাম।'

'ওটা নেহাৎ স্বপ্নের ঘোর'—বলল লোকটি। 'কিংবা হয়তো কোনো দানো। আপনাকে মরা ভেবে আপনার আত্মা চুরি করতে এসেছিল। ঈশ্বরের নাম করুন, হেলান দিন আমার গায়ে। আমি কাছে থাকলে কোনো দানোই আপনাকে ছোঁবে না।'

চলে গেল ওরা, অপরূপ ওই মেয়েটি আর ওই শ্যামলা রঙের খারাপ লোকটা, মেয়েটিকে বোঝাচ্ছে যেন সেই ওকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু সে মিথ্যা তো আর ইকথিয়ান্ডর ফাঁস করতে পারবে না। করুক যা ওদের ইচ্ছে, ইকথিয়ান্ডর নিজের কর্তব্য করে দিয়েছে।

বালিয়াড়ির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল ওরা। ইকথিয়ান্ডর কিন্তু চেয়েই রইল ওদের গমন পথের দিকে। তারপর মুখ ফেরালে সমুদ্রে—কী বিশাল আর ফাঁকা!...

ঢেউয়ের তোড়ে বালির ওপর ছিটকে এসে পড়ল নীল রঙের একটা মাছ, পেট্‌টা রুপোলি। চারদিকে তাকিয়ে দেখলে ইকথিয়ান্ডর, আশপাশে কেউ নেই। আড়াল থেকে ছুটে গিয়ে সে মাছটা কুড়িয়ে ছেড়ে দিলে সমুদ্রে। সাঁতরে চলে গেল মাছটা, কিন্তু কেন জানি মন খারাপ হয়ে গেল ইকথিয়ান্ডরের। ফাঁকা তীরে ওপর পায়চারি করতে লাগল সে, মাছ আর সামুদ্রিক জীব কুড়িয়ে ছাড়তে লাগল জলে। ক্রমে ক্রমে এ কাজটায় সে মেতে উঠল, ফিরে এল তার বরাবরের খোশ মেজাজ। এইভাবেই চলল সন্ধে পর্যন্ত, শুধু মাঝে মাঝে যখন কড়া হাওয়ায় কানকো তেতে শুকিয়ে উঠছিল তখন একবার করে ডুব দিয়ে দিচ্ছিল সে।

ইকথিয়ান্ডরের চাকর

সালভাতর ঠিক করলেন পাহাড়ে যাবেন, তবে ক্রিস্টোকে সঙ্গে নেবেন না, কেননা ইকথিয়ান্ডরের পরিচর্যা যে ভালোই করছিল। এতে ভারি খুশি হয়ে উঠল ক্রিস্টো। সালভাতরের অনুপস্থিতিতে সে অবাধে বালতাজারের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। এর মধ্যে বালতাজারের কাছে সে খবর পাঠিয়েছিল যে 'দানো'র সন্ধান মিলেছে। তাকে হরণ করার ফন্দি ঠিক করাই এখন বাকি।

ক্রিস্টো এখন তাকে লতা-ঢাকা সাদা বাড়িটায়, প্রায়ই দেখা হয় ইকথিয়ান্ডরের সঙ্গে। চট করেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ওদের। নিঃসঙ্গ ইকথিয়ান্ডর সহজেই অনুরাগী হয়ে ওঠে ক্রিস্টোর। তার কাছ থেকে সে স্থলবাসীদের জীবনের কথা শুনত। আর নিজে সে সামদ্রিক জীবনের খবর জানত নামকরা বিজ্ঞানীদের চেয়েও বেশি, সে রহস্য সে জানাত ক্রিস্টোকে। ভূগোলের ভালো জ্ঞান ইকথিয়ান্ডরের, দুনিয়ার সমুদ্র, মহাসমুদ্র, বড়ো বড়ো নদীর কথা জানত সে। জ্যোতির্বিদ্যা, নৌবাহবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যারও খানিকটা ধারণা ছিল তার। কিন্তু মানুষের কথা সে জানত সামান্য। আর অর্থনীতি ও রাজনীতির কথা জানত পাঁচ বছুরে শিশুর চেয়ে বেশি নয়।

দিনে যখন গরম পড়ত, ইকথিয়ান্ডর তখন তার ভূগর্ভগুহায় নেমে কোথাও না কোথাও ভেসে যেত। সাদা বাড়িটায় সে আসত গরমের ঝাঁঝ কমে গেলে, ভোর পর্যন্ত থাকত সেখানে। তবে যদি বৃষ্টি নামত কি ঝড় উঠত সমুদ্রে, তাহলে দিনের বেলাতেও ঘরে থাকত সে। সোঁদা আবহাওয়ায় ডাঙায় থাকতে তার খারাপ লাগত না।

বাড়িটা বিশেষ বড়ো নয়। কামরা মাত্র চারটি। রান্নাঘরের কাছে একটি ঘরে ঠাঁই নেয় ক্রিস্টো। পাশেই খাবার ঘর, তারপর মস্ত এক গ্রন্থাগার। স্প্যানিশ ও ইংরেজি ভাষা জানত ইকথিয়ান্ডর। আর শেষের সবচেয়ে বড়ো ঘরটা ছিল ইকথিয়ান্ডরের নিদ্রাকক্ষ। তার মাঝখানে ছিল সুইমিং পুল। খাটটা ছিল দেয়াল ঘেঁষে। ঘুমোবার সময় খাটের চেয়ে জলাশয়টাই ছিল ইকথিয়ান্ডরের বেশি পছন্দ। তবে যাবার সময় সালভাতর ক্রিস্টোকে হুকুম দিয়ে যান যাতে সে দেখে যেন সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ইকথিয়ান্ডর সাধারণ খাটেই ঘুমোয়। প্রতি সন্ধ্যায় তাই ক্রিস্টো এখানে এসে হাজিরা দিত, আর ইকথিয়ান্ডর খাটে শুতে না চাইলে গজগজ করত বুড়ি আয়ার মতো।

'কিন্তু জলে ঘুমতে যে আমার অনেক ভালো লাগে'—প্রতিবাদ করত ইকথিয়ান্ডর।

'ডাক্তার হুকুম দিয়ে গেছেন খাটে শুতে হবে। বাপের কথা মানতে হবে বৈকি।'

সালভাতরকে ইকথিয়ান্ডর ডাকত বাবা বলে, কিন্তু তাতে সন্দেহ ছিল ক্রিস্টোর। ইকথিয়ান্ডরের মুখ আর হাতের রঙ অনেক ফর্সা, কিন্তু হয়তো সেটা তার দীর্ঘকাল জলবাসের জন্য। নিখুঁত ডিম্বাকার মুখ, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট, জ্বলজ্বল চোখ—এসবের ফলে তাকে বরং মনে হত আরাউকানি উপজাতির লোক, ক্রিস্টোর নিজের জাত।

ক্রিস্টোর খুব ইচ্ছে হত দেখে, ইকথিয়াস্তরের গায়ের রঙটা ঠিক কীরকম। কিন্তু অজানা কী একটা জিনিসে তৈরি আঁশ-আঁশ পোশাকে তা পুরোপুরি ঢাকা।

'রাত্রেও তোমার পোশাক ছাড়ো না?' জিজ্ঞেস করেছিল সে।

'কী দরকার। আঁশে আমার কষ্ট হয় না। বরং আরাম পাই। কানকো কি চামড়ায় নিশ্বাস নিতে অসুবিধা নেই, তাছাড়া বর্ম এটা, হাঙরের দাঁত বা ধারালো ছুরিতেও ফুটো হবে না'—শুতে শুতে বলেছিল ইকথিয়াস্তর।

'চশমা-দস্তানা পরো কেন?' খাটের কাছে বিদ্‌ঘুটে দস্তানা দেখে জিজ্ঞেস করেছিল ক্রিস্টো।

তৈরি তা সবজেটে রবারে, লম্বা লম্বা গাঁটের আঙুল, রবারের চামড়ায় জোড়া।

'দস্তানায় তাড়াতাড়ি সাঁতরাতে সুবিধে হয়। আর ঝড়ে যখন তল থেকে বালি ওঠে, তখন চোখ বাঁচায় চশমা। তবে চশমা থাকায় জলের তলে আমি ভালো দেখি। ওটা না থাকলে সব কেমন কুয়াশার মতো লাগে।' তারপর হেসে যোগ দিল ইকথিয়াস্তর, 'যখন ছোটো ছিলাম, বাবা তখন মাঝে মাঝে আমায় পাশের বাগানের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে দিতেন। সুইমিং পুলে ওরা বিনা দস্তানায় সাঁতরাচ্ছে দেখে ভারি অবাক হয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম ওদের, দস্তানা ছাড়া সাঁতরানো যায় নাকি? কী দস্তানার কথা বলছি সেটা ওরা বুঝল না। আমি তো আর ওদের সামনে কখনো সাঁতরাইনি।'

'এখনো তুমি খাঁড়িটায় সাঁতরে বেড়াও?' উৎসুক হয়ে উঠল ক্রিস্টো।

'সাঁতরাই বৈকি। তবে পাশের টানেলটা দিয়ে। কারা যেন আমায় একবার জালে প্রায় ধরে ফেলেছিল। এখন আমি হুঁশিয়ার হয়ে চলি।'

'হুঁ, বটে...তার মানে, সাগরে পৌঁছবার আরেকটা টানেলও আছে।'

'একটা কেন, অনেক আছে। কী দুঃখের কথা, আমার সঙ্গে তুই-ডুব-সাঁতার দিতে পারিস না। তাহলে আশ্চর্য সব জিনিস দেখাতে পারতাম তোকে। আচ্ছা, সব মানুষ জলের তলে থাকতে পারে না কেন? আমার সাগুরে ঘোড়ায় চেপে তাহলে বেড়াতাম তোর সঙ্গে।'

'সাগুরে ঘোড়া? সে আবার কী?'

'ডলফিন! ওকে শিখিয়ে তুলেছি। বেচারি, ঝড়ে একবার ছিটকে পড়েছিল তীরে। একটা পাখনা ভয়ানক জখম হয়। জলে টেনে আনি ওকে। ঝামেলা কম হয় নি। জলের চেয়ে ডাঙায় ওরা অনেক ভারী তো। মাটিতে সবই কেমন ভারী ভারী। নিজের দেহটাও। জলে থাকা অনেক আরামের। তা ডলফিনটাকে জলে তো টেনে আনলাম—কিন্তু সাঁতরাতে পারে না। তার মানে খাওয়াও জুটবে না। আমিই ওকে মাসখানেক ধরে মাছ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখি। এর মধ্যে শুধু পোষ মানে না, আমার ভক্তই হয়ে পড়ে সে। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অন্য ডলফিনরাও আমায় চেনে। সমুদ্রে ডলফিনদের সঙ্গে হুটোপুটি করতে কী মজাই-না লাগে। ঢেউ, জলের ছিটে, রোদ, বাতাস হৈ চৈ। জলের তলেও আরাম কম নয়। মনে হয় যেন গাঢ় নীল বাতাসে ভাসছি, চারদিক চুপচাপ। নিজের দেহটাও টের পাওয়া যায় না। হয়ে ওঠে তা হালকা, অবাধ—যা খুশি তাই করা যায়। সমুদ্রে আমার বন্ধু আছে অনেক। ছোটো ছোটো মাছগুলোকে আমি পুষি, তোরা যেমন পাখি পুষিস। ঝাঁকে ঝাঁকে আমার পিছু নেয় ওরা।'

'আর দুশমন নেই সমুদ্রে?'

'তা-ও আছে—হাঙর, অক্টোপাস। তবে আমি ওদের ডরাই না। ছোরা আছে আমার।'

'চুপিচুপি এসে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে?'

এ প্রশ্নে অবাক হল ইকথিয়াস্তর।

'আমি যে অনেক দূর থেকেই ওদের আসা শুনতে পাই।'

'শুনতে পাও?' এবার অবাক হল ক্রিস্টো, 'খুব চুপিসারে যখন আসে, তখনো?'

'হ্যাঁ। এতে না-বোঝাবার কী আছে? কান দিয়ে শুনি, গোটা শরীর দিয়ে। সাঁতরাবার সময় জলে যে কাঁপন তোলে ওরা, সেটা এগিয়ে যায় ওদের চেয়ে অনেক আগে। সে কাঁপন টের পেতেই চারিপাশে চেয়ে দেখি।'

'যখন ঘুমোও তখনো?'

'বটেই তো।'

'কিন্তু মাছেরা যে...'

'মাছেরা মারা পড়ে আচমকা হামলায় নয়, শত্রু ওদের চেয়ে অনেক বলবান, তাই পেরে ওঠে না। আর আমি—ওদের সবার চেয়েই আমার জোর বেশি। সমুদ্রের হিংস্র জীবেরা তা জানে। আমার কাছে ঘেঁষতে ওরা সাহস পায় না।'

'জুরিতা ঠিকই ভেবেছে, এ ছোকরাকে ধরার জন্য খাটা নিরর্থক নয়'—ভাবলে ক্রিস্টো, 'গোটা শরীর দিয়ে শুনি!' তার মানে ধরা যাবে কেবল ফাঁদ পেতে। জুরিতাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

'জলের তলে—সে এক অপূর্ব জগৎ। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ইকথিয়াণ্ডর, 'ধুলোভরা গুমোট তোদের মাটির সঙ্গে সমুদ্রে আমি কখনো বদলাতে যাব না।'

'আমাদের মাটি বলছ কেন? তুমিও মাটিরই ছেলে। তোমার মা ছিল কে?'

'জানি না। বাবা বলেন, আমার জন্মের সময় মা মারা যান।'

'কিন্তু নিশ্চয় তিনি ছিলেন মানুষ, মাছ তো আর নয়।'

'তা হতে পারে'—সায় দিলে ইকথিয়াণ্ডর।

ক্রিস্টো হেসে উঠল :

'আচ্ছা, জেলেদের সঙ্গে তুমি দুষ্টুমি কেন করো বলো তো, তাদের জাল কেটে দাও, মাছ ছুড়ে ফেল নৌকা থেকে?'

'কারণ ওরা যা খেতে পারে, মাছ ধরে তা চেয়েও অনেক বেশি।'

'কিন্তু মাছ তো ওরা ধরে বিক্রির জন্য।'

ইকথিয়াণ্ডর ব্যাপারটা বুঝল না।

'অন্য লোকও তো খাবে'—বুঝিয়ে বললে ক্রিস্টো।

'দুনিয়ার লোক কি এত বেশি?' অবাক হল ইকথিয়াণ্ডর, 'ডাঙার পশু-পাখিতে তাদের কুলায় না? সমুদ্রে আসে কেন?'

'সেটা তোমায় চট করে বোঝানো মুশকিল'—হাই তুললে ক্রিস্টো, 'ঘুম পাচ্ছে। দেখো, জলে গিয়ে শুয়ো না। বাবা রাগ করবেন।' বলে চলে গেল সে।

ভোরে এসে ইকথিয়াণ্ডরকে আর দেখতে পেলে না ক্রিস্টো। পাথুরে মেঝেটা সব ভেজা।

'ফের জলে ঘুমিয়েছে'—গজগজ করলে ক্রিস্টো, তারপর নিশ্চয় চলে গেছে সমুদ্রে।'

খাবারের সময় ইকথিয়াণ্ডর এল অনেক দেরি করে। কেমন যেন মনমরা লাগল তাকে। কাঁটায় এক টুকরো বিফস্টিক নিয়ে সে বলল, 'ফের ভাজা মাংস।'

'ফের'—কড়া জবাব দিলে ক্রিস্টো, 'কারণ, ডাক্তার সেই হুকুম দিয়ে গেছেন। আর তুমি ফের কাঁচা মাছ খেয়ে এসেছ তো? ঘুমিয়েছ জলে। খাটে শুতে চাও না। কানকো তাতে বাতাস সইবার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। বলবে, পাঁজরায় ব্যথা করছে। সকালের খাবার সময় দেরি করে এলে। ডাক্তার আসুন, সব তাঁকে বলব। মোটেই কথা শোনে না...'

'বলিস না ক্রিস্টো, ওঁর মনে ব্যথা দিতে চাই না'—বলে মাথা নিচু করে কী যেন ভাবলে ইকথিয়ান্ডর। তারপর হঠাৎ ক্রিস্টোর দিকে তার বড়ো বড়ো, বিষণ্ণ চোখ তুলে বলল :

'ক্রিস্টো, একটি মেয়ে দেখেছি আমি। সমুদ্রের তলেও অমন সুন্দর প্রাণী আমি কখনো দেখি নি...'ডলফিনের পিঠে আমি তীর বরাবর ভেসে যাচ্ছিলাম। বুয়েনাস-আইরেসের কাছে তীরে ওকে দেখি। নীল চোখ, সোনালি চুল—কিন্তু আমায় দেখতে পায় সে, ভয় পেয়ে ছুটে পালায়।

'কেন যে পরেছিলাম চশমা, দস্তানা?' তারপর খানিকটা চুপ করে থেকে খুব আস্তে করে বললে, একবার ডুবন্ত একটি মেয়েকে আমি বাঁচিয়েছিলাম। তখন লক্ষ করি নি মেয়েটি দেখতে কেমন, হয়তো সেই মেয়েটিই? মনে হচ্ছে যেন ও মেয়েটিরও চুল ছিল সোনালি। হ্যাঁ, সে মেয়েটিই। বেশ মনে পড়ছে...' কী যেন ভাবলে ইকথিয়ান্ডর, তারপর আয়নার কাছে এসে জীবনে এই প্রথম নিজের চেহারাটা দেখলে।

'তারপর কী করলে তুমি?'

'অপেক্ষা করে রইলাম, কিন্তু ও আর ফিরল না। ক্রিস্টো, সত্যিই কি আর কখনো ও তীরে আসবে না?'

'ভালোই হল যে মেয়েটি ওর মনে ধরেছে'—ভাবলে ক্রিস্টো। এতদিন পর্যন্ত ক্রিস্টো শহরের অনেক প্রশংসা করেছে ইকথিয়ান্ডরের কাছে, কিন্তু বুয়েনাস-আইরেস যাবার জন্য তাকে কখনো রাজি করাতে পারে নি। জুরিতার পক্ষে সেখানে ওকে হরণ করা সহজ হবে।

'হয়তো মেয়েটি তীরে আসবে না, কিন্তু ওকে খুঁজে বার করতে তোমায় সাহায্য করব। শহরের পোশাক পরে আমার সঙ্গে শহরে চলো।'

'তাহলে দেখতে পাব ওকে?' উল্লসিত হয়ে উঠল ইকথিয়ান্ডর।

'মেয়ে সেখানে অনেক। হয়তো যেটি তীরে বসেছিল, তাকেও দেখা যাবে।'

'এখনই চল্ তাহলে!'

'এখন দেরি হয়ে গেছে। পায়ে হেঁটে শহরে পৌঁছনো অত সহজ নয়।'

'আমি যাব ডলফিনের পিঠে, আর তুই যাস তীর দিয়ে।'

'ভারি যে চাড় দেখছি'—বলল ক্রিস্টো, 'দুজনেই আমরা যাব কাল ভোরে। তুমি সাঁতরে যেয়ো খাঁড়িতে, আমি পোশাক নিয়ে অপেক্ষা করব তীরে। পোশাকও তো যোগাড় করতে হবে। ('রাতের মধ্যেই ভাই-এর সঙ্গে দেখা করে নেওয়া যাবে'—ভাবলে ক্রিস্টো)—তাহলে ওই কথা রইল, কাল ভোরে। আর এখন ভালো করে জিরিয়ে নাও। শরীরটা চাঙ্গা ঝরঝরে হয়ে উঠুক।'

শহরে

সাগরের খাঁড়িটা সাঁতরে ইকথিয়ান্ডর তীরে এসে উঠল। সাদা রঙের একটা স্যুট নিয়ে ক্রিস্টো আগেই সেখানে অপেক্ষা করছিল। সেটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল ইকথিয়ান্ডর যেন একটা সাপের খোলস আনা হয়েছে তার জন্য। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে ওটা পরতে শুরু করলে।

নিশ্চয় জীবনে সে স্যুট পরেছে খুবই কম। ক্রিস্টো টাই বেঁধে দিলে, কেমন মানাল দেখে ভালোই লাগল তার।

'চলো, যাওয়া যাক'—খুশির সুরে বলল ক্রিস্টো।

ক্রিস্টো চাইছিল ইকথিয়ান্ডরের তাক লাগে, তাই তাকে নিয়ে গেল শহরের বড়ো রাস্তায়, আভেনি-দা-আলভেয়ারে, বের্তিসে, দেখাল ভিক্টোরিয়া চক, গির্জা, মুর শৈলীতে গড়া টাউন হল, ফুয়ের্তো চক, ২৫ মে চক*, চমৎকার গাছে ঘেরা মুক্তিস্তম্ভ, রাষ্ট্রপতিভবন।

কিন্তু ভুল হয়েছিল ক্রিস্টোর। হৈ চৈ, লোকজন, ধুলো গুমোটে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল ইকথিয়ান্ডর। ভিড়ের মধ্যে সে খুঁজছিল শুধু মেয়েটিকে। প্রায়ই ক্রিস্টোর হাত ধরে ফিসফিস করে উঠছিল :

'ওই সেই...' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল টের পাচ্ছিল সে, 'না, এ অন্য মেয়ে...'

বেলা গড়িয়ে এল দুপুরে। অসহ্য হয়ে উঠল গরম। ছোটো একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে কিছু খাবার প্রস্তাব দিলে ক্রিস্টো। ঘরটা মাটির তলে, তাই বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু গুমোট আর গোলমাল খুব বেশি। নোংরা, জীর্ণ পোশাক-পরা লোকেরা ছড়াচ্ছে চুরুটের দুর্গন্ধ। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল ইকথিয়ান্ডরের, দলা-মোচড়া খবরের কাগজ নেড়ে দুর্বোধ্য সব বুলি ঝেড়ে কী সব তর্ক চলছে চারদিকে। পেট ভরে ঠাণ্ডা জল খেলে ইকথিয়ান্ডর, খাবার ছুঁয়েও দেখল না। বিষণ্ন গলায় বলল :

'লোকের এই ঘূর্ণিতে মানুষ খুঁজে বার করার চাইতে মহাসাগরে নিজের চেনা মাছকে খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ। তোদের শহরগুলো একেবারে জঘন্য, গুমোট, দুর্গন্ধ। পাঁজরায় আমার শূল বেদনা শুরু হয়েছে। চল্ বাড়ি যাই।'

'বেশ'—রাজি হল ক্রিস্টো, 'শুধু আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।'

'লোকের কাছে আমি যাব না।'

'আমাদের পথেই পড়বে, আমি দেরি করব না।'

পয়সা মিটিয়ে ওরা বেরিয়ে এল রাস্তায়। মাথা নিচু করে, দম টেনে টেনে ক্রিস্টোর পিছু পিচু চলল ইকথিয়ান্ডর; পেরিয়ে গেল সাদা সাদা বাড়ি, ফণিমনসার ঝাড়, পিচ আর জলপাই গাছের বাগান। ক্রিস্টো তাকে নিয়ে যাচ্ছিল নয়া বন্দরে, ভাই বালতাজারের কাছে।

---

* ১৮১০ সালের ২৫ মে লা-প্লাতা প্রদেশে একটি বিপ্লবী জোট গঠিত হয়। স্থানীয় সরকারকে বন্দি করে তারা স্পেন থেকে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে একটি সামরিক সরকার গঠন করে। —(লেখকের টীকা)

সাগরের কাছে এসে ইকথিয়ান্ডর তৃষিতের মতো আর্দ্র বাতাস টানতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল পোশাক ছুড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রে।

'এই এসে গেছি'—সশঙ্কে ওর দিকে তাকিয়ে বলল ক্রিস্টো।

রেললাইন পেরিয়ে গেল ওরা।

'এইখানে'—বলল ক্রিস্টো। আধো-অন্ধকার একটা দোকানের মধ্যে নামল তারা।

অন্ধকারে চোখ একটু সয়ে আসতেই ভারি অবাক লাগল ইকথিয়ান্ডরের। দোকানটা যেন ঠিক এক সমুদ্রতলের কোণ। তাকগুলোর, এমনকি মেঝের একাংশও ছোটো-বড়ো নানারকম শাঁখ আর কড়িতে ভরা। সিলিং থেকে ঝুলছে প্রবালের ঝাড়, তারা-মাছ, শুকনো কাঁকড়া, স্টাফ করা মাছ, অদ্ভুত সব সামুদ্রিক জীব। কাউন্টারে কাচের বাক্সে মুক্তা সাজানো। একটা দেরাজে রয়েছে গোলাপি রঙের মুক্তো, ডুবুরিয়া তাকে বলে 'দেবদূতের চামড়া'। পরিচিত জিনিসপত্রের মাঝখানে খানিকটা শান্ত হয়ে এল ইকথিয়ান্ডর।

'একটু জিরিয়ে নাও এখানে, জায়গায়টা চুপচাপ, ঠাণ্ডা'—বলে ক্রিস্টো তাকে বসালে একটা পুরনো বেতের কেদারায়।

হাঁক দিলে, 'বালতাজার! গুত্তিয়েরে!'

'ক্রিস্টো নাকি?' অন্য ঘর থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'ভেতরে আয়।'

নিচু দরজাটা দিয়ে ঢোকার জন্য কুঁজো হল ক্রিস্টো।

ও ঘরটা বালতাজারের ল্যাবরেটরি। এখানে সে পাতলা অ্যাসিড দিয়ে ভিজিয়ে মুক্তার জেল্লা ফেরাত। ঢুকে ভালো করে দরজা বন্ধ করে দিলে ক্রিস্টো। সিলিংয়ের কাছে ছোটো একটা জানলা দিয়ে ক্ষীণ আলো পড়ছিল পুরনো, কালচে হয়ে আসা টেবিলের ওপরকার নানারকম শিশি-বয়ামের গায়ে।

'ভালো আছিস তো? গুত্তিয়েরে কোথায়?'

'পড়শিদের কাছে ইস্ত্রি আনতে গেছে। এখনি ফিরবে'—বললে বালতাজার।

'আর জুরিতা?' অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলে ক্রিস্টো।

'কে জানে শালা কোথায় গেছে। কাল আমাদের একটু ঝগড়া হয়ে গেল।'

'গুত্তিয়েরেকে নিয়ে?'

'আর বলিস না। জুরিতা ওর জন্যে একেবারে পাগল। ওর কিন্তু কেবলি এক জবাব: না, আর না। ভারি জেদী মেয়ে। কী ভাবে নিজেকে? বোঝে না যে যত রূপসীই হোক, অমন স্বামী পেলে যে কোনো রেড-ইন্ডিয়ান মেয়েই বর্তে যাবে। নিজের জাহাজ রয়েছে, ডুবুরি রয়েছে'—অ্যাসিডে মুক্তা ডুবিয়ে গজগজ করলে বালতাজার, 'মনের দুঃখে আবার হয়তো কোথাও মদ খাচ্ছে জুরিতা।'

'তাহলে কী করা যায়?'

'নিয়ে এসেছিস ওকে?'

'বসে আছে ও ঘরে।'

দরজার কাছে এসে কৌতূহলে উঁকি দিলে বালতাজার। মৃদুস্বরে বললে :

'কই, দেখছি না তো?'

'কাউন্টারের কাছে চেয়ারে বসে আছে।'

'দেখতে পাচ্ছি না। সেখানে তো দেখছি গুত্তিয়েরে।'

দ্রুত দরজা খুলে ক্রিস্টো সমেত দোকানঘরে ঢুকল বালতাজার।

ইকথিয়াভর নেই। অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, বালতাজারের পালিতা কন্যা গুত্তিয়েরে। রূপের খ্যাতি তার নয় বন্দর ছাড়িয়েও অনেক দূর ছড়িয়েছে। কিন্তু ভারি জেদী। প্রায়ই সুরেলা গলায় দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিত :

'না!'

পেদ্রো জুরিতারও চোখ পড়েছিল ওর ওপর। বিয়ে করতে চায় ওকে। জাহাজমালিকের সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতিয়ে যৌথ কোম্পানি বসাতে বুড়ো বালতাজারেরও আপত্তি ছিল না মোটেই।

কিন্তু জুরিতার সমস্ত প্রস্তাবেই সে এক জবাব দিয়েছে :

'না।'

বাপ-জ্যাঠা যখন ঘরে ঢুকল, মেয়েটি তখন দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে।

'কেমন আছিস রে, গুত্তিয়েরে?' বললে ক্রিস্টো।

'ছোকরাটি গেল কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে বালতাজার।

'আমি তো আর ছোকরাদের লুকিয়ে রাখি না'—হেসে বললে মেয়েটি, 'যখন ঘরে ঢুকি, আমার দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইল, মনে হল যেন ভয় পেয়েছে, তারপর হঠাৎ বুক চেপে ধরে ছুটে পালাল। চাইতে না চাইতেই উধাও।'

'তাহলে গুত্তিয়েরেই সেই মেয়ে!' মনে মনে ভাবল ক্রিস্টো।

ফের সাগরে

হাঁপাতে হাঁপাতে সাগরতীরের রাস্তাটা বরাবর ছুটল সে। সাংঘাতিক এই শহরটা শেষ হতেই সে পথ ছেড়ে সোজা নেমে গেল তীরে। পাথরগুলোর মাঝখানে আড়াল নিয়ে সে চট করে পোশাক ছেড়ে তা পাথরের তলে লুকিয়ে রাখল, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

খুবই ক্লান্ত হয়েছিল সে, তাহলেও এত দ্রুতবেগে আর কখনো সে সাঁতরায় নি। ভয় পেয়ে তার কাছ থেকে ছিটকে সরে যেতে লাগল মাছেরা। শহর থেকে মাইলকয়েক সাঁতরাবার পরই কেবল সে জলের ওপর দিকটায় ওঠে, সাঁতরাতে থাকে তীর ঘেঁষে। এখানে তার আর অসুবিধা কিছুই নেই। এখানকার প্রতি পার, সমুদ্রতলের প্রতিটি ফাটল তার চেনা। এই তো এখানেই বালির ওপর বাসা পেতেছে গদাইলস্কারি ট্যারব্যাট মাছ। আরেকটু দূরে বাড়ছে প্রবালের ঝাড়, তার শাখা-প্রশাখার মধ্যে লুকিয়ে আছে ছোটো ছোটো লাল-পাখনা মাছ। আর ডুবে যাওয়া এই জেলেনৌকোয় বাসা নিয়েছে দুটো অক্টোপাস সংসার, কিছু দিন আগে বাচ্চা দিয়েছে ওরা। ধূসর পাথরগুলোর তলে কাঁকড়াদের পাড়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইকথিয়ান্ডর তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ করতে ভালোবাসত, জানত তাদের ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখ—একটা ভালো শিকারের আনন্দ অথবা দাঁড়া নষ্ট কি অক্টোপাস হামলার কষ্ট। আর তীর-ছোঁয়া ওই মগ্ন শিলাই হল ঝিনুকদের মহল্লা।

খাঁড়িটা যখন আর বেশি দূরে নয়, তখন জলের ওপর মাথা তুললে ইকথিয়ান্ডর। ঢেউয়ের মধ্যে একদল ডলফিনকে হুটোপুটি করতে দেখে সে জোরে হাঁক দিলে। মস্ত একটা ডলফিন সাড়া দিয়ে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল, ঢেউ কেটে কখনো ডুবে, কখনো ভেসে, তেলতেলে কালো পিঠটার ঝলক তুলে বন্ধুর দিকে সাঁতরে এল সে।

ইকথিয়ান্ডর তাকে আঁকড়ে হেঁকে উঠল, 'জলদি লিডিঙ, জলদি! সামনে, ওই দূরে!' ডলফিনও তার হাতে বশ মেনে সাঁতরাতে লাগল ঢেউ আর হাওয়ার মুখোমুখি, খোলা সাগরের দিকে। ফেনা তুলে বুক দিয়ে প্রাণপণে ঢেউ কাটছিল ডলফিনটা, কিন্তু ইকথিয়ান্ডরের তৃপ্তি হচ্ছিল না।

'আরো জোরে লিডিঙ, আরো জোরে!'

ভয়ানক রকম সে ছোটাল ডলফিনটাকে, কিন্তু মন শান্ত হল না। তারপর হঠাৎ তার বন্ধুকে অবাক করে দিয়ে তার পেছল পিঠ থেকে নেমে ডুবতে থাকল গভীরে। কিছুই বুঝতে না পেরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল ডলফিনটা, ঘোঁৎঘোঁৎ করল, ডুব দিল, ভেসে উঠল, তারপর লেজ ঘুরিয়ে সাঁতরাতে লাগল তীরের দিকে। মাঝে মাঝে পেছন ফিরছিল সে, কিন্তু সমুদ্রের ওপরে কোথাও তার বন্ধুকে দেখা গেল না। লিডিঙ তখন তার ঝাঁকেই ফিরে গেল। ইকথিয়ান্ডর ওদিকে ক্রমেই নেমে চলল মহাসাগরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীরে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল একা থাকে, নতুন অভিজ্ঞতাগুলোর ঘোর কাটিয়ে খানিকটা আত্মস্থ হয়, যা দেখল, জানল, তাকে বিচার করে। বিপদের খেয়াল না করে অনেক দূর ভেসে গেল সে। জানতে চাইছিল কেন সে সবার মতো নয়, জল-ডাঙা সবখানেই সে পরবাসী।

নিচে নামছিল সে ক্রমেই ধীরে ধীরে। জল হয়ে উঠল অনেক নিরেট, চাপ দিচ্ছিল তা, কঠিন হয়ে উঠল নিশ্বাস নেওয়া। চারদিকে সবজেটে ধূসর অন্ধকার। সামুদ্রিক জীবন এখানে অনেক কম আর অধিকাংশই তারা ইকথিয়াণ্ডরের অপরিচিত। এত গভীরে সে আগে কখনো নামে নি। আর এই নীরব, অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে এই প্রথম গা ছমছম করে উঠল ইকথিয়াণ্ডরের। দ্রুতবেগে সে উপরে উঠে সাঁতরে গেল তীরের দিকে। অস্ত যাচ্ছে সূর্য, ঢেউয়ে এসে বিঁধছে তার রক্তিম কিরণ। জলের নীলের সঙ্গে মিশে তা ঝলমল করছে বেগুনি-গোলাপি থেকে সবুজাভ-নীল আভাসে।

ইকথিয়াণ্ডরের চশমা ছিল না, তাই নিচ থেকে সমুদ্রের ওপরটা তার চোখে তেমনি দেখাল যা দেখে মাছেরা। চেহারাটা তার মোটেই চ্যাপটা লাগল না, মনে হল যেন মোচাকৃতি, যেন মস্ত এক ফানেলের তল থেকে সে দেখছে। সে ফানেলের ধারাটা লাল, হলুদ, সবুজ, নীল, বেগুনি রঙে রাঙা। তার ওপরে জলের উপরিভাগ যেন ঝকমকে একটা আয়না, তাতে জলতলের শিলা, উদ্ভিদ, মাছেদের ছায়া পড়েছে।

উপুড় হল ইকথিয়াণ্ডর, সাঁতরে তীরের কাছে গিয়ে ডুবো পাথরগুলোর মধ্যে ডেরা নিলে। জেলেরা নৌকো টেনে আনবার জন্য জলে নামছিল। তাদের একজন হাঁটুজলে নেমেছে। জলের ওপরে দেখা গেল তার হাঁটু পর্যন্ত চেহারা, জলের নিচু থেকে শুধু তার পা দু'খানা, সবই যেন জলের আয়নায় প্রতিবিম্বিত। আরেকজন জেলে কাঁধ পর্যন্ত জলে দাঁড়ানো। জলের তল থেকে মনে হল যেন চার পেয়ে এক কবন্ধ, যেন একইরকম দুটি লোক কাঁধে কাঁধে উল্টো করে জোড়া। ওরা যখন তীরে উঠছিল তখন ইকথিয়াণ্ডর তাদের দেখল যেভাবে মাছেরা দেখে। যেন একটা গোলকে ফোটা ছবি। তীরে পৌঁছবার আগেই তারা আপাদমস্তক ধরা পড়ছিল ইকথিয়াণ্ডরের চোখে। তাই সর্বদাই লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে সে পালাতে পারত।

কিন্তু এইসব চারপেয়ে কবন্ধ, আর দেহহীন মুণ্ডগুলো আজ ইকথিয়াণ্ডরের কাছে ভারি বিছছিরি লাগল। ভারি হৈ চৈ করে এরা, বিকট সব চুরুট খায়, বিদঘুটে গন্ধ ছড়ায়। না, ডলফিনদের সঙ্গ অনেক ভালো, অনেক পরিচ্ছন্ন তারা, অনেক ফুর্তিবাজ। একবার ডলফিনের দুধও খেয়েছিল সে, সে কথা মনে হতে আপন মনে হাসল, ইকথিয়াণ্ডর।

বেশ কিছু দক্ষিণে আছে ছোট একটা খাঁড়ি—খোঁচা খোঁচা ডুবো পাথর আর বালুচরের ফলে সেখানে সমুদ্রের জাহাজ যেতে পারে না, তীর সেখানে পাথুরে, খাঁজ খাঁজ। জেলে বা মুক্তো-সন্ধানী কেউ সেখানে যায় না। অগভীর তলটা তার ঘন শৈবালে ঢাকা। সেখানে উষ্ণ জলে ছোটো ছোটো মাছ অনেক। পরপর বহু বছর ধরে একটা মাদী ডলফিন এখানকার উষ্ণ জলে এসে বাচ্চা দিচ্ছে দুটো, চারটে, কখনো ছয়টি। বাচ্চাগুলোকে দেখে ভারি মজা লাগত ইকথিয়াণ্ডরের, জলতলের ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে নিশ্চলে লুকিয়ে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের চেয়ে দেখত। বাচ্চাগুলো কখনো আমোদ করে ডিগবাজি খেত ওপরে, কখনো কাড়াকাড়ি করে মায়ের মাই চুষত। সাবধানে ইকথিয়াণ্ডর ওদের পোষ মানাতে শুরু করে। মাছ ধরে ওদের খাওয়াত। ক্রমে ক্রমে মা-ডলফিন আর বাচ্চারা ওর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বাচ্চাগুলোর সঙ্গে হুটোপুটি করত সে, শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লোফালুফি করত। সেটা ভালো লাগত এদের। সুস্বাদু মাছ বা আরো সুস্বাদু নরম অক্টোপাস-বাচ্চা উপহার নিয়ে খাঁড়িতে ইকথিয়াণ্ডরের উদয় হওয়া মাত্র তারা ছেঁকে ধরত তাকে।

একবার ইকথিয়াণ্ডরের খেয়াল হয় ডলফিনের দুধ খেয়ে দেখবে। বাচ্চাগুলো তখনো ছোটো, দুগ্ধপোষ্য, মাছ খাওয়া তখনো শেখে নি। ইকথিয়াণ্ডর চুপিচুপি মা'টার কাছে গিয়ে আচমকা তাকে চেপে ধরে মুখ লাগায় বাঁটে। অপ্রস্তুত ডলফিনটা আতঙ্কে আকুলি-বিকুলি করতে থাকে জলে। ইকথিয়াণ্ডর অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ওকে ছেড়ে দেয়। ডলফিনের দুধের স্বাদটা কেমন যেন খুবই আঁশটে।

ভীত মাদীটা ছাড়া পেয়েই কোন-গভীরে যেন ছুটে পালায়, হতভম্ব বাচ্চাগুলোও এলোমেলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বোকাগুলোকে একত্রে জোটাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল ইকথিয়ান্ডরকে। অবশেষে মা-টা ফিরে এসে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যায় পাশের খাঁড়িতে। ওদের সঙ্গে ফের ইকথিয়ান্ডরের ভাব হয় বেশ কয়েক দিন পরে।

প্রচণ্ড দুর্ভাবনা হয়েছিল ক্রিস্টোর : তিন দিন দেখা নেই ইকথিয়ান্ডরের। ফিরল সে ক্লান্ত, ফ্যাকাশে মূর্তিতে তবে হাসিখুশি।

'গিয়েছিলে কোথায়?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টো, যদিও ইকথিয়ান্ডর ফেরায় হাঁপ ছেড়েই সে বাঁচল।

'সমুদ্রতলে'—বললে ইকথিয়ান্ডর।

'এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?'

'প্রায় মরতে বসেছিলাম...' জীবনে এই প্রথম মিথ্যা বললে ইকথিয়ান্ডর, ক্রিস্টোকে ঘটনার যে বিবরণ সে দিলে সেটা ঘটেছিল অনেক কাল আগে।

মহাসাগরের তলে ছিল শিলাময় একটা মালভূমি, আর তার মাঝখানটিতে ছিল ডিম্বাকার একটা গহ্বর, ঠিক যেন একটা পাহাড়ে হ্রদ।

এই হ্রদটার ওপরে সাঁতার দিচ্ছিল ইকথিয়ান্ডর। ভারি তার আশ্চর্য লেগেছিল তলদেশের অস্বাভাবিক হালকা ধূসর রঙটায়। আরো নিচে ডুব দিতেই ইকথিয়ান্ডর অবাক হয়ে দেখল : তলে নানারকম সামুদ্রিক জীবের এক সত্যিকারের করবখানা, ছোটো ছোটো মাছ থেকে হাঙর, ডলফিন সবই আছে সেখানে। তার কতকগুলো মারা পড়েছে তেমন বেশি আগে নয়। তবে সাধারণত মড়া-খেকো যে সব মাছ আর কাঁকড়া এসব ক্ষেত্রে গিজগিজ করে, এখানে তার চিহ্ন নেই। সবই মৃত, নিশ্চল, শুধু তল থেকে কোথাও কোথাও উঠে আসছে কী একটা গ্যাসের বুদ্বুদ।

গহ্বরটার ধার ঘেঁষে সাঁতরাচ্ছিল ইকথিয়ান্ডর। একটু নিচে নামতেই হঠাৎ প্রচণ্ড যন্ত্রণা করে উঠল কানকোয়, মাথা ঘুরতে লাগল। প্রায় জ্ঞান হারিয়ে অসহায়ের মতো সে লুটিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত গহ্বরের কানায় পৌঁছয়। দপদপ করছিল রগ, বুক টনটন করছিল, চোখ ভরে উঠছিল লালচে কুয়াশায়। সাহায্য করার কেউ নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল পাশেই একটা হাঙর খিঁচুনি খেতে খেতে তলাচ্ছে। নিশ্চয় তাকে আক্রমণ করার জন্য আসছিল হাঙরটা, তারপর নিজেই সে এই জলতলের বিষাক্ত হ্রদের মুখে পড়ে যায়। পেট আর পাশদুটো তার ওঠা-নামা করছে, হাঁ হয়ে গেছে মুখ, বেরিয়ে পড়েছে সাদা ছুঁচলো দাঁতের সারি। মরে গেল হাঙরটা, আর কেঁপে উঠল ইকথিয়ান্ডর। চোয়াল চেপে, কানকো বন্ধ করে সে হামাগুড়ি দিয়ে তীরে উঠল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু মাথা ঘুরে উঠে ফের পড়ে গেল সে। তারপর সজোরে ধূসর শিলায় লাথি মেরে সে অবশেষে বিপজ্জনক তীরটা থেকে মিটার দশেক সরে যেতে পারে...

গল্প শেষ করে ইকথিয়ান্ডর সালভাতরের কাছ থেকে যা পরে জেনেছিল সেটা যোগ করল:

'নিশ্চয় গহ্বরটায় কোনো বিষাক্ত গ্যাস জমেছে—হাইড্রোজেন সালফাইড কিংবা কঠিন অ্যানহাইড্রাইড হবে হয়তো। সমুদ্রের ওপর দিকে ওটা অক্সিডাইজ্‌ড্ হয়ে যায়, টের পাওয়া যায় না, কিন্তু গহ্বরে যেখানে ওটা তৈরি হচ্ছে, সেখানে তা খুব তেজী। নে, এবার আমায় খেতে দে, ভারি খিদে পেয়েছে।'

খাওয়া শেষ করে ইকথিয়ান্ডর দস্তানা-চশমা পরে এগোলো দরজার দিকে।

'শুধু এর জন্যেই এসেছিলে?' চশমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল ক্রিস্টো। 'কী হয়েছে তোমার বলছ না কেন, বলো তো?'

ইকথিয়ান্ডরের চরিত্রে একটা নতুন গুণ দেখা দিয়েছে: চাপা হতে শিখেছে সে।

'ও কথা জিজ্ঞেস করিস না ক্রিস্টো, নিজেই জানি না কী হয়েছে'—বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

একটু প্রতিশোধ

মুক্তো ব্যাপারি বালতাজারের দোকানে হঠাৎ নীল-নয়না মেয়েটিকে দেখে ইকথিয়ান্ডর হতচকিত হয়ে ছুটে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এখন কিন্তু তার ফের মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় করার ইচ্ছে হতে লাগল, কিন্তু কী করে করা যায় সেটা তার জানা ছিল না। সোজা উপায় ছিল ক্রিস্টোর সঙ্গে যাওয়া। কিন্তু আলাপের সময় ক্রিস্টো উপস্থিত থাকবে এটা ও চাইছিল না। প্রতিদিন তাই ইকথিয়ান্ডর চলে যেত সমুদ্রতীরের সেই জায়গায় যেখানে সে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিল। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সে বসে থাকত তীরের পাথরগুলোর মধ্যে লুকিয়ে। মেয়েটি যাতে ভয় না পায় সেজন্য সে চশমা-দস্তানা খুলে লুকিয়ে রাখা সাদা স্যুটটি পরত। কখনো কখনো সারা দিন-রাতই সে কাটিয়ে দিত উপকূলে, রাত্রে ডুব দিত সমুদ্রে, মাছ আর ঝিনুকের মাংস খেয়ে খিদে মেটাত, ছটফট করত ঘুমের মধ্যে, তারপর সূর্য ওঠার আগেই ফের গিয়ে হাজির হত নিজের জায়গাটিতে।

একবার সে ঠিক করল মুক্তো ব্যাপারির দোকানে গিয়েই দেখবে। দরজা খোলা ছিল, বুড়ো রেড-ইন্ডিয়ানকে দেখা গেল, কিন্তু মেয়েটি সেখানে ছিল না। তীরে ফিরে এল ইকথিয়ান্ডর। হঠাৎ পাথুরে তীরের ওপর দেখতে পেলে মেয়েটিকে, পরনে তার হালকা সাদা পোশাক, মাথায় স্ট্র-হ্যাট। থেমে গেল ইকথিয়ান্ডর, এগোতে সাহস হল না। কার যেন অপেক্ষা করছিল মেয়েটি। অধীরভাবে এ-ধার ও-ধার পায়চারি করছিল, থেকে থেকে তাকাচ্ছিল রাস্তার দিকে। ইকথিয়ান্ডরকে সে দেখতে পায় নি, শিলাটার আড়ালে ইকথিয়ান্ডর দাঁড়িয়ে ছিল।

অবশেষে কার উদ্দেশে যেন হাত নাড়লে মেয়েটি। ইকথিয়ান্ডর তাকিয়ে দেখলে, লম্বা, চওড়া-কাঁধ একটি যুবক হনহন করে আসছে রাস্তা দিয়ে। এ লোকটার মতো অমন হালকা চুল আর চোখ ইকথিয়ান্ডর কখনো দেখে নি। পালোয়ানের মতো লোকটা মেয়েটির কাছে এসে তার চ্যাটালো হাত বাড়িয়ে দিলে। সোহাগ ঢেলে বললে : 'নমস্কার গুত্তিয়েরে।'

'নমস্কার অল্‌সেন!' জবাব দিলে মেয়েটি।

গুত্তিয়েরের ছোটো হাতখানা সজোরে মর্দন করল পালোয়ান।

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ইকথিয়ান্ডর চাইল ওদের দিকে। মন খারাপ হয়ে গেল তার, কেমন যেন কান্না পেল!

'নিয়ে এসেছ?' গুত্তিয়েরের গলায় মুক্তার মালা দেখে বললে লোকটা।

মাথা নাড়ল গুত্তিয়েরে।

"বাবা জানতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল অল্‌সেন।

'না'—জবাব দিলে গুত্তিয়েরে, 'এটা আমার নিজের জিনিস, যা খুশি তাই করতে পারি।'

পাহাড়ে তীরটার একেবারে কিনারে এসে দাঁড়াল ওরা, কথা বলছিল আস্তে। গুত্তিয়েরে তার গলার মালাটা খুলে তার সুতোটা ধরে ওপরে তুললে, তারিফ করে বলল:

'দ্যাখো কেমন ঝকমক করছে সূর্যাস্তের আলোয়। নাও, অল্‌সেন...'

অল্‌সেন হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ গুত্তিয়েরের হাত ফসকে মালাটা পড়ে গেল সমুদ্রে।

'সর্বনাশ, কী হবে এখন!' ডুকরে উঠল গুত্তিয়েরে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওরা দাঁড়িয়ে রইল ওইখানেই।

'খুঁজে দেখলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল অল্‌সেন।

'এ জায়গাটা অনেক গভীর'—বললে গুত্তিয়েরে, 'কী পোড়া কপাল, অল্‌সেন!'

ইকথিয়ান্ডর দেখল ভারি মুষড়ে পড়েছে মেয়েটি। মুক্তাটা যে মেয়েটি ওই হালকা চুলো পালোয়ানকে দিতে যাচ্ছিল সে কথা সে ভুলেই গেল। মেয়েটির দুঃখে আর স্থির থাকতে পারল না ইকথিয়ান্ডর : পাড়ের ওপাশ থেকে সে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল গুত্তিয়েরের কাছে।

'ভুরু কোঁচকালে অলসেন, আর সকৌতুক বিস্ময়ে গুত্তিয়েরে চাইল তার দিকে : চিনতে পেরেছিল সে, এই তরুণটিই সেদিন অমন হঠাৎ করে দোকান থেকে ছুটে পালায়।

'সমুদ্রে আপনার মুক্তোর মালা পড়ে গেছে তো?' জিজ্ঞেস করলে ইকথিয়ান্ডর, 'যদি চান আমি খুঁজে দেব।'

'আমার বাবা নামকরা ডুবুরি, কিন্তু এ জায়গাটায় তিনিও পারবেন না'—আপত্তি করল গুত্তিয়েরে।

'চেষ্টা করে একটু দেখা যাক'—বিনীতভাবে বলল ইকথিয়ান্ডর, তারপর গুত্তিয়েরে ও অলসেনকে অবাক করে, পোশাক না ছেড়েই ওই ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে এবং অদৃশ্য হল।

কী ব্যাপার ভেবে পেল না অল্‌সেন।

'কে ও? এল কোত্থেকে?'

এক মিনিট, দুই মিনিট কাটল, ইকথিয়ান্ডরের দেখা নেই।

'তলিয়ে গেল নাকি'—ঢেউয়ের দিকে চেয়ে সভয়ে বলল গুত্তিয়েরে।

জলের তলে যে সে থাকতে পারে মেয়েটিকে তা জানতে দেবার ইচ্ছা ছিল না ইকথিয়ান্ডরের।

মুক্তা খোঁজার আগ্রহে সময়ের হিসেব রাখতে পারেনি সে, ডুবুরিরা যতক্ষণ ডুবে থাকতে পারে তার চেয়ে রইল সে একটু বেশিই। ওপরে ভেসে উঠে সে হেসে বলল 'একটু অপেক্ষা করুন। জলের নিচে পাথরের টুকরো অনেক। তাই খোঁজা কঠিন। তবে বার করব।' ফের ডুব দিল সে।

মুক্তা-সন্ধানীদের কাজ গুত্তিয়েরে দেখেছে একাধিক বার। তাই দেখে অবাক লাগল যে ছেলেটি জলের তলে প্রায় দুই মিনিট ডুবে থাকার পরও একটুও হাঁপাল না, একটুও ক্লান্ত দেখাল না তাকে।

দুই মিনিট পরে ইকথিয়ান্ডর ফের ভেসে উঠল ওপরে। মুখখানা তার আনন্দে জ্বলজ্বল করল। হাত তুলে সে মালাটা দেখাল।

একটুও না হাঁপিয়ে একান্ত স্বাভাবিক গলায় সে বলল, 'পাড়ের ঢিপটায় আটকে গিয়েছিল। ফাটলের মধ্যে পড়লে ঝামেলা পোয়াতে হত অনেক।'

তাড়াতাড়ি পাড় বেয়ে উঠে সে মালাটা দিল গুত্তিয়েরেকে। পোশাক থেকে তার অঝোরে জল ঝরছিল, কিন্তু সে দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করল না।

'এই নিন।'

'ধন্যবাদ'—বলে নতুন একটা কৌতূহলে গুত্তিয়েরে তাকাল তার দিকে।

সবাই চুপ করে রইল। কী এখন করা যায়, তিনজনের কেউ তা ভেবে পাচ্ছিল না। ইকথিয়াণ্ডরের সামনে মালাটা অল্‌সেনকে দিতে ইতস্তত করছিল গুত্তিয়েরে।

'আপনি বোধ হয় মালাটা ওকে দিতে চাইছিলেন'—অলসেনকে দেখিয়ে বলল ইকথিয়াণ্ডর।

লাল হয়ে উঠল অল্‌সেন, আর বিব্রত গুত্তিয়েরে বলল, 'ও, হ্যাঁ... বলে মালাটা বাড়িয়ে দিল অলসেনের দিকে, সে-ও নীরবে সেটি নিয়ে পকেটে পুরল।

খুশি লাগছিল ইকথিয়াণ্ডরের। তার দিক থেকে এটা ছোট্ট একটু প্রতিহিংসা। হারানো মালাটা পালোয়ান উপহার পেল গুত্তিয়েরের হাত দিয়ে হলেও আসলে তার কাছ থেকেই।

মেয়েটির উদ্দেশ মাথা নুইয়ে ইকথিয়াণ্ডর দ্রুত চলে গেল রাস্তা দিয়ে।

তবে ইকথিয়াণ্ডরের খুশিটা বেশিক্ষণ টিকল না। নতুন নতুন ভাবনা আর জিজ্ঞাসা দেখা দিল তার মনে। লোকজন সম্পর্কে জ্ঞান তার কম। কে এই কটাচুলো পালোয়ানটা? গুত্তিয়েরে কেন তাকে নিজের গয়না দিচ্ছে? কী কথা বলাবলি করছিল ওরা?

সে রাতে ইকথিয়াণ্ডর ফের তার ডলফিনকে ছুটিয়ে বেড়াল, অন্ধকারে চিৎকার করে ভয় পাওয়াল জেলেদের।

পরের গোটা দিনটাই ইকথিয়াণ্ডর জলের নিচে কাটাল। চশমা পরলেও দস্তানা খুলে সে মুক্তো-ভরা ঝিনুকের খোঁজে ঢুঁড়ে বেড়াল বালুময় সমুদ্রতল। সন্ধ্যায় এল ক্রিস্টোর কাছে, সে-ও গজগজ করে বকুনি দিল। সকালে পোশাক পরা অবস্থায় তাকে দেখা গেল সেই পাড়টায়, সেখানে গুত্তিয়েরে আর অল্‌সেনের দেখা মিলেছিল। বিকেলে সূর্যাস্তের সময় সেবারের মতোই প্রথম এসে দাঁড়াল গুত্তিয়েরে।

পাহাড়ের ওপাশ থেকে ইকথিয়াণ্ডর এসে দাঁড়াল মেয়েটির কাছে। ওকে দেখে পরিচিতের মতো মাথা নাড়লে গুত্তিয়েরে, হেসে জিজ্ঞেস করল : 'আমার পেছু নিয়েছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ'—সরলভাবে বলল ইকথিয়াণ্ডর, 'প্রথম যেদিন দেখেছি সেই থেকে।' তারপর বিব্রতভাবে যোগ করল, 'মালাটা আপনি ওকে...মানে অল্‌সেনকে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দেবার আগে মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন ওটাকে। মুক্তো আপনি ভালোবাসেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমার কাছ থেকে এটা নিন'—বলে একটি মুক্তা বাড়িয়ে দিল সে।

মুক্তার দাম গুত্তিয়েরে ভালোই জানত। কিন্তু যত মুক্তা সে দেখেছে, বাবার কাছ থেকে যত গল্প সে শুনেছে, সবকে ছাড়িয়ে যায় ইকথিয়াণ্ডরের হাতের মুক্তাটি। বিশাল আকারের, নিখুঁত গড়নের ধবধবে সাদা মুক্তাটির ওজন দু'শ ক্যারাটের কম নয়, দাম অন্তত দশ লাখ সোনার পেসো। অভিভূত গুত্তিয়েরে একবার তাকায় অসাধারণ মুক্তাটির দিকে, একবার দ্যাখে সামনে দাঁড়ানো সুকুমার তরুণকে, সবল, সুঠাম, সুপুরুষ, কিন্তু একটু যেন লাজুক, পরনে দলামোচড়া সাদা স্যুট, দেখতে বুয়েনাস-আইরেসের ধনীর দুলালদের মতো একটুও নয়। আর তাকে, প্রায় না-চেনা একটা মেয়েকে সে কিনা দিতে চাইছে অমন একটা উপহার।

'নিন—না'—সনির্বন্ধ পুনরুক্তি করল ইকথিয়াণ্ডর।

'না-না'—মাথা নেড়ে বলল গুত্তিয়েরে, 'অত দামী উপহার আমি আপনার কাছ থেকে নিতে পারি না।'

'মোটেই কিছু দামী নয়'—উত্তেজিত হয়ে বলল ইকথিয়াণ্ডর, 'সাগরের তলে অমন মুক্তা হাজার হাজার।'

হাসল গুত্তিয়েরে, আর বিব্রত হয়ে লাল হয়ে উঠল ইকথিয়াণ্ডর, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলল : 'মিনতি করছি, নিন এটা।'

'উঁহুঁ'।

ভুরু কোঁচকাল ইকথিয়াস্তর, ক্ষুব্ধ হল সে।

'নিজে যদি না নিতে চান'—জিদ ধরল ইকথিয়াস্তর, 'তাহলে ওর জন্যে... ওই অল্‌সেনের জন্যে নিন। ও আপত্তি করবে না।'

রেগে উঠল গুত্তিয়েরে। কড়া গলায় বলল :

'নিজের জন্যে ও নেয় নি। কিছুই আপনি জানেন না!'

'তার মানে, নেবেন না?'

'না।'

সমুদ্রে মুক্তোটা ছুড়ে ফেলল ইকথিয়াস্তর। নীরবে মাথা নুইয়ে সে ঘুরে চলে গেল রাস্তার দিকে।

ব্যাপারটায় স্তম্ভিত হয়ে গেল গুত্তিয়েরে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। লাখ দশেক টাকাকে স্রেফ সামান্য একটা ঢিলের মতো সমুদ্রে ছুড়ে ফেলা! কেমন লজ্জা হল তার। অদ্ভুত এই তরুণটির মনে কেন দুঃখ দিল সে।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, কোথায় যাচ্ছেন?'

ইকথিয়াস্তর কিন্তু মাথা নিচু করে হেঁটেই চলল। পেছন থেকে ছুটে এসে গুত্তিয়েরে তার হাত ধরল, তাকাল তার মুখের দিকে। গাল বেয়ে ওর জল গড়িয়ে পড়ছিল। আগে কখনো কাঁদে নি ইকথিয়াস্তর। তাই বুঝতে পারছিল না আশেপাশের জিনিস অমন ঝাপসা দেখাচ্ছে কেন, মনে হয় যেন বিনা চশমায় সাঁতার দিচ্ছে জলের তলে।

'আপনার মনে আঘাত দিয়েছি, মাপ করুন'—ওর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল গুত্তিয়েরে।

জুরিতার অধৈর্য

এরপর থেকে ইকথিয়ান্ডর রোজ সন্ধ্যায় চলে যেত তীরে, শহর থেকে একটু দূরে, সেখানে পাথরের ফাঁকে লুকানো পোশাকটি পরে আসত পাহাড়টার কাছে, গুত্তিয়েরেও আসত সেখানে, তীর বরাবর পায়চারি করত তারা, সোৎসাহে গল্প করত। এই নতুন বন্ধুটি কে তা গুত্তিয়েরে বলতে পারত না। বোকা নয় ছেলেটি, এমনিতে সুরসিক, অনেক ব্যাপারেই গুত্তিয়েরের চেয়ে সে জানে বেশি, অথচ সেই সঙ্গে শহরের একটা বাচ্চাও যা জানে, তেমন সাধারণ জিনিসও সে বুঝতে পারত না। কী তার কারণ? নিজের কথা ইকথিয়ান্ডর বলত খুবই অনিচ্ছাভরে। সত্যি কথা খুলে বলতে তার ইচ্ছে হত না। গুত্তিয়েরে শুধু এইটুকু জানত যে ইকথিয়ান্ডর এক ডাক্তারের ছেলে, বোঝাই যায় লোকটি খুব ধনী, ছেলেকে তিনি লোকজন, শহর থেকে দূরে মানুষ করেছেন, খুবই বিশেষ ধরনের একটা একপেশে শিক্ষা দিয়েছেন তাকে।

মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে তারা বসে থাকত তীরে। পায়ের কাছে লুটোত সমুদ্রের ফেনা, মিটমিট করত তারা, নীরব হয়ে আসত আলাপ। সুখে ভরে উঠত ইকথিয়ান্ডরের বুক।

'এবার চলি'—বলত মেয়েটি।

অনিচ্ছায় উঠত ইকথিয়ান্ডর, শহরের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিত, তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে, পোশাক ছেড়ে সাঁতরে আসত নিজের ডেরায়।

সকালে প্রাতরাশের পর একখানা রুটি নিয়ে সে রওনা দিত খাঁড়িতে। বালুময় তলদেশে বসে রুটি খাওয়াত মাছেদের। ঝাঁক বেঁধে ওরা ঘিরে ধরত তাকে, হাতের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত, হাত থেকেই লোভীর মতো খেত ভেজা রুটি। মাঝেমাঝে বড়ো মাছেরা হানা দিয়ে ছোটোগুলোকে তাড়িয়ে দিত। ইকথিয়ান্ডর তখন উঠে তাড়া দিত ওগুলোকে, ছোটরা গিয়ে লুকোত তার পেছনে।

মুক্তো খোঁজা শুরু করেছিল সে, সেগুলোকে রাখত জলের তলের এক খোঁদলে। কাজটা তার ভালোই লাগত, অচিরেই বাছাই করা মুক্তোর একটা ঢিপি গড়ে উঠল তার।

নিজেই সে জানত না যে আর্জেন্টিনার, হয়তো বা গোটা দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড়োলোক হয়ে উঠছে সে। ইচ্ছে করলে সে হতে পারত বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ধনী। কিন্তু ধনের লালসা তার ছিল না।

এইভাবেই কেটে যেত শান্ত দিনগুলো। শুধু একটা খেদ ছিল ইকথিয়ান্ডরের : গুত্তিয়েরে থাকে ধুলোভরা গোলমেলে, গুমোট শহরটায়। লোকজন, গোলমাল থেকে দূরে জলের তলে যদি সে থাকতে পারত—কী সুন্দরই-না হত তাহলে! না-জানা এক নতুন জগৎ তাকে দেখাত সে, দেখাত তলদেশের অপূর্ব সব ফুল। কিন্তু জলের তলে গুত্তিয়েরের থাকা সম্ভব নয়। ইকথিয়ান্ডরও মাটির ওপর বাস করতে পারে না। এমনিতেই হাওয়াতে সে কাটাচ্ছে

অনেক সময়। তার ফলও ফলছে। মেয়েটির সঙ্গে তীরে বসে থাকার সময় আজকাল ঘন ঘনই সেই পাঁজরার ব্যথাটা টের পাচ্ছে সে। কিন্তু ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠলেও মেয়েটি নিজে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে কখনো তাকে ছেড়ে পালাত না। তাছাড়া আরো একটা খুঁতখুঁতি ছিল ইকথিয়ান্ডরের, শনচুলো পালোয়ানটার সঙ্গে কী কথা বলেছিল গুত্তিয়েরে? প্রতি বারই সে ভাবত জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু ভয় হত পাছে গুত্তিয়েরে রাগ করে।

একদিন সন্ধ্যায় মেয়েটি বলল যে, পরের দিন সে আসবে না।

'কেন?' ভুরু কুঁচকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

'কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'অত কৌতূহল ভালো নয়'—হেসে জবাব দিল গুত্তিয়েরে। তারপর 'আজ আমায় এগিয়ে দিতে হবে না'—বলে চলে গেল।

ইকথিয়ান্ডরও ডুব দিল সমুদ্রে। সারা রাত সে শুয়ে রইল শ্যাওলাটে পাথরগুলোর ওপর। মন খারাপ লাগছিল তার। ভোরে ফিরল নিজের বাড়িতে। খাঁড়ির কিছু দূরে তার চোখে পড়ল নৌকো থেকে জেলেরা গুলি করছে ডলফিনদের। প্রকাণ্ড একটা ডলফিন গুলি খেয়ে বাতাসে লাফিয়ে উঠে ঝপাং করে জলে পড়ল।

'লিডিঙ!' আতঙ্কে ফিসফিস করল ইকথিয়ান্ডর।

একটা জেলে ততক্ষণে জলে লাফিয়ে পড়েছে। ডলফিনটা ওপরে কখন ভেসে উঠবে তার অপেক্ষা করতে লাগল সে। ডলফিন কিন্তু ভেসে উঠল ডুবুরিটার কাছ থেকে শত খানেক মিটার দূরে, বাতাসে দম নিয়ে আবার ডুব দিলে।

দ্রুত ডলফিনটার দিকে সাঁতরাতে লাগল জেলেটা। বন্ধুকে সাহায্যের জন্য ছুটে এল ইকথিয়ান্ডর। কিন্তু ডলফিনটা আরেকবার ভেসে উঠতেই জেলেটা তার পাখনা চেপে ধরে নিস্তেজ প্রাণীটাকে ঠেলতে লাগল নৌকোর দিকে।

জলের তলে সাঁতরে এসে ইকথিয়ান্ডর নিজের দাঁত দিয়েই কামড় বসালে জেলেটার পায়ে। জেলে ভাবল হাঙরে ধরেছে, প্রাণপণে লাথি মারতে লাগল সে : তার এক হাতে ছিল একটা ছুরি, আত্মরক্ষায় তাই দিয়ে সে ঘাই মারল। ঘা'টা লাগল ইকথিয়ান্ডরের ঘাড়ে, ও জায়গাটা আঁশে ঢাকা ছিল না। জেলের পা ছেড়ে দিল ইকথিয়ান্ডর, সে-ও সাঁতরে পালাল নৌকোর দিকে। আহত ইকথিয়ান্ডর আর ডলফিন রওনা দিল খাঁড়ির দিকে। ডলফিনকে নিয়ে ইকথিয়ান্ডর ঢুকল একটা জলতলের গুহায়। জল এখানে মাত্র আধাআধি, ফাটল দিয়ে বাতাস আসতে পারে। নিরাপদে ডলফিন এখানে দম নিতে পারবে। ডলফিনের জখমটা দেখল ইকথিয়ান্ডর—তেমন মারাত্মক নয়। গুলিটা চামড়া ভেদ করে চর্বিতে আটকে গেছে। আঙুল দিয়েই গুলিটা বার করে আনল ইকথিয়ান্ডর। ধৈর্য ধরে ডলফিন সেটা সইল।

বন্ধুর পিঠ চাপড়ে আদর করে বলল ইকথিয়ান্ডর, 'ভাবনা নেই, ভালো হয়ে যাবি।'

এবার নিজের কথা ভাবতে হয়। তাড়াতাড়ি টানেল বেয়ে সাঁতরে ইকথিয়ান্ডর বাগানে এল, ঢুকল নিজের সাদা বাড়িতে।

জখম দেখে আঁতকে উঠল ক্রিস্টো।

'কী হয়েছে তোমার?'

'ডলফিনকে বাঁচাতে গিয়ে জেলের হাতে জখম হই'—বলল ইকথিয়ান্ডর। ক্রিস্টো কিন্তু বিশ্বাস করলে না।

'আমাকে ছাড়াই ফের শহরে গিয়েছিল বুঝি?' জখমটা ব্যান্ডেজ করতে করতে সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল ক্রিস্টো। ইকথিয়ান্ডর চুপ করে রইল।

'তোমার আঁশটা একটু তোলো তো'—বলে ইকথিয়ান্ডরের কাঁধটা সে খানিকটা খুলল। কাঁধে দেখা গেল লালচে একটা দাগ। দেখে ভয় লাগল তার।

'দাঁড় দিয়ে কেউ ঘা মেরেছিল? কাঁধটা টিপতে টিপতে জিজ্ঞেস করলে সে। কিন্তু ফোলাটোলা কিছু নেই। সম্ভবত ওটা জন্মগত একটা জড়ুল।

'না'—বলল ইকথিয়ান্ডর।

নিজের ঘরে বিশ্রাম নিতে গেল ইকথিয়ান্ডর, আর দুই হাতে মাথা চেপে ধরে ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ক্রিস্টো। অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর সে উঠে রওনা দিল শহরে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বালতাজারের দোকানে ঢুকল। কাউন্টারের কাছে বসে থাকা গুস্তিয়েরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল :

'বাপ বাড়ি আছে?'

'ওখানে'—অন্য ঘরটার দিকে মাথা হেলিয়ে দেখাল সে।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে ক্রিস্টো দরজা বন্ধ করে দিল।

মুক্তো ধুয়ে পরিষ্কার করছিল বালতাজার। মেজাজটা তার সেবারকার মতোই তিরিক্ষি।

'তোমাদের নিয়ে পাগল হবার যোগাড়!' গজগজ করল বালতাজার, 'জুরিতা চটাচটি করছে, 'দানো'কে এখনো আনতে পারলে না কেন, গুস্তিয়েরে ওদিকে সারা দিনমানের মতো কোথায় বেরিয়ে যায়। জুরিতার কথা কানেই তুলতে চায় না। কেবলি 'না!' আর 'না!' জুরিতা বলছে, 'কতদিন আর বসে থাকব, বিরক্ত ধরে গেল। জোর করে নিয়ে যাব। একটু কাঁদবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।' ওর পক্ষে সবই সম্ভব।' ক্রিস্টো ভাইয়ের বিলাপ সবটা শোনার পর বলল :

'শোন, 'দানো'কে নিয়ে আসতে পারছি না, কারণ গুস্তিয়েরের মতো ও-ও সারাদিন কোথায় উধাও হয়ে যায়, আমার সঙ্গে শহরেও যেতে চায় না। আমার কথা আজকাল আর একদম শোনে না। ইকথিয়ান্ডরের দেখাশোনায় গাফিলতি করেছি বলে ডাক্তার আমায় ধমকাবে..'

'তার মানে তাড়াতাড়ি ওকে পাকড়াও করা কি চুরি করা দরকার। সালভাতর ফিরে আসার আগেই তুই সরে পড়বি...'

'দাঁড়া, বালতাজার, আমায় শেষ করতে দে। ইকথিয়ান্ডরকে নিয়ে আমাদের তাড়াহুড়োর দরকার নেই।'

'কেন দরকার নেই?'

নিশ্বাস ফেললে ক্রিস্টো, যেন স্থির করতে পারছে না নিজের পরিকল্পনাটা সে খুলে বলবে কিনা। 'ব্যাপার হল এই...' বলে শুরু করেছিল সে।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই কে যেন দোকানে ঢুকল, শোনা গেল জুরিতার চড়া গলা।

'নাও হল'—মুক্তোগুলোকে অ্যাসিডে ডুবিয়ে গজগজ করলে বালতাজার, 'ফের এসেছে!'

ঘটাং করে দরজা খুলে ল্যাবরেটরিতে ঢুকল জুরিতা।

'দুই ভাই-ই দেখছি এখানে। কত আর আমায় ঘোরাবি?' বালতাজারের ওপর থেকে দৃষ্টিটা ক্রিস্টোর দিকে ফিরিয়ে বলল সে।

উঠে দাঁড়াল ক্রিস্টো, অমায়িক হেসে বলল :

'যা সাধ্য সবই করে যাচ্ছি। সবুর করতে হবে বৈকি। 'দরিয়ার দানো' তো আর একটা সাধারণ মাছ নয়। চট করেই কি আর হয়। একবার তো ওকে নিয়েই এসেছিলাম, কিন্তু আপনি ছিলেন না। শহরটা দেখে ওর ভালো লাগে নি, এখন আর আসতে চায় না।'

'আসতে না চায়, বয়ে গেল। দিন গুণতে গুণতে আমার বিরক্ত ধরে গেছে। এই সপ্তাহেই আমি একই সঙ্গে দুটো কাজ সারব। সালভাতর এখনো ফেরে নি?'

'যে কোনো দিনই এসে যেতে পারে।'

'তার মানে তাড়াতাড়ি করতে হয়। বাছা বাছা কয়েকজন লোক জুটিয়েছি। তুই আমাদের শুধু দরজা খুলে দিবি ক্রিস্টো, বাকিটা আমি নিজেই দেখব। সব ঠিকঠাক হলে বালতাজারকে জানিয়ে দেব।' তারপর বালতাজারের দিকে ফিরে বলল, 'আর তোর সঙ্গে আমার কথা হবে কাল, কিন্তু মনে থাকে যেন, এই শেষ আলাপ।'

দু'ভাই নীরবে মাথা নোয়াল। কিন্তু জুরিতা পেছন ফিরতেই ওদের মুখের অমায়িক হাসিটির লেশও রইল না। আস্তে মুখ খিস্তি করে উঠল বালতাজার, আর কী একটা ভাবনায় যেন ডুবে গেল ক্রিস্টো।

দোকানে গুস্তিয়েরেকে কী যেন বলল জরিতা!

'না!' শোনা গেল গুস্তিয়েরের জবাব। হতাশায় মাথা ঝাঁকাল বালতাজার।

'ক্রিস্টো'—ডাক শোনা গেল জুরিতার, 'চল্ আমার সঙ্গে। তোকে আজ আমার দরকার আছে।'

বিশ্রী সাক্ষাৎ

খুব খারাপ বোধ করছিল ইকথিয়াণ্ডর। ঘাড়ের জখমটা টনটন করছিল। জ্বর উঠেছিল। ভারি কষ্ট হচ্ছিল বাতাসে নিশ্বাস নিতে।

কিন্তু সকালে এসব সত্ত্বেও রওনা দিল তীরের পাহাড়টার দিকে গুত্তিয়েরের সঙ্গে দেখা করতে। গুত্তিয়েরে এল ঠিক দুপুরে। অসহ্য গরম তখন। আতপ্ত বাতাস আর সাদা সাদা মিহি ধুলোয় খাবি খেতে লাগল ইকথিয়াণ্ডর। সমুদ্র-তীরেই থাকতে চাইছিল সে, কিন্তু গুত্তিয়েরের তাড়া ছিল। শহরে ফিরতে হবে তাকে।

'বাবা কাজে বেরুচ্ছেন, দোকানে থাকতে হবে আমায়।'

'তাহলে চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিই।'

শহরে যাবার তপ্ত ধূলিময় রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা।

উল্টো দিক থেকে মাথা নিচু করে আসছিল অল্‌সেন। কী যেন একটা ভাবছিল সে, পাশ দিয়ে চলে গেল অথচ গুত্তিয়েরেকে দেখতে পেল না। কিন্তু গুত্তিয়েরেই ওকে ডাকল।

'ওর সঙ্গে দুটো কথা আছে আমার'—ইকথিয়াণ্ডরকে বলল সে, তারপর পেছন ফিরে চলে গেল অল্‌সেনের কাছে। নিচু গলায় দ্রুত কী যেন বলাবলি করল ওরা। মনে হল মেয়েটি কী যেন অনুরোধ করছে ওকে।

ইকথিয়াণ্ডর ছিল ওদের চেয়ে কয়েক পা পেছনে।

কানে এল অল্‌সেনের গলা, 'বেশ, তাহলে আজ মাঝরাতের পর।' পালোয়ান মেয়েটির করমর্দন করে মাথা নেড়ে চলে গেল।

গুত্তিয়েরে যখন ইকথিয়াণ্ডরের কাছে এল তখন ওর গাল আর কান জ্বলছে। ইচ্ছে হচ্ছিল অন্তত আজ সে গুত্তিয়েরের কাছে অল্‌সেন প্রসঙ্গ তুলবে, কিন্তু ভাষা যোগাচ্ছিল না।

'আমি আর পারছি না'—হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'আমার জানা দরকার...অল্‌সেন...আপনি কী একটা জিনিস আমার কাছে লুকোচ্ছেন। রাতে আজ আপনাদের দেখা হবে। ওকে ভালোবাসেন আপনি?'

গুত্তিয়েরে ইকথিয়াণ্ডরের হাত ধরে কোমল দৃষ্টিপাত করে সস্নেহে বলল :

'আমায় বিশ্বাস করেন?'

'করি...আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি'—এ কথাটার মানে ইকথিয়াণ্ডর এখন জানে, 'কিন্তু আমি...ভারি কষ্ট হয় আমার।'

সেটা ঠিক। অনিশ্চয়তার কষ্ট তার এমনিতেই ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে পাঁজরে একটা তীক্ষ্ণ শূল বেদনা অনুভব করছিল সে। খাবি খেতে লাগল সে। গালের লাল মুছে গিয়ে মুখ হয়ে উঠল ফ্যাকাসে।

'আপনি একেবারে অসুস্থ'—শঙ্কিতভাবে বলল মেয়েটি, 'মিনতি করছি, শান্ত হোন। লক্ষ্মী আমার। সব কথা আপনাকে বলতে চাইনি, তবে আপনাকে শান্ত করার জন্যে বলব। শুনুন...'

কে একজন ঘোড়াসওয়ার ওদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, কিন্তু গুত্তিয়েরেকে দেখতে পেয়ে সবেগে ঘোড়া ঘুরিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। ময়লাটে রঙের একটি লোককে দেখল ইকথিয়ান্ডর, যুবক এখন আর তাকে বলা যায় না, ওপর দিকে পাকিয়ে তোলা ফুলো ফুলো গোঁফ, থুতনিতে ছাগলদাড়ি।

কবে যেন, কোথায় যেন ইকথিয়ান্ডর লোকটাকে দেখেছে। শহরে নাকি? না, না... সমুদ্রতীরে।

হাইবুটে চাবুক কষে সওয়ারি বিরূপ ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ইকথিয়ান্ডরকে, করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল গুত্তিয়েরের দিকে।

গুত্তিয়েরে হাত এগিয়ে দিতেই সে আচমকা তাকে টেনে তুলল জিনের ওপর, হাতে চুমু খেয়ে হেসে উঠল।

'ধরা পড়ে গেছ তো!' ভ্রুকুঞ্চিত গুত্তিয়েরের হাত ছেড়ে দিয়ে সে ঠাট্টা সুরে এবং খানিকটা বিরক্তিভরেই বলে চলল, 'আজ বাদে কাল বিয়ে আর বাগদত্তা কনে ওদিকে তরুণ পরপুরুষের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে—এ কে কবে দেখেছ?'

রেগে উঠল গুত্তিয়েরে, কিন্তু ও তাকে বলতে দিল না।

'বাবা আপনার জন্যে বসে আছে অনেকক্ষণ। আমি দোকানে ফিরব ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।'

শেষ কথাগুলো আর ইকথিয়ান্ডরের কানে গেল না। হঠাৎ তার মনে হল চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে, গলার মধ্যে কেমন একটা দলা পাকিয়ে উঠছে, থেমে গেছে নিশ্বাস। বাতাসে আর দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

'আপনি তাহলে...আমাকে ছলনাই করেছেন...' নীল হয়ে আসা ঠোঁট দিয়ে সে বললে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের ক্ষোভটা সে পুরো প্রকাশ করে অথবা ব্যাপারটা সব জেনে নেয়, কিন্তু পাঁজরার ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠল, প্রায় জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল তার। শেষ পর্যন্ত ছুটে তীরে গিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাঁড়াই পাহাড় থেকে।

চেঁচিয়ে উঠল গুত্তিয়েরে, টলতে লাগল সে। তারপর রুখে গেল পেদ্রো জুরিতার দিকে।

'জলদি..বাঁচান ওকে!'

জুরিতা কিন্তু নড়ল না।

বলল, 'কারো যদি ডুবে মরার ইচ্ছে হয় তাতে বাধা দেবার অভ্যেস আমার নেই।'

তীরে ছুটে গেল গুত্তিয়েরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। জুরিতা ঘোড়া ছুটিয়ে ওর নাগাল ধরল, ঘোড়ার ওপর ওকে তুলে নিয়ে রাস্তায় ফিরল জুরিতা।

'আমায় কেউ বাধা না দিলে অন্যের ব্যাপারে বাধা দেওয়ার অভ্যেস আমার নেই। এ বরং ভালোই হল। আত্মস্থ হোন গুত্তিয়েরে।'

গুত্তিয়েরে কিন্তু জবাব দিল না। মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল সে। জ্ঞান ফিরল কেবল বাপের দোকানে এসে।

'ছোকরাটি কে?' জিজ্ঞেস করল পেদ্রো।

জুরিতার দিকে গুত্তিয়েরে তাকাল অনাবৃত ক্রোধের দৃষ্টিতে।

'ছেড়ে দিন আমায়।'

ভুরু কোঁচকাল জুরিতা। ভাবল, 'কী বোকামি। ওর রোমাঞ্চের নায়ক ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে। তা ভালোই হল।' তারপর দোকানদারের উদ্দেশে হাঁক দিল :

'ও হে, বালতাজার! কই হে!'

ছুটে এল বালতাজার।

'মেয়েকে ধর। ধন্যবাদ দে আমায়। বাঁচালাম ওকে: 'সুকুমার একটি তরুণের পিছু পিছু ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল সমুদ্রে। দু'বার তোর মেয়ের জীবন বাঁচালাম। অথচ এখনো আমায় এড়িয়ে চলছে। তবে শিগগিরই গোঁয়ার্তুমি শেষ হচ্ছে'—হো-হো করে হেসে উঠল সে। 'এক ঘণ্টা বাদে আসব। যা কথা হয়েছে ভুলিস না।'

দীনভাবে মাথা নুইয়ে পেদ্রোর কাছ থেকে মেয়েকে নিল বালতাজার।

ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সওয়ারি।

বাপ-মেয়ে ঢুকল দোকানে। দরজা ভেজিয়ে বালতাজার পায়চারি করতে করতে উত্তেজিতভাবে কী সব বলে যাচ্ছিল। কিন্তু কেউ ওকে শুনছিল না। তাকের ওপরকার শুকনো কাঁকড়া আর সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর সামনেও বালতাজার বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারত সমান বাগ্মিতায়।

আর গুত্তিয়েরে ভাবছিল ইকথিয়াণ্ডরের মুখখানার কথা, 'জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বেচারি। প্রথমে অল্‌সেন, তারপর জুরিতার সঙ্গে ওই বিদঘুটে সাক্ষাৎ। কী স্পর্ধা ওর যে আমায় বলে কনে। এবার সব গেল..' কাঁদল গুত্তিয়েরে। কষ্ট হচ্ছিল ইকথিয়াণ্ডরের জন্য। সহজ, লাজুক—বুয়েনাস-আইরেসের শূন্যগর্ভ দাম্ভিক যুবকদের সঙ্গে কোথায় তার তুলনা।

বালতাজার ওদিকে গজগজ করেই চলেছে:

'বুঝছিস্ না, গুত্তিয়েরে? এ যে সর্বনাশ! দোকানে যা দেখছিস, ও সবেরই মালিক হল জুরিতা। আমার নিজের বলতে এর দশ ভাগের এক ভাগও নেই। সব মুক্তো আমরা কমিশনে পাই জুরিতার কাছ থেকে। তুই যদি আবার আপত্তি করিস, তাহলে সমস্ত মাল ও নিয়ে নেবে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। তাহলে যে সর্বনাশ হবে, একেবারে দেউলিয়া! একটু বুঝে দেখ। বুড়ো বাপকে একটু মায়া কর।'

'যা বলবে বলো, কিন্তু ওকে আমি বিয়ে করব না, কিছুতেই না!'

'হারামজাদি!' ক্ষেপে গর্জে উঠল বালতাজার। 'তাই যদি ঠিক করিস তাহলে আমি...না, আমি নই, জুরিতা নিজেই তোকে শায়েস্তা করবে!'

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে বুড়ো সজোরে দরজা বন্ধ করল।

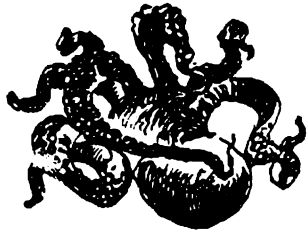

অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াই

সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর ইকথিয়ান্ডর কিছুক্ষণের জন্য তার সমস্ত পার্থিব দুঃখের কথা ভুলে গেল। মাটির গরম গুমোটের পর জলের শীতলতায় সুস্থির ও তাজা হয়ে উঠল সে। থেমে গেল শূল বেদনাটা। সমান ছন্দে গভীর নিশ্বাস নিতে লাগল। এখন ওর দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। মাটির ওপর যা ঘটেছে সে ভুলে যেতে চাইল।

কিছু একটা করতে, কোথাও ছুটতে চাইছিল সে। কিন্তু কী করা যায়? অন্ধকার রাতে উঁচু পাহাড় থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে ভালোবাসে, এক দমকেই একেবারে পৌঁছানো যায় তলায়। কিন্তু এখন ভর দুপুর, সাগর জুড়ে ছড়িয়ে আছে কালো কালো জেলে নৌকো।

ভাবলে, 'তাহলে গহ্বরটাকে গুছিয়ে তোলা যাক।'

খাঁড়ির খাড়াই পাহাড়টার গায়ে আছে মস্তো একটা খিলানওয়ালা গুহা। ধীরে ধীরে সমুদ্রের গভীর পর্যন্ত নেমে যাওয়া একটা জলতল সমভূমির অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে সেখান থেকে। বহুদিন থেকেই জায়গাটা মুগ্ধ করে আসছে ইকথিয়ান্ডরকে। কিন্তু সেখানে গুছিয়ে বসতে পারার আগে দরকার সেখানকার পুরনো বাসিন্দাদের, অসংখ্য অক্টোপাসগুলোকে তাড়ানো।

চশমা পরল ইকথিয়ান্ডর, লম্বা ধারালো, ঈষৎ বাঁকা ছোরাটা নিয়ে সে নির্ভয়ে সাঁতরে গেল সেখানে। গুহার ভেতরে ঢোকা বিপজ্জনক, ইকথিয়ান্ডর ঠিক করল শত্রুকে সে বাইরে টেনে আনবে। ডুবো একটা নৌকোর কাছে লম্বা হারপুন দেখেছিল সে আগে। সেটিকে হাতে নিয়ে গুহামুখের কাছে দাঁড়ালো সে, হারপুন দিয়ে খোঁচাতে লাগল ভেতরে। অচেনা এই জিনিসটার হামলায় রেগে গিয়ে কিলবিল করে উঠল অক্টোপাসগুলো। খিলানটার কিনার ঘেঁষে দেখা দিল লম্বা পাক খাওয়া শুঁড়। সন্তর্পণে তারা এগুতে লাগল হারপুনটার দিকে। কিন্তু ভালো করে তা ধরবার আগেই ইকথিয়ান্ডর তা টেনে আনছিল। খেলাটা চলল বেশ কয়েক মিনিট। শেষ পর্যন্ত খিলানের কিনারায় দেখা দিল ডজনখানেক শুঁড় যেন সর্পকেশী গর্গনের জটা। এই সময় প্রকাণ্ড এক বুড়ো অক্টোপাস উত্ত্যক্ত হয়ে ঠিক করলে বেআদব হানাদারকে একটু শিক্ষা দেবে। শুঁড় নাড়াতে নাড়াতে কোটর থেকে বেরিয়ে এল ওটা। ইকথিয়ান্ডরকে ভয় দেখাবার জন্য রঙ বদলাতে বদলাতে সাঁতরে আসতে লাগল ধীরে ধীরে। পাশে সরে গেল ইকথিয়ান্ডর, হারপুনটা ফেলে দিয়ে তৈরি হল লড়াইয়ের জন্য। ইকথিয়ান্ডর জানত লড়াইটা কঠিন, মানুষের দুটো হাত, ওদের আটটা পা। একটাকে কাটতে না কাটতেই বাকি সাতটা এসে লোকের হাত বেঁধে ফেলবে। ইকথিয়ান্ডর তাই ছোরা তাক করল জন্তুটার দেহে। ইকথিয়াণ্ডর অক্টোপাসটাকে একেবারে কাছে আসতে দিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে সর্পিল শুঁড়গুলোর ঠিক জটটার ওপর, তার মাথায়।

অপ্রত্যাশিত এই চালে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল অকটোপাসটা। শুঁড়ের ডগা গুটিয়ে এনে শত্রুকে জড়িয়ে ধরতে তার লাগল অন্তত চার সেকেন্ড। তার মধ্যেই ইকথিয়ান্ডর নির্ভুল ক্ষিপ্র আঘাতে বিদীর্ণ করে দিলে তার দেহ, কেটে ফেললে তার মোটর-স্নায়ু। প্রকাণ্ড শুঁড়গুলো তার শরীরের কাছে পাক খেতে খেতে হঠাৎ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল।

'একটা সাবাড়!'

ফের হারপুনটা নিল ইকথিয়ান্ডর। এবার তার দিকে এগিয়ে এল একসঙ্গেই দুটো অক্টোপাস। একটা সাঁতরে এল সোজাসুজি, অন্যটা পাক দিয়ে চেষ্টা করল পেছন থেকে হানা দিতে। বিপজ্জনক অবস্থা। ইকথিয়ান্ডর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল তার সামনের অক্টোপাসটার ওপর। কিন্তু সেটাকে ঘায়েল করার আগেই পেছনকার অক্টোপাসটা এসে জড়িয়ে ধরল তার গলা। চট করে একেবারে ঘাড়ের কাছেই ছুরি চালিয়ে তার ঠ্যাঙটা কেটেই ঘুরে দাঁড়াল ইকথিয়ান্ডর, অন্য শুঁড়গুলোও কাটতে লাগল। অঙ্গহীন জন্তুটা যখন শেষ পর্যন্ত তলাতে লাগল, তখন সামনের অক্টোপাসটাকে খতম করলে ইকথিয়ান্ডর।

'তিনটে'—মনে মনে গুণলে ইকথিয়ান্ডর।

তবে আপাতত স্থগিত রাখতে হল লড়াইটা। গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল পুরো এক পাল অক্টোপাস, কিন্তু প্রথম তিনটের রক্তে জল ঘোলা হয়ে উঠেছিল। এই বাদামি কুয়াশায় অবস্থাটা তার প্রতিকূলে যেতে পারে, কেননা অক্টোপাসগুলোর পক্ষে আন্দাজে তাকে ধরে ফেলা সম্ভব, অথচ ইকথিয়ান্ডর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। রণক্ষেত্র থেকে একটু দূরে সাঁতরে গেল সে, জল এখানে পরিষ্কার। রক্তের মেঘ থেকে ছিটকে আসা একটা অক্টোপাসকে সে এখানে ঘায়েল করল।

মাঝে মাঝে বিরতি সমেত লড়াই চলল ঘণ্টা কয়েক ধরে।

শেষ অক্টোপাসটি মারা পড়ার পর জল যখন পরিষ্কার হয়ে উঠল, দেখা গেল তলে জমে উঠেছে অক্টোপাসগুলোর লাশ, কাটা শুঁড়গুলো তখনো নড়ছে। গহ্বরে ঢুকল ইকথিয়ান্ডর। ছোটো ছোটো কয়েকটা অক্টোপাস তখনো সেখানে ছিল, আকারে মুঠোর মতো, শুঁড়গুলো আঙুলের চেয়ে মোটা নয়। ইকথিয়ান্ডর ওগুলোকেও শেষ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেমন মায়া হল। ভাবলে, 'পোষ মানালে কেমন হয়, এ রকম চৌকিদার পেলে মন্দ হবে না।'

গহ্বরটা পরিষ্কার করে আসবাবের ব্যবস্থা করতে লাগল ইকথিয়ান্ডর। নিচের বাড়ি থেকে সে টেনে আনল লোহার পায়া লাগানো শ্বেত পাথরের একটা টেবিল আর দুটি চীনা টব। টেবিলটা রাখল গুহার মাঝখানে, তার ওপর টব, টবে মাটি দিয়ে দিয়ে তাতে পুঁতলে সামুদ্রিক ফুলগাছ। মাটি প্রথমে জলে ধুয়ে গিয়ে ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকাল, কিন্তু পরে জল পরিষ্কার হয়ে গেল। শুধু হালকা ঢেউয়েই সামান্য কাঁপতে থাকল ফুলগাছগুলো।

গুহার ভেতরের গা থেকে খানিকটা ধাপের মতো বেরিয়ে এসেছিল, যেন স্বাভাবিক একটা পাথুরে বেঞ্চি। নতুন গৃহস্বামী সানন্দেই তাতে গড়িয়ে নিল। বেঞ্চিটা পাথরের হলেও জলের তলে হওয়ায় শরীরে প্রায় তার ছোঁয়াই লাগল না।

টেবিলের ওপর চীনা টব সমেত বিচিত্র এই জলতলের কক্ষে গৃহপ্রবেশ দেখতে মাছ জুটল অনেক। টেবিলের পায়াগুলোর মধ্যে ঘোরাঘুরি করল, ভেসে গেল টবের ফুলগুলোর কাছে, যেন-বা গন্ধ শুঁকে দেখতে, ঢুকে পড়ল এমনকি ইকথিয়ান্ডরের হাত আর মাথার ফাঁকে। ছোট একটা টিপ-কপালে মাছ গুহায় উঁকি দিয়েই চাকার মতো লেজ নেড়ে পালিয়ে গেল।

সাদা বালির ওপর দিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে এল একটা মস্ত কাঁকড়া, একটা দাঁড়া তুলে ফের নামিয়ে নিল, যেন সেলাম জানাল কর্তাকে, তারপর গুটিয়ে ঠাঁই করে নিল টেবিলের তলে।

বেশ মজা লাগছিল ইকথিয়ান্ডরের : 'কী দিয়ে ঘরখানা আরো সাজানো যায়? ভাবল সে। 'ঠিক দরজার মুখেই বসাব সবচেয়ে সুন্দর জলজ উদ্ভিদ, মেঝেটায় মুক্তো বিছিয়ে দেব, আর দেয়ালের কাছে ধারগুলোয় থাকবে শঙ্খ। গুত্তিয়েরে যদি আমার এই ঘরখানা দেখতে পেত...না, আমায় সে ছলনা করেছে। কিংবা হয়তো সত্যিই ছলনা নয়। অল্‌সেনের কথাটা তো সে আমায় বলে ওঠার ফুরসত পায় নি।' ভুরু কোঁচকাল ইকথিয়ান্ডর। কোনো একটা কাজ নিয়ে মেতে থাকার পালা ফুরোতেই ফের ওর নিজেকে মনে হল নিঃসঙ্গ, অন্য সবার থেকে খাপছাড়া। 'কেন কেউ জলের নিচে থাকতে পারে না? কেন শুধু একা আমি? তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন বাবা। জিজ্ঞেস করব তাঁকে।'

তার ইচ্ছে হল, নিজের জলতলের ঘরখানি অন্তত একজন জীবন্ত প্রাণী দেখুক। মনে হল লিডিঙ ডলফিনটার কথা। পথঃমুখী শাঁখ নিয়ে ইকথিয়ান্ডর উঠে গেল জলের ওপরে, ফুঁ দিল শাঁখে। অচিরেই পরিচিত ঘোৎঘোৎ শোনা গেল। ডলফিনটা বরাবরই খাঁড়ির আশপাশেই থাকত।

ডলফিনটা কাছে আসতেই ইকথিয়ান্ডর তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বলল :

'চল যাই লিডিঙ, আমার নতুন ঘর দেখাব তোকে। টেবিল কি চীনা টব তুই তো কখনো দেখিস নি।'

জলে ডুব দিলে ইকথিয়ান্ডর, ডলফিন তার পিছু নিল।

তবে অভ্যাগতটি দেখা গেল বড়োই অস্থির। প্রকাণ্ড জরদ্গব দেহে সে গুহার মধ্যে এমন ঢেউ তুলল যে টেবিলের ওপর টলতে লাগল টবদুটো। তদুপরি দিব্যি মুখ দিয়ে টেবিলের পায়ায় গুঁতো মেরে সেটাকে উলটে দেবার কেরামতি দেখাল। ডাঙায় হলে টব উল্টে পড়ে ভেঙে চুর হত। জলের তলে হওয়ায় তেমন সর্বনাশ কিছু হল না, শুধু কাঁকড়াটা অসাধারণ চটপট পাশকে ভঙ্গিতে পালিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে।

'কী তুই আনাড়ি!' টব তুলে টেবিলটা আরো ভেতর দিকে বসাতে লাগল ইকথিয়ান্ডর। বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে সে বলতে লাগল :

'এখানে আমার সঙ্গে থাক লিডিঙ।'

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই লিডিঙ মাথা ঝাঁকিয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। জলের তলে বেশিক্ষণ সে টিকতে পারে না। বাতাস তার দরকার। পাখনা ছড়িয়ে ডলফিন গুহা থেকে বেরিয়ে ভেসে গেল ওপরে।

'এমনকি লিডিঙও আমার সঙ্গে জলের তলে থাকতে পারে না'—একা একা বিষণ্ণ মনে ভাবলে ইকথিয়ান্ডর, 'শুধু মাছ, কিন্তু ওগুলো যে বোকা আর ভীতু...' নিজের পাথরের শয্যাটিতে সে দেহ রাখল। সূর্য ডুবে গেছে। গুহাটা অন্ধকার। জলের হালকা দোলায় ঝিমুতে লাগল ইকথিয়ান্ডর।

সারা দিনের উত্তেজনা আর কাজের ক্লান্তির পর ঘুম নেমে এল তার দুই চোখে।

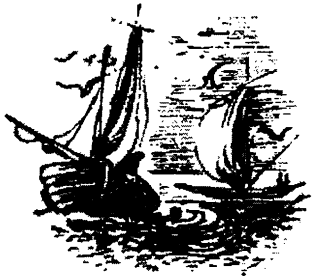

নতুন বন্ধু

বড়ো একটা লঞ্চে বসে রেলিং দিয়ে জলের দিকে তাকিয়েছিল অল্‌সেন। দিগন্ত থেকে সবে সূর্য মাথা তুলেছে, তার বাঁকা রোদে ছোটো খাঁড়িটার তল পর্যন্ত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে জল। জন কয়েক রেড-ইন্ডিয়ান তার সাদা বালুময় তলদেশে সন্ধান চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে দম নেবার জন্য, ফের ডুব দিচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অল্‌সেন লক্ষ করছিল ডুবুরিদের। 'অত সকালেও বেশ গরম। আমিও একটু তাজা হয়ে নিই, বার কয়েক ডুব দেয়া যাক'—ভাবল সে। চটপট পোশাক খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ডুবুরির কাজ অল্‌সেন আগে কখনো করে নি, কিন্তু দেখা গেল যে অভ্যস্ত রেড-ইন্ডিয়ানদের চেয়ে সে জলের তলে থাকতে পারে বেশিক্ষণ। তাই ডুবুরিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নতুন এই পেশাটায় সে মেতে উঠল।

তৃতীয় বার ডুব দিয়ে ওর চোখে পড়ল দু'জন রেড-ইন্ডিয়ান হাঁটু গেড়ে কাজ করছে তলদেশে, হঠাৎ তারা লাফিয়ে এমন তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে লাগল যে মনে হবে বুঝি হাঙর বা করাত মাছ তাদের তাড়া করেছে। পেছনে ফিরে দেখল অলসেন। তার দিকে দ্রুত সাঁতরে আসছে এক অদ্ভুত জীব—'আধা-মানুষ, আধা-ব্যাঙ, গায়ে রুপোলি আঁশ, প্রকাণ্ড দুই টিপ চোখ, ব্যাঙের মতো থাবা। ব্যাঙের মতোই সে জল কেটে সজোরে এগিয়ে আসছে।

অলসেন হাঁটু ছেড়ে উঠতে না উঠতেই জীবটা তার ব্যাঙের থাবা দিয়ে ওর হাত ধরল। প্রচণ্ড ভয় পেলেও অল্‌সেনের নজরে পড়ল জীবটার মুখখানা মানুষের মতো, সুন্দর, শুধু টিপটিপ জ্বলজ্বলে চোখদুটোয় সে সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে। বিচিত্র এ জীবটির কিন্তু খেয়ালই ছিল না যে সে জলের তলে, কী যেন সে বলতে শুরু করল। কথাগুলো অল্‌সেনের কানে এল না, শুধু দেখতে পেল যে ঠোঁট নড়ছে। দুই থাবায় অল্‌সেনের হাত শক্ত করে চেপে ধরেছিল প্রাণীটা। পায়ের প্রবল ধাক্কায় অল্‌সেন ওপরে উঠতে লাগল তার খালি হাতটার সাহায্যে। জীবটা কিন্তু তাকে ছাড়ল না, সে-ও উঠতে লাগল তার হাতটা ধরে রেখেই। উপরে ভেসে উঠে অল্‌সেন লঞ্চের রেলিং চেপে ধরল, তারপর পা গুটিয়ে কোনোক্রমে লঞ্চে উঠে এমন ঝাঁকুনি দিয়ে জীবটাকে ছুড়ে ফেললে যে সশব্দে তা জলে গিয়ে পড়ল। লঞ্চে যে রেড-ইন্ডিয়ানগুলো ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগল তীরের দিকে।

ইকথিয়াস্তর কিন্তু ফের লঞ্চটার কাছে এসে স্প্যানিশ ভাষায় বলে উঠল : 'শুনুন অলসেন, আপনার সঙ্গে কথা আছে, গুস্তিয়েরে সম্পর্কে।'

জলের নিচে সাক্ষাৎকারটার মতো এ সম্ভাষণেও অল্‌সেন কম বিস্মিত হল না। লোকটা যে সাহসী, মাথাটাও সুস্থির। অজানা এ প্রাণীটা যখন তার আর গুস্তিয়েরের নাম জানে, তখন ওটা মানুষ, পিশাচ হতে পারে না।

'বলুন, আমি শুনছি'—জবা দিল অল্‌সেন।

ইকথিয়াস্তর লঞ্চে উঠে পা গুটিয়ে বুকের ওপর হাত জড়ো করে গলুইয়ের কাছে বসল।

'চোখ নয়, চশমা!' অজানা জীবনটার জ্বলজ্বলে টিপ চোখদুটো খুঁটিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত টানল অল্‌সেন।

'আমার নাম ইকথিয়াস্তর। একবার আপনাদের মুক্তোমালা খুঁজে দিয়েছিলাম সমুদ্র থেকে।'

'কিন্তু তখন আপনার চোখহাত ছিল মানুষের মতো।'

ইকথিয়াস্তর হেসে তার ব্যাঙের থাবা নাচাল। সংক্ষেপে বলল :

'খুলে ফেলা যায়।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

তীরের পাহাড়গুলোর পেছন থেকে রেড-ইন্ডিয়ানরা এই অদ্ভুত আলাপ শোনার জন্য কৌতূহলে কান পেতে ছিল, যদিও কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না।

'আপনি গুত্তিয়েরেকে ভালোবাসেন?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল ইকথিয়াস্তর।

'হ্যাঁ, ওকে ভালোবাসি।'—সহজ গলায় বলল অল্‌সেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল ইকথিয়াস্তর।

'আর উনি আপনাকে ভালোবাসেন?'

'হ্যাঁ, ও-ও আমায় ভালোবাসে।'

'কিন্তু উনি যে আমায় ভালোবাসেন?'

'সেটা ওঁর নিজের ব্যাপার'—কাঁধ ঝাঁকাল অল্‌সেন।

'ওঁর ব্যাপার মানে? উনি তো আপনার বাগদত্তা।'

অল্‌সেনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, কিন্তু আগের মতোই শান্ত গলায় বলল :

'না, আমার বাগদত্তা নয়।'

'মিছে কথা বলছেন!' ফুঁসে উঠল ইকথিয়াস্তর, 'ঘোড়ায় চাপা ময়লাটে রঙের একটা লোককে আমি নিজে বলতে শুনেছি যে উনি বাগদত্তা কনে।'

'আমার বাগদত্তা?'

থতমত খেল ইকথিয়াস্তর। না, ময়লাটে লোকটা এ কথা বলে নি যে গুত্তিয়েরে অল্‌সেনের বাগদত্তা। কিন্তু তরুণী একটি মেয়ে ওই ময়লাটেটা, অমন বিছ্‌ছিরি বর্বরীয়ান লোকটার বাগদত্তা, সে কি হতে পারে? ও লোকটা নিশ্চয় গুত্তিয়েরের আত্মীয়। ইকথিয়াস্তর ঠিক করল জেরা চালাবে ঘুর পথে।

'কিন্তু আপনি এখানে কী করছিলেন? মুক্তো খুঁজছিলেন?'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার জেরাগুলো আমার ভালো লাগছে না'—গোমড়া মুখে বললে অল্‌সেন, 'গুত্তিয়েরের কাছ থেকে আপনার কথা কিছু না শোনা থাকলে আপনাকে লঞ্চ থেকে ছুড়ে ফেলে আলাপ শেষ করে দিতাম। ছোরাটা রাখুন। আপনি ওঠার আগেই দাঁড়ের এক ঘায়ে আপনার মাথা গুঁড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু আপনার কাছে লুকোবার প্রয়োজন দেখছি না, সত্যিই আমি মুক্তো খুঁজছিলাম এখানে।'

'মস্ত একটা মুক্তো, যা আমি সমুদ্রে ছুড়ে দিয়েছিলাম? গুত্তিয়েরে আপনাকে সে কথা বলেছেন।'

মাথা নাড়ালে অল্‌সেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ইকথিয়াস্তর।

'এই দেখুন। আমি তো ওঁকে বলেইছিলাম যে ও মুক্তোটা নিতে আপনি আপত্তি করবেন না। বললাম, মুক্তোটা নিয়ে আপনাকে দিতে। উনি রাজি হলেন না, এখন নিজেই আপনি এটা খুঁজছেন।'

'বটেই তো, কেননা ওটা এখন আর আপনার সম্পত্তি নয়, সমুদ্রের। আমি যদি ওটা পাই, কারো কাছে বাধ্যবাধকতা থাকবে না।'

'আপনি মুক্তো এত ভালোবাসেন।'

'আমি তো আর মেয়ে নই যে অকেজো জিনিস গলায় পরব'—আপত্তি করল অল্‌সেন।

'কিন্তু মুক্তো তো... সেই যে কী বলে, হ্যাঁ, বিক্রি হয়'—চেষ্টা করে দুর্বোধ্য কথাটা মনে করতে হল ইকথিয়াণ্ডরকে, 'টাকাও পাওয়া যায়।'

অল্‌সেন ফের সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

'তার মানে আপনি টাকা ভালোবাসেন?'

'সত্যি আপনি কী চান বলুন, তো?' বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করল অল্‌সেন।

'জানতে চাই গুত্তিয়েরে আপনাকে মুক্তো দেন কেন। আপনি তো ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তাই না?'

'না, গুত্তিয়েরেকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার'—বলল অল্‌সেন, 'আর সে ইচ্ছে যদি-বা থাকত, এখন সে কথা ভাবার মানে হয় না। গুত্তিয়েরে এখন অন্য লোকের বৌ।'

ফ্যাকাসে হয়ে ইকথিয়াণ্ডর হাত চেপে ধরল অল্‌সেনের।

'ওই ময়লাটাকে?' সশঙ্কে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, পেদ্রো জুরিতাকে সে বিয়ে করেছে।'

'কিন্তু উনি যে...আমার মনে হয় উনি যে আমায় ভালোবাসতেন'—আস্তে করে বলল ইকথিয়াণ্ডর।

দরদভরেই অল্‌সেন চাইল তার দিকে। ধীরেসুস্থে তার বেঁটে পাইপটায় টান দিয়ে সে বলল :

'হ্যাঁ, আমারও ধারণা ও আপনাকে ভালোবাসত। কিন্তু আপনি তো ওর চোখের সামনেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে যান, অন্তত সে তাই ভেবেছিল।'

অবাক হয়ে ইকথিয়াণ্ডর চাইল অলসেনের দিকে। গুত্তিয়েরেকে সে কখনো বলেনি যে সে জলে ডুবে থাকতে পারে। ঘুর্ণাক্ষরেও তার মনে হয় নি যে পাহাড় থেকে তার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়াটাকে গুত্তিয়েরে ভাববে আত্মহত্যা।

'কাল রাতে গুত্তিয়েরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল'—বলল অল্‌সেন, 'ভারি মনস্তাপে আছে। বলল, 'ইকথিয়াণ্ডরের মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী'।'

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উনি বিয়ে করে বসলেন কেন? উনি যে...আমিই তো ওঁর জীবন বাঁচিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক দিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যে-মেয়েটি একবার সমুদ্রে ডুবছিল, সেই গুত্তিয়েরে। আমি তাকে তীরে নিয়ে এসে পাথরের আড়ালে লুকিয়েছিলাম। তারপর আসে ওই ময়লাটেটা,—দেখেই ওকে আমি চিনেছি—গুত্তিয়েরেকে বোঝায় যে সেই নাকি ওঁকে বাঁচিয়েছে।'

'গুত্তিয়েরে আমায় ঘটনাটা বলেছিল'—বলল অল্‌সেন, 'ও কখনো ঠিক করে উঠতে পারে নি কে ওকে বাঁচায়—জুরিতা, নাকি অদ্ভুত এক জীব, জ্ঞান ফিরে তাকে সে দেখেছিল মাত্র এক ঝলক। আপনিই বাঁচিয়েছেন সে কথা ওকে বললেন না কেন?'

'নিজে যেচে বলা ভালো দেখায় না। তাছাড়া জুরিতাকে ফের না দেখা পর্যন্ত আমি তো পুরো নিশ্চিত হতে পারি নি যে গুত্তিয়েরেকেই বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু উনি রাজি হতে পারলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করল ইকথিয়াণ্ডর।

'কী করে যে ঘটল...' ধীরে ধীরে বলল অল্‌সেন, 'সেটা নিজেই আমি বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যা জানেন একটু বলুন-না'—মিনতি করল ইকথিয়াস্তর।

'আমি বোতাম কারখানায় কাজ করি, ঝিনুক যাচাই করে নিই। সেখানেই আলাপ হয় গুত্তিয়েরের সঙ্গে। কারখানার জন্যে ঝিনুক আনত সে, বাপ ব্যস্ত থাকলে ওকেই পাঠাত। আলাপ হয়, বন্ধুত্ব হয়। মাঝে মাঝে দেখা করতাম বন্দরে, সমুদ্রতীরে বেড়াতাম। নিজের দুঃখের কথা সে বলত : ধনী এক স্পেনিয়ার্ড তাকে বিয়ে করতে চাইছে।'

'ওই জুরিতা?'

'হ্যাঁ, জুরিতা। গুত্তিয়েরের বাবা রেড-ইন্ডিয়ান বালতাজার, এ বিয়েটা সে খুব চাইছিল, নানাভাবে মেয়েকে বোঝাত যাতে অমন সুপাত্রকে না ফেরায়।'

'কিসের সুপাত্র? বুড়ো বিছছিরি, গায়ে জঘন্য গন্ধ'—নিজেকে সংযত রাখতে পারল না ইকথিয়াস্তর।

'বালতাজারের কাছে জুরিতা জামাই হিশেবে অতি চমৎকার। তাছাড়া জুরিতার কাছে বালতাজার মস্ত একটা টাকা ধারে। গুত্তিয়েরে বিয়ে করতে আপত্তি করলে জুরিতা ওর সর্বনাশ ঘটাতে পারত। মেয়েটির কীভাবে দিন কেটেছে ভেবে দেখুন। একদিকে জুরিতার অসহ্য প্রণয় নিবেদন, অন্যদিকে বাপের অবিরাম গঞ্জনা, ধমক, হুমকি...'

'জুরিতাকে গুত্তিয়েরে তাড়িয়ে দিল না কেন? আর এত বলবান লোক আপনি, আপনিই-বা ওকে কেন পিটুনি দিলেন না?'

হাসল অল্‌সেন, অবাক হল : বোকা নয় ইকথিয়াস্তর, অথচ এইসব প্রশ্ন করে। কোথায় ও মানুষ হয়েছে? বলল :

'যা ভাবছেন ব্যাপারটা অমন সোজা নয়। জুরিতা আর বালতাজারের পক্ষে দাঁড়াত আইন, পুলিশ, আদালত।' ইকথিয়াস্তর কিন্তু কিছুই বুঝল না। 'মোট কথা, ও সবকিছু করা যেত না।'

'তাহলে গুত্তিয়েরে নিজে পালিয়ে গেল না কেন?'

'সেটা সহজ ছিল। পালিয়ে যাবে বলেই ঠিক করেছিল, আমিও কথা দিয়েছিলাম ওকে সাহায্য করব : আমি নিজেই অনেক দিন থেকে বুয়েনাস-আইরেস থেকে উত্তর আমেরিকায় চলে যাবার কথা ভাবছিলাম। আমার সঙ্গে যেতে বলি গুত্তিয়েরেকে।'

'আপনি ওঁকে বিয়ে করতে চাইছিলেন?' জিজ্ঞেস করল ইকথিয়াস্তর।

'আপনি কী লোক বলুন, তো?' ফের হেসে ফেলল অল্‌সেন, 'আগেই তো বলেছি আমরা বন্ধু। পরে কী হতে পারত তা জানি না।'

'তাহলে গেলেন না কেন?'

'কারণ যাবার মতো টাকা ছিল না!'

'হরোক্স' জাহাজে টিকিটের দাম কি এতই বেশি?'

'হরোক্স'! 'হরোক্স'-এ যায় লাখপতিরা! সত্যি কী লোক আপনি ইকথিয়াস্তর, চাঁদ থেকে নেমে এলেন নাকি?'

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেল ইকথিয়াস্তর, লাল হয়ে উঠল। ঠিক করল এমন প্রশ্ন সে আর করবে না যাতে অল্‌সেন ভাববে যে সহজ জিনিসগুলোও সে জানে না।

'মাল ও যাত্রী বওয়া জাহাজে পাড়ি দেবার মতো টাকাও আমাদের ছিল না। গেলেও খরচাপাতি আছে। হাত বাড়ালেই তো আর চাকরি মেলে না।'

ফের প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল ইকথিয়াস্তর, কিন্তু সংযত হল।

'গুত্তিয়েরে তখন তার মুক্তোর মালা বেচবে ঠিক করে।'

'ইস, আমি যদি ব্যাপারটা জানতাম!' নিজের জলতলের রতন ভাণ্ডারের কথা মনে হতেই চেঁচিয়ে উঠল ইকথিয়াণ্ডর।

'কী জানতেন?'

'ও কিছু না...আপনি বলে যান।'

'পালাবার সব আয়োজন তৈরি হয়ে গিয়েছিল।'

'আর আমি?' সে কী? মাপ করবেন...মানে গুত্তিয়েরে কি আমাকে ফেলেই চলে যেতে চাইছিলেন?'

'এসব ঠিক হয়েছিল যখন আপনার সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। তারপর যতদূর আমি জানি, আপনাকে সে জানাতে চেয়েছিল। হয়তো একসঙ্গে পালাবার প্রস্তাবটা দিত। সে কথা আপনাকে বলতে না পারলে অন্তত জাহাজে থেকে চিঠি লিখত।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে কেন? আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, আপনার সঙ্গেই পালাবেন ঠিক করেছেন; কেন আমার সঙ্গে নয়?'

'আমি যে ওকে চিনি এক বছরেরও ওপর; আর আপনাকে...'

'ঠিক আছে, বলে যান। আমার কথায় কান দেবেন না।'

'তাহলে শুনুন, সবই তৈরি হয়ে গিয়েছিল'—বলে চলল অল্‌সেন, 'কিন্তু আপনি গুত্তিয়েরের চোখের সামনে সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, আর দৈবাৎ আপনাদের দুজনকে একত্রে দেখতে পায় জুরিতা। কারখানা যাবার পথে ভোরে আমি গুত্তিয়েরের কাছে আসি। আগেও এ রকম প্রায়ই এসেছি। বালতাজার আমার ওপর খানকিটা প্রসন্নই ছিল। হয়তো আমার ঘুষিটাকে সে ভয়ের চোখে দেখত, হয়ত গুত্তিয়েরের একগুঁয়েমিতে জুরিতার বিরক্ত ধরে গেলে আমায় সে দ্বিতীয় পাত্র হিশেবে রাখছিল। মোটের ওপর বালতাজার আমাদের বাধা দিত না, শুধু অনুরোধ করেছিল যেন একসঙ্গে দু'জন জুরিতার চোখে না পড়ি। বলাই বাহুল্য, আমাদের আসল মতলব সম্পর্কে ও কোনো সন্দেহ করে নি। সেদিন সকালে গুত্তিয়েরেকে বলতে এসেছিলাম যে জাহাজের টিকিট কেটেছি, রাত দশটা নাগাদ সে যেন তৈরি থাকে। দেখা হল বালতাজারের সঙ্গে, দেখলাম খুব অস্থির। বলল 'গুত্তিয়েরে বাড়ি নেই, মানে আর কখনোই সে এখানে থাকবে না। আধ-ঘণ্টাখানেক আগে জুরিতা এসেছিল নতুন ঝকমকে একটা মোটরগাড়িতে। আহ্, কী সে গাড়ি! আমাদের পাড়ায় মোটরগাড়ি একটা ন'মাস-ছ'মাসের ব্যাপার, তাতে আবার সেটা যদি এসে থামে সোজা এইরকম একটি বাড়িতে। আমি আর গুত্তিয়েরে ছুটে বেরিয়ে এলাম। জুরিতা দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল, বলল, গুত্তিয়েরেকে সে বাজারে পৌঁছে দেবে আর নিয়ে আসবে। ও জানত যে গুত্তিয়েরে এই সময় রোজ বাজারে যায়। ঝকমকে গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখল গুত্তিয়েরে, বুঝতেই পারছ চেপে দেখার জন্যে অল্পবয়সী একটি মেয়ের তো লোভ হবে। কিন্তু ভারি ও চালাক, সন্দেহপ্রবণ। আপত্তি করে বসল। এ রকম বেয়াড়া মেয়ে দেখেছ কখনো!' সরোষে চেঁচিয়ে উঠল বালতাজার কিন্তু তারপরেই হো-হো করে হেসে উঠল। তবে জুরিতা ঘাবড়াবার পাত্র নয়। বলল, 'বুঝতে পারছি, লজ্জা হচ্ছে তো? তা আমিই সাহায্য করি।' বলে ওকে জোর করে গাড়িতে তোলে। শুধু একবার 'বাবা' বলে চেঁচাবার সুযোগ পেয়েছিল সে, তারপর উধাও। মনে হয় আর ফিরবে না, জুরিতা ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছে'—বলে কাহিনী শেষ করল বালতাজার, মনে হল ব্যাপারটায় সে খুবই খুশি। 'আপনার চোখের সামনে মেয়েকে হরণ করে নিল আর আপনি অমন নিশ্চিন্তে, এমনকি খুশি হয়েই সে কথা শোনাচ্ছেন?' বিরক্ত হয়ে বললাম বালতাজারকে। 'অস্থির হবার কী আছে?' অবাক হল বালতাজার, 'অন্য কেউ হলে নয়

কথা ছিল। কিন্তু জুরিতাকে আমি অনেক দিন থেকে জানি। ওর মতো কঞ্জুস যখন গাড়ি কিনতে টাকার পরোয়া করে নি, তখন গুস্তিয়েরেকে খুবই ভালোবাসে। নিয়ে যখন গেছে তখন বিয়ে করবে। মেয়েটারও শিক্ষা হল : গোঁয়ার্তুমি করতে নেই। ধনী পাত্র তো আর পথেঘাটে মেলে না। কাঁদবার ওর কিছু নেই। পারানা শহরে থেকে কিছু দূরে জুরিতার 'দলোরেস' মহাল-বাড়ি আছে। ওর মা থাকে সেখানে। ওখানেই গুস্তিয়েরেকে সে নিয়ে গেছে নিশ্চয়।'

'আর বালতাজারকে পিটুনি দিলেন না আপনি?' জিজ্ঞেস করল ইকথিয়াস্তর। 'আপনার কথা অনুসারে আমার কেবল মারপিট করে বেড়ানোই উচিত'—বলল অল্‌সেন, 'অবিশ্যি স্বীকার করছি যে তখন বালতাজারকে ঘুষি মারারই ইচ্ছে হয়েছিল আমার। কিন্তু ভেবে দেখলাম তাতে ব্যাপারটা পণ্ডই হবে। মনে হল এখনো হয়তো উপায় আছে...যাক খুঁটিনাটি বাড়িয়ে লাভ নেই, আগেই তো বলেছি গুস্তিয়েরের সঙ্গে আমার দেখা হয়।'

'দলোরেস' মহাল-বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'আর আপনি ওই পাষণ্ড জুরিতাটাকে খুন করলেন না, মুক্ত করলেন না গুস্তিয়েরেকে?'

'ফের ওই মারপিট আর খুন। কে ভাবতে পেরেছিল যে আপনি এমন রক্ত-লোলুপ?'

'রক্ত-লোলুপ আমি নই'—সজল চোখে বলল ইকথিয়াস্তর, কিন্তু এ যে অসহ্য!'

ইকথিয়াস্তরের ওপর মায়া হল অল্‌সেনের।

বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন ইকথিয়াস্তর। জুরিতা আর বালতাজার খারাপ লোক। ওদের ওপর রাগ আর ঘৃণাই হয়। পিটুনি দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু যা ভাবেন বলে মনে হচ্ছে, জীবন তার চেয়ে জটিল। গুস্তিয়েরে নিজেই পালিয়ে যেতে আপত্তি করল।'

'নিজে?' বিশ্বাস হল না ইকথিয়াস্তরের।

'হ্যাঁ, নিজে।'

'কেন?'

'প্রথমত ওর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে আপনি ওর জন্যেই ডুবে মরেছেন। আপনার মৃত্যুতে ও দগ্ধে মরছে। বেচারি, বোঝা যায় আপনাকে খুবই ভালোবেসেছিল। আমায় বলে, 'এখন আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে, অল্‌সেন। কিছুই আমার এখন চাই না। সবেতেই আমি উদাসীন। জুরিতার ডাকা পাদ্রি আমাদের বিয়ে দিল, কিছুই আমি বুঝলাম না। আঙুলে বিয়ের আংটিটা পরাবার সময় পাদ্রি বলল, 'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে।' আর ঈশ্বর যাদের মিলিয়েছেন, মানুষের উচিত নয় সে জোড় ভাঙা। জুরিতার কাছ থেকে আমি সুখ পাব না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনতে আমি ভয়ই পাই, তাই ত্যাগ করব না ওকে।'

'কিন্তু এ যে বোকামি! কিসের ঈশ্বর? বাবা বলেন, ওটা ছেলে-ভুলানো গল্প'—উত্তেজিত হয়ে উঠল ইকথিয়াস্তর, 'আপনি ওকে বোঝাতে পারলেন না।'

'দুঃখের বিষয়, ও গল্পটা গুস্তিয়েরে বিশ্বাস করে। মিশনারিরা ওকে উগ্র ক্যাথলিক বানিয়ে তুলেছে। অনেক চেষ্টা করেছি ওর বিশ্বাস ঘোচাতে পারি নি। গির্জা কি ঈশ্বরের কথা তুললে আমার সঙ্গে আর ভাব রাখবে না বলে শাসিয়েও ছিল। অগত্যা সবুর করতে হয়। আর মহাল-বাড়িতে তো আবার বোঝাবার মতো সময়ও তেমন ছিল না। শুধু কয়েকটা কথা হতে পেরেছিল। হ্যাঁ, আরেকটা কথাও সে আমায় বলেছিল। গুস্তিয়েরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পর জুরিতা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'একটা কাজ হল। পাখিটিকে ধরে খাঁচায় পোরা গেছে। এখন মাছটি ধরাই বাকি!' মাছটি কে সে কথা বলে গুস্তিয়েরেকে, গুস্তিয়েরের আমায়। বুয়েনাস-আইরেসে জুরিতা আসছে 'দরিয়ার দানো' ধরার জন্যে। গুস্তিয়েরে তখন

হয়ে যাচ্ছে কোটিপতির বউ। আপনি সেই 'দানো' নন তো? জলের তলে আপনি থাকতে পারেন অনায়াসে, ডুবুরিদের ভয় দেখান...'

সাবধান হয়ে গেল ইকথিয়াস্তর, নিজের রহস্যটা সে অল্‌সেনের কাছ ফাঁস করল না। করতে গেলেও সে ব্যাপারটা বোঝাতে পারত না। তাই উত্তর না দিয়ে নিজেই প্রশ্ন করল:

'কিন্তু 'দরিয়ার দানো'য় জুরিতার দরকার পড়ল কেন?'

'পেদ্রো চায় 'দানো'কে দিয়ে মুক্তা সংগ্রহ করাবে। আর আপনিই যদি 'দরিয়ার দানো' হন, তাহলে হুঁশিয়ার!'

'হুঁশিয়ারির জন্যে ধন্যবাদ'—বলল ইকথিয়াস্তর।

সে জানত না যে তার কীর্তিকলাপের কথা তীর বরাবর ছড়িয়েছে, কাগজপত্রে অনেক লেখালেখি হয়েছে তাকে নিয়ে।

'আমি পারব না'—হঠাৎ বলে উঠল ইকথিয়াস্তর, 'ওঁর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। অন্তত শেষ দেখা। পারানা শহর? হ্যাঁ, জানি। পারানা নদী উজিয়ে পৌঁছনো যায়। কিন্তু মহাল-বাড়ি যাবার পথ?'

অল্‌সেন পথটা বুঝিয়ে দিল।

সরোজে অল্‌সেনের হাত চেপে ধরল ইকথিয়াস্তর।

'মার্জনা করুন আমায়। আপনাকে ভেবেছিলাম শত্রু, হঠাৎ পেয়ে গেলাম বন্ধুকে। বিদায়। গুস্তিয়েরেকে খুঁজে বার করতে চললাম।'

'এক্ষুণি?' হেসে জিজ্ঞেস করল অল্‌সেন।

'হ্যাঁ, এক মিনিট নষ্ট করা চলবে না।' জলে ঝাঁপ দিয়ে তীরের দিকে সাঁতরাতে লাগল ইকথিয়াস্তর।

অল্‌সেন মাথা নাড়ল।

দ্বিতীয় অংশ

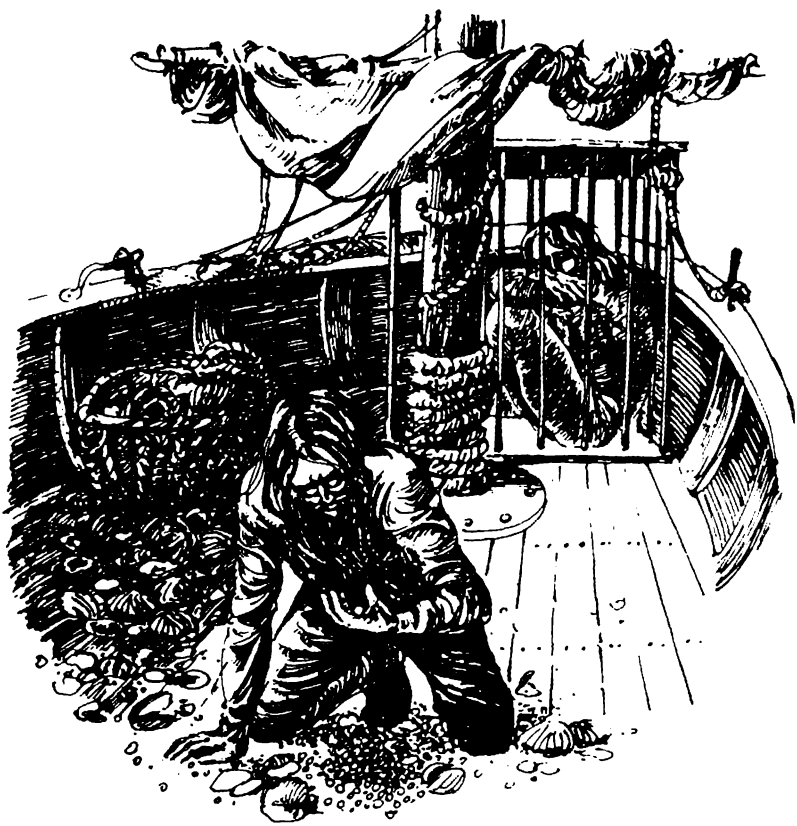

যাত্রাপথে

তাড়াতাড়ি যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে নিল ইকথিয়াণ্ডর। তীরে লুকনো স্যুট আর জুতো নিয়ে তা পিঠে বাঁধল ছোরা ঝোলাবার বেল্টটিতে। তারপর চশমা-দস্তানা পরে রওনা দিলে।

রিও-দে-লা-প্লাতা উপসাগরে জাহাজ স্টিমার লঞ্চ দাঁড়িয়েছিল অনেক। তাদের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েকটা ছোটো ছোটো স্টিমার। জলের তল থেকে তাদের তলাটা দেখাচ্ছিল এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ানো জলপোকার মতো। নোঙরের শেকলগুলো উঠে গেছে সামুদ্রিক উদ্ভিদের সরু সরু ডাঁটির মতো। তলাটা যত রকম আবর্জনা, ভাঙা লোহা-লক্কড়, পুড়ে যাওয়া কয়লার ছাই, গাদ, পুরনো হোস-পাইপ, পালের টুকরো, টিন, ইট, ভাঙা বোতল, খাবারের কৌটোয় ভরা। তীরের কাছাকাছি মরা কুকুর-বেড়ালেরও অভাব নেই।

জলের ওপরটা পেট্রলের পাতলা স্তরে ঢাকা। সূর্য তখনো ডোবে নি, কিন্তু এখানে ধূসর-সবুজ গোধূলি। পারানা নদী বেয়ে বালি আর পলি এসে পড়ছে, তাই উপসাগরের জল ঘোলা।

এই গোলকধাঁধায় ইকথিয়াণ্ডর সহজেই পথ ভুল করতে পারত, কিন্তু তার কম্পাসের কাজ করলে সমুদ্রে পড়া নদীটার লঘু জলস্রোত। আস্তাকুঁড়ের মতো দেখতে সমুদ্রতলটা সন্তর্পণে লক্ষ করে তার মনে হল, লোকে কী নোংরা, আশ্চর্য! সাঁতরাচ্ছিল সে উপসাগরের মাঝামাঝি, জাহাজগুলোর তল দিয়ে। নোংরা জলে নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল, গুমোট ঘরে সাধারণ লোকের যেমন হয়।

তলার কোনো কোনো জায়গায় তার চোখে পড়ছিল মানুষের শব, জন্তুর কঙ্কাল। একটা মৃতদেহের মাথার খুলি ভাঙা, গলায় পাথর-বাঁধা দড়ি। কারো একটা দুষ্কর্ম এখানে সমাধিস্থ রয়েছে। তাড়াতাড়ি এই বিষণ্ণ জায়গাটা পেরিয়ে যেতে চাইল ইকথিয়াণ্ডর।

কিন্তু যত উজিয়ে যেতে লাগল সে, ততই জোরালো হয়ে উঠল উল্টোমুখী প্রবাহটা। কঠিন হয়ে উঠল সাঁতরানো। মহাসাগরেও প্রবাহ থাকে, কিন্তু সেটায় তার সুবিধাই হয়, ভালো সে জানে তাদের। নাবিকরা যেমন হাওয়াকে কাজে লাগায়, সে-ও তেমনি অন্তঃস্রোতকে। এখানে স্রোতটা কেবল একমুখী। পাকা সাঁতারু ইকথিয়াণ্ডর, কিন্তু এত মন্থর গতিতে তার বিরক্ত লাগছিল। হঠাৎ খুব কাছেই কী একটা দ্রুত তার পাশ দিয়ে নেমে গেল, আরেকটু হলেই পিষে যেত সে। কোনো একটা জাহাজ থেকে ফেলা নোঙর ওটা। 'এখানে সাঁতরানো তেমন নিরাপদ নয়'—ভাবল ইকথিয়াণ্ডর, আশেপাশে চেয়ে দেখল, একটা বড়ো স্টিমার ছুটে আসছে।

আরো নিচে তলাল ইকথিয়াণ্ডর। স্টিমারের তলাটা যখন ঠিক তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে তখন সে গলুইয়ের তলাটা চেপে ধরল। ধরার মতো বস্তু ছিল কেবল লোহার ওপর এঁটে

থাকা গুগলির খড়খড়ে স্তূপগুলো। এ অবস্থায় থাকা তেমন আরামের নয়, কিন্তু এখন সে অন্তত একটা আড়ালের নিচে রইল, স্টিমারের টানে ভেসেও যাওয়া যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি।

ব-দ্বীপ শেষ হয়ে গেল, স্টিমার চলল পারানা নদী বেয়ে, নদীর জলে বিস্তর পলি। এই অলবণাক্ত জলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। হাতও অবশ হয়ে আসছিল, কিন্তু স্টিমারটা ছাড়তে চাইছিল না সে। 'কী আফসোস যে এ সফরে লিডিঙকে সঙ্গে নেওয়া গেল না!'—ভাবল সে। কিন্তু নদীতে ডলফিনটা মারা পড়তে পারত। সারা পথটা জলের তলে সাঁতরাতে পারত না লিডিঙ, নিশ্বাস নেয়ার জন্য ভেসে উঠতে হত, কিন্তু নদীর উপরিভাগে এত ভিড়াক্রান্ত জায়গায় তাদের দুজনের পক্ষেই হত বিপজ্জনক।

ক্রমেই অবশ হয়ে আসছিল ওর হাত। তার ওপর খিদেও পেয়েছিল খুব, সারা দিন কিছু পেটে পড়ে নি। তাই থামতেই হল। স্টিমার ছেড়ে দিয়ে সে নেমে এল তলে।

অন্ধকার হয়ে এল। পলি-ভরা তলাটা দেখল ইকথিয়ান্ডর। কিন্তু তার প্রিয় সামুদ্রিক মাছ বা ঝিনুক সে দেখতে পেল না। আশেপাশেই ছোটাছুটি করছিল অলবণাক্ত জলের মাছগুলো, কিন্তু তাদের চালচলন তার জানা ছিল না। মনে হল তারা সামুদ্রিক মাছের চেয়ে অনেক ধূর্ত, ধরা কঠিন। শুধু রাত হতে যখন ঘুমতে লাগল মাছগুলো, তখন মস্ত এক পাইক মাছ ধরতে পারল ইকথিয়ান্ডর। মাংসটা তার কড়া, কাদা-কাদা গন্ধ, তাহলে খিদের মুখে তৃপ্তির সঙ্গে সে তার কাঁটাকুটো সমেত গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

এবার বিশ্রাম নিতে হয়। হাঙর বা অক্টোপাসের ভয় না করে এ নদীতে দিব্যি ঘুম দেওয়া চলে। তবে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ঘুমের মধ্যে স্রোতের টানে ভাটিতে ভেসে না যায়। তলে কতকগুলো পাথর খুঁজে স্তূপাকৃতি করলে ইকথিয়ান্ডর, একটা পাথরকে হাত দিয়ে আঁকড়ে শুয়ে পড়ল।

তবে ঘুমোলে সে বেশিক্ষণ নয়। অচিরেই সে টের পেলে একটা স্টিমার আসছে। চোখ মেলতেই তার আলো চোখে পড়ল। আসছিল ওটা ভাঁটির দিক থেকে। চট করে উঠে সে ওটা আঁকড়ে ধরার জন্য তৈরি হল। তবে এটা ছিল একটা মোটরবোট, তলাটা একেবারে মসৃণ। ধরবার ব্যর্থ চেষ্টায় প্রায় প্রপেলারের মধ্যেই পড়ছিল সে।

কয়েকটা স্টিমার গেল ভাঁটির দিকে স্রোত বরাবর। শেষ পর্যন্ত উজানে যাওয়া একটা যাত্রী-স্টিমার আঁকড়ে ধরতে পারল সে।

এইভাবে পারানা শহর পর্যন্ত পৌঁছল ইকথিয়ান্ডর। শেষ হল যাত্রার প্রথম অংশ। কিন্তু যা বাকি রইল সেইটেই সবচেয়ে কঠিন—স্থলপথে যাত্রা।

খুব ভোরে ইকথিয়ান্ডর শহরের কোলাহলমুখর জেটি ছেড়ে সাঁতরে গেল একটা নির্জন জায়গায়, সন্তর্পণে চারদিকে চেয়ে দেখে তীরে উঠল। চশমা-দস্তানা খুলে পুঁতে রাখল নদী তীরের বালির মধ্যে, রোদ্দুরে পোশাক-জুতো শুকিয়ে নিয়ে পরল। দলা-মোচড়া পোশাকে ওকে দেখাচ্ছিল ভবঘুরের মতো, কিন্তু সে নিয়ে তার ভাবনা ছিল না।

অল্‌সেন যা বলেছিল, হাঁটতে লাগল সে নদীর ডান তীর ধরে, জেলেদের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছিল পেদ্রো জুরিতার 'দলোরেস' মহাল-বাড়িটা কোথায় ওরা জানে কিনা।

সবাই তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে মাথা নেড়ে চলে গেল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, গরম হয়ে উঠল অসহ্য, কিন্তু সন্ধান তার সফল হল না, ডাঙায় অজানা জায়গায় ইকথিয়ান্ডর রাস্তা ঠিক করতে পারছিল না। গরমে কাহিল হয়ে পড়ছিল সে, মাথা ঘুরছিল, কিছুর দিশা পাচ্ছি না।

তাজা হয়ে নেবার জন্য বার কয়েক পোশাক ছেড়ে ডুব দিয়ে নিল সে।

শেষ পর্যন্ত বেলা প্রায় চারটের সময় সৌভাগ্যক্রমে দেখা হল এক বুড়ো চাষির সঙ্গে, দেখে মনে হয় খেতমজুর। ইকথিয়াস্তরের কথা শুনে সে মাথা নেড়ে বলল :

'সোজা ওই মাঠের মধ্যেকার রাস্তা দিয়ে চলে যাও। বড়ো একটা পুকুর পড়বে। সাঁকো পেরোলে পাবে একটা টিলা। সেইখানে গুঁপো দলোরেসের দেখা পাবে।'

'গুঁপো কেন? 'দলোরেস' তো একটা মহাল-বাড়ি?'

'হ্যাঁ, মহাল-বাড়ি। তবে মহালের বুড়ি কর্ত্রীর নামও দলোরেস। উনি হলেন পেদ্রো জুরিতার মা, মোটাসোটা মোচওয়ালি বুড়ি। তবে ওখানে মজুরি খাটার কথা ভেবো না; জ্যান্ত গিলে খাবে একেবারে ডাইনি। শুনছি, অল্পবয়সী এক বৌ এনেছে জুরিতা। শাশুড়ির সঙ্গে ও টিকতে পারবে না' বলল গোপ্পে চাষিটা।

'শুত্তিয়েরে তাহলে'—ভাবল ইকথিয়াস্তর।

জিজ্ঞেস করল, 'কতদূর?'

'সন্ধে নাগাদ পৌঁছে যাবে'—সূর্যের দিকে চেয়ে বলল বুড়ো।

বুড়োকে ধন্যবাদ দিয়ে গম আর ভুট্টা খেতের পাশ দিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল ইকথিয়াস্তর। তাড়াতাড়ি হাঁটায় হয়রান হয়ে পড়ছিল সে। সাদা ফিতের মতো রাস্তাটার যেন শেষ নেই।

গম খেতের পর দেখা দিল ঘন লম্বা লম্বা ঘাসের চারণমাঠ, ভেড়ার পাল চরছে তাতে।

কাহিল হয়ে পড়ল ইকথিয়াস্তর, বেড়ে উঠল পাঁজরার ব্যথাটা। তেষ্টায় জিভ শুকিয়ে আসছে। কিন্তু এক বিন্দু জল নেই কোথাও। তাড়াতাড়ি একটা পুকুর পেলেও হয়। ভাবলে সে চোখ গাল তার বসে গেছে, কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। খিদেও পেয়েছে। কিন্তু কী সে খাবে এখানে? দূরের মাঠে রাখাল আর কুকুরের পাহারায় চরছে এক পাল ভেড়া। পাথরের দেয়ালের ওপর দিয়ে পাকা ফল-ভরা পিচ আর কমলালেবু গাছের ডাল দেখা যাচ্ছিল। কিছুই এখানে সমুদ্রের মতো নয়। সবই অন্য কারো সম্পত্তি, সবই এখানে বাটোয়ারা করা, বেড়া ঘেরা, পাহারা বসানো। শুধু আকাশের পাখিগুলোর মালিক নেই কেউ, উড়ছে তারা, কলরব করছে পথ জুড়ে। কিন্তু ধরা ওদের অসম্ভব। তাছাড়া আদৌ ধরা চলবে কি? হয়তো কারো না কারো সম্পত্তি। এত পুকুর-বাগিচা, পশু-পাল থাকতেও অনায়াসেই খিদে-তেষ্টায় প্রাণ হারাতে পারে এখানে।

ইকথিয়াস্তরের দিকে এগিয়ে আসছিল দু'হাত পেছনে করে মোটা মতো একটা লোক, মাথায় সাদা টুপি, পরনের ঝকঝকে বোতাম-ওয়ালা সাদা উর্দি, বেল্টে রিভলবারের খোপ।

'আচ্ছা, 'দলোরেস' মহাল-বাড়িটা কতদূর?' জিজ্ঞেস করলে ইকথিয়াস্তর।

মোটা লোকটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে।

'তাতে তোর খোঁজ কেন? কোত্থেকে আসছিস?'

'বুয়েনাস-আইরেস থেকে।'

সচকিত হয়ে উঠল মুটকো।

'সেখানে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে'—যোগ দিলে ইকথিয়াস্তর।

'হাত বাড়া'—বলল লোকটা।

তাতে অবাক লাগল ইকথিয়াস্তরের, কিন্তু কিছুই সন্দেহ না করে হাত বাড়িয়ে দিল সে। মুটকোও অমনি পকেট থেকে হাত-কড়া নিয়ে চট করে তার হাতে পরিয়ে দিল।

'ধরা পড়েছে বাছাধন! চকচকে বোতামওয়ালা লোকটা বিড়বিড় করে ঠেলা দিলে তার পাঁজরে, হাঁকল :

'চল তোকে 'দলোরেস'-এ পৌঁছে দিচ্ছি দাঁড়া।'

'হাত-কড়া পরালেন কেন?' জিজ্ঞেস করল ইকথিয়ান্ডর, খারাপ কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না সে। হাত তুলে কড়াদুটো দেখতে লাগল।

'মুখ বন্ধ করে থাকবি!' কড়া ধমক দিল লোকটা, 'নে, এগো!'

মাথা নিচু করে ইকথিয়ান্ডর হাঁটতে লাগল। অন্তত এইটুকু ভাগ্যি, যে তাকে উলটো পথে নিয়ে যাচ্ছে না। কী ব্যাপার বুঝতে পারছিল না সে। জানত না যে গত রাতে পাশের একটি ফার্মে ডাকাতি ও খুনখারাবি হয়ে গেছে। দুর্বৃত্তদের খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ। এটাও তার খেয়াল ছিল না যে তার দলা-মোচড়া পোশাকে তাকে খুবই সন্দেহজনক দেখাচ্ছিল, কেন সে 'দলোরেস'-এ যাচ্ছে তার ভাসা ভাসা জবাবেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

ইকথিয়ান্ডরকে গ্রেপ্তার করে পুলিস এখন তাকে নিয়ে যাচ্ছে কাছের থানায়, সেখান থেকে পাঠাবে পারানায়, জেলে।

শুধু একটা কথা বুঝেছিল ইকথিয়ান্ডর : স্বাধীনতা হারিয়েছে সে, বিছছিরি বাধা ঘটেছে তার সফরে। ঠিক করল, যে করেই হোক প্রথম সুযোগেই মুক্তি পেতে হবে।

মুটকো পুলিশটা তার সাফল্যে খুশি হয়ে লম্বা চুরুট টানতে টানতে আসছিল ইকথিয়ান্ডরের পেছন পেছন। ফলে ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ঢাকা পড়ছিল ইকথিয়ান্ডর, দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার।

পুলিশটাকে বলল :

'ধোঁয়া না ছেড়ে কি চলছে না? নিশ্বাস নিতে পারছি না যে।'

'কী বললি? চুরুট খাওয়া চলবে না।' হা-হা-হা! হেসে উঠল লোকটা, কুঁচকে উঠল তার সারা মুখ। 'ইস, কী ননীর শরীর!' বলে এক রাশ ধোয়া ছাড়ল সে ঠিক ইকথিয়ান্ডরের মুখের ওপর। হাঁক দিল, 'চল চল।'

হুকুম মেনে ইকথিয়ান্ডর চলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত পুকুরটা আর তার ওপরকার সরু সাঁকোটা দেখতে পেলে সে, অজ্ঞাতসারেই গতিবেগ তার বেড়ে গেল।

'তোর দলোরেসের জন্যে অত তাড়া না করলেও চলবে! হাঁক দিলে মুটকোটা।

'সাঁকোর ওপর উঠল ওরা। আর সাঁকোর ঠিক মাঝখানে হঠাৎ রেলিং টপকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইকথিয়ান্ডর।

হাত-কড়া পরানো একটা লোক যে অমন কাণ্ড করতে পারে, পুলিশটা কল্পনাও করতে পারে নি।

কিন্তু ঠিক পরের মুহূর্তে মুটকোটাও যা করল সেটাও কল্পনা করতে পারে নি ইকথিয়ান্ডর। ইকথিয়ান্ডরের পেছু পেছু সে-ও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, ভয় পেয়েছিল আসামি হয়তো ডুবে মরবে। ওকে জ্যান্ত জমা দিতে চেয়েছিল সে, হাত-কড়া বাঁধা আসামি জলে ডুবে মরলে ঝামেলা সইতে হবে অনেক। দ্রুত ইকথিয়ান্ডরের পিছু নিয়ে পুলিশটা তার চুল চেপে ধরল। ইকথিয়ান্ডর তখন চুলের মায়া না করে পুলিশটাকে নিয়ে তলাতে লাগল জলের মধ্যে। অচিরেই সে টের পেল পুলিশটার মুঠো শিথিল হয়ে আসছে, চুল ছেড়ে দিল সে। সাঁতরে কয়েক মিটার দূরে চলে গেল ইকথিয়ান্ডর, তারপর অবস্থাটা দেখবার জন্য ভেসে উঠল। ভেসে উঠল পুলিশটাও। জল খলবল করে উপরে উঠে ইকথিয়ান্ডরের মাথা দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে :

'ডুবে মরবি যে হারামজাদা! সাঁতরে আয় আমার কাছে? মতলবটা তো মন্দ নয়, ডাবলে ইকথিয়ান্ডর এবং হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : 'বাঁচাও! ডুবে যাচ্ছি...' বলে তলিয়ে গেল নিচে।

জলের তল থেকে সে লক্ষ করতে লাগল পুলিশটাও ডুব দিয়ে তাকে খুঁজছে। শেষ পর্যন্ত সাফল্যে হতাশ হয়ে পুলিশটা সাঁতরে গেল তীরে।

ইকথিয়ান্ডর ভাবলে, 'এই বার চলে যাবে।' পুলিশটা কিন্তু গেল না। ঠিক করল তদন্তকারীর দল না-আসা পর্যন্ত সে লাশের কাছেই থাকবে। লাশটা যে পুকুরের তলাতেই পড়ে থাকছে, তাতে পুলিশটার কাছে ব্যাপারটা বদলাচ্ছে না।

এই সময় বস্তা বোঝাই এক খচ্চরের পিঠে চেপে একজন চাষি যাচ্ছিলেন সাঁকোর ওপর দিয়ে। পুলিশটা তাকে হুকুম দিলে বস্তা রেখে কাছের থানাটায় গিয়ে একটা চিরকুট দিতে হবে। ইকথিয়ান্ডরের পক্ষে একটা বিছছিরি মোড় নিল ব্যাপারটা। তার ওপর পুকুরটা ছিল জোঁকে ভরা। ইকথিয়ান্ডরকে ছেঁকে ধরল তারা। গা থেকে জোঁক টেনে টেনে ছাড়িয়ে উঠতে পারছিল না সে। ছাড়াতে হচ্ছিল খুব সন্তর্পণে, শান্ত জল যাতে ঘুলিয়ে না ওঠে, নইলে পুলিশটার দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারত।

আধ-ঘণ্টা পরে খচ্চরের পিঠে ফিরল চাষিটা। রাস্তার দিকে কী দেখালে, তারপর খচ্চরের পিঠে বস্তাগুলো চাপিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে দেখা দিল তিনজন পুলিশ। দু'জনের মাথায় হালকা নৌকো, তৃতীয় জনের ঘাড়ে দাঁড় আর হুক।

জলে নৌকো ভাসিয়ে খোঁজ শুরু করল। তাতে ইকথিয়ান্ডরের ভয় ছিল না। ওর কাছে এটা ছিল খেলা—শুধু এখান থেকে ওখানে সরে সরে যাচ্ছিল সে। সাঁকোর কাছাকাছি পুকুরের গোটা তলাটায় তল্লাশ চলল খুঁটিয়ে, কিন্তু লাশ পাওয়া গেল না।

ইকথিয়ান্ডরকে আটক করেছিল যে পুলিশটা তাজ্জব মেনে হাত ওলটাল সে। তাতে ইকথিয়ান্ডরের মজাই লাগল। কিন্তু শিগগিরই অবস্থাটা খারাপ হল ইকথিয়ান্ডরের পক্ষে। পুকুরের তলা থেকে সন্ধানের সময় এক রাশ পাঁক তুলে উঠল, ঘুলিয়ে উঠল জল। ফলে এক হাতদূরের জিনিসও ইকথিয়ান্ডর আর দেখতে পাচ্ছিল না, সেটা খুবই বিপদের কথা। তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার, পুকুরের জলে অক্সিজেন কম, কষ্ট হচ্ছিল কানকো দিয়ে নিশ্বাস দিতে, তার ওপর এই পাঁক।

দম ফুরিয়ে আসছিল ইকথিয়ান্ডরের, কড়কড় করছিল কানকো। আর সহ্য করা হয়ে উঠল অসম্ভব। অজ্ঞাতসারেই একটা গোঙানি বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। কী করা যায়? উঠে আসবে জল থেকে। আর কোনো উপায় নেই। কপালে যাই থাক, উঠে আসতেই হবে। হয়তো পাকড়ে ধরবে তাকে, মারবে, চালান দেবে জেলখানায়। কিছুই তাতে এসে যায় না। টলতে টলতে ইকথিয়ান্ডর এগিয়ে গেল তীরের দিকে, মাথা তুললে জল থেকে।

'আঁ-আঁ-আঁ!' অমানুষিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল একটা পুলিশ, নৌকো ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে তাড়াতাড়ি সাঁতরাতে লাগল তীরের দিকে।

'বাঁচাও, যিশু, মেরি!' বলে নৌকোর ভেতর লুটিয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল তার সঙ্গী।

অন্য যে দু'জন তীরে দাঁড়িয়েছিল, ফিসফিস করে প্রার্থনা শুরু করলে তারা। ফ্যাকাসে হয়ে তারা আতঙ্কে জড়াজড়ি করে কাঁপছিল।

এটা ইকথিয়ান্ডর আশা করে নি, ব্যাপারটা কী চট করে বুঝেও উঠতে পারে নি সে। পরে তার মনে পড়ল যে স্পেনীয়রা খুবই ধর্মভীরু এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। নিশ্চয়ই ভেবেছে ভূত দেখছে। ইকথিয়ান্ডর ভাবল আরেকটু ভয় দেখাবে ওদের। দাঁত খিঁচিয়ে, চোখ পাকিয়ে বীভৎস একটা গর্জন করে সে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল তীরের দিকে। ইচ্ছে করেই সে তাড়াহুড়ো করল না, তীরে উঠে মাপা পায়ে সে চলে যেতে লাগল।

একটা পুলিশও নড়ল না, আটকাতে গেল না তাকে। কর্তব্য পালনে বাধা ঘটাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্ক, ভূতের ভয়।

এই সেই 'দরিয়ার দানো'

পেদ্রো জুরিতার মা, বুড়ি দলোরেস দেখতে মোটাসোটা, নাকটা কাকাতুয়ার ঠোঁটের মতো, মস্ত এক থুতনি। ঠোঁটের ওপর ঘন মোচ থাকায় মুখখানা দেখায় কেমন বিদঘুটে ও বিরূপ। নারীর পক্ষে বিরল এই অলঙ্কারটির জন্য এলাকায় তার নাম জুটেছে 'গুঁপো দলোরেস'।

তরুণী ভার্যা নিয়ে ছেলে যখন তার কাছে আসে, বুড়ি অভদ্রের মতো গুত্তিয়েরেকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। লোকের খুঁত ধরাই দলোরেসের অভ্যেস। কিন্তু গুত্তিয়েরের রূপে অবাক হয়ে যায় বুড়ি, যদিও সেটা সে প্রকাশ করে না। তবে গুঁপো দলোরেসের স্বভাবই ওই : রান্নাঘরে নিজের মনে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে সে ঠিক করলে, গুত্তিয়েরের রূপই হল তার ত্রুটি।

গুত্তিয়েরে সরে গেলে বুড়ি অসন্তুষ্টের মতো মাথা নেড়ে ছেলেকে বলল :

'তা রূপ আছে, বড়ো বেশি রূপ!' তারপর নিশ্বাস ফেলে জুড়ে দিল, 'অমন রূপসী নিয়ে তোর ঝামেলা হবে অনেক। স্পেনীয় মেয়ে বিয়ে করলেই বরং তোর ভালো হত।' তারপর কী খানিকটা ভেবে বলল, 'গুমর আছে বেশ। হাত দুখানা নরম, নবাবজাদি, কাজকম্ম হবে না ওকে দিয়ে।'

'শায়েস্তা করে নেব'—বলে পেদ্রো ঝুঁকে পড়ল তার হিশেব-নিকেশে।

হাই তুলল দলোরেস, ছেলের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বাগানে চলে গেল সন্ধ্যার তাজা হাওয়া খেতে। চাঁদনি রাতে চুপ করে বসে বসে ভাবতে তার ভালো লাগত।

বাগান ভরে উঠেছে মিমোজা ফুলের সুগন্ধে। জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে সাদা সাদা লিলি। সামান্য পাতা নড়ছে লরেল ঝোপে।

মির্টল ঝোপের মাঝখানে একা বেঞ্চিতে বসে নিজের কল্পনায় ডুবে গেল দলোরেস। পাশের জমিটা কিনে নেবে সে, মিহিলোমের ভেড়া পালবে, তুলতে হবে নতুন একটা চালাঘর।

'লক্ষ্মীছাড়া সব!' গালে চড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি, 'এই মশাগুলোর জন্যে একটু শান্তিতে বসে থাকারও জো নেই।'

অলক্ষে মেঘ করে এল আকাশে, আধো-অন্ধকারে ছেয়ে গেল গোটা বাগান। দিগন্তে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠল উজ্জ্বল নীলাভ ছটা, পারানা শহরের আলো।

হঠাৎ একটা মানুষের মাথা সে দেখতে পেলে নিচু পাথুরে বেড়ার ওপর। কে একজন কড়াবাঁধা হাত তুলে সন্তর্পণে দেয়াল টপকাল।

ভয় পেয়ে গেল বুড়ি। ভাবল, 'জেল-ভাঙা কোনো কয়েদি ঢুকছে বাগানে।' চেঁচাতে গেল সে, পারল না। উঠে পালাতে চাইল, কিন্তু বশ মানল না তার পা। বেঞ্চিটায় বসে বসেই সে অচেনা লোকটাকে লক্ষ করতে লাগল।

আর হাত-কড়া পরা লোকটা সন্তর্পণে ঝোপের মধ্য দিয়ে পথ করে কাছিয়ে আসতে লাগল বাড়িটার দিকে, উঁকি দিতে লাগল জানলায়।

হঠাৎ তার কানে এল, নাকি তার শোনার ভুল? কয়েদিটা যেন আস্তে করে ডাকলে:

'গুত্তিয়েরে!'

'বটে! এই তোমার রূপসী। কয়েদির সঙ্গে ভাব। এ সুন্দরী নিশ্চয় ব্যাটা সমেত আমায় খুন করে সবকিছু লুটে নিয়ে পালাবে কয়েদিটার সঙ্গে'—ভাবল দলোরেস।

বৌমার প্রতি অসহ্য বিদ্বেষ ও তিক্ত হিংসেয় বুড়ির মন ভরে উঠল। তাতে শক্তি ফিরে পেল সে। লাফিয়ে উঠে সে ছুটল বাড়িতে।

'শিগগির!' ফিসফিসিয়ে ছেলেকে ডাকল সে, 'বাগানে একটা কয়েদি সেঁধিয়েছে। গুত্তিয়েরেকে ডাকছে।

এমন ছুটে পেদ্রো বেরুল যেন ঘরে আগুন লেগেছে, পথে পড়ে থাকা একটা বেলচা তুলে নিয়ে দৌড়াল বাড়ির পাশ দিয়ে।

নোংরা, দলা-মোচড়া পোশাক পরা একটা অচেনা লোক দাঁড়িয়েছিল দেয়ালের কাছে, হাতে তার হাত-কড়া, চেয়ে দেখছিল জানলা দিয়ে।

'শালা!' বিড়বিড় করে পেদ্রো তার বেলচার ঘা মারল লোকটার মাথায়।

মাটিতে পড়ে গেল ইকথিয়াস্তর, একটি কথাও বেরুল না মুখ দিয়ে।

'খতম!' আস্তে করে বলল পেদ্রো।

'খতম!' পেছন থেকে এমন সুরে সায় দিলে দলোরেস যেন একটা বিষাক্ত বিছে মেরেছে তার ছেলে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জুরিতা চাইল মায়ের দিকে।

'কোথায় সরাই?'

'পুকুরে'—বলল বুড়ি, 'জল খুব গভীর।'

'ভেসে উঠবে যে।'

'পাথর বেঁধে দেব। দাঁড়া...'

দলোরেস ছুটে গেল বাড়ির ভেতরে। লাশটাকে পোরার মতো একটা বস্তা সে খুঁজল শশব্যস্ত হয়ে। কিন্তু বস্তা ছিল না, সকালে সে সবকটি বস্তাই গম বোঝাই করে পাঠিয়ে দিয়েছে মিলে। তখন সে বালিশের ওয়াড় আর লম্বা একটা দড়ি নিয়ে এল।

ছেলেকে সে বলল, 'বস্তা পেলাম না'—ফিসফিসিয়ে বলল দলোরেস, দড়ি আর ওয়াড় নিয়ে ছেলের পেছন পেছন ছুটছিল সে।

'ধুয়ে দিও'—বলল পেদ্রো, তাহলেও মাথাটা একটু সরিয়ে দিলে রক্ত যেন গড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

পুকুরের কাছে এসে চটপট সে পাথর ভরল ওয়াড়ে, হাতের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে লাশ ছুড়ে দিলে পুকুরে।

'এবার পোশাক বদলাতে হয়'—আকাশের দিকে চাইল পেদ্রো, 'বৃষ্টি হবে। মাটিতে রক্তের দাগ ধুয়ে যাবে তাতে।'

'কিন্তু...পুকুরের জল লাল হয়ে উঠবে না তো রক্তে?' জিজ্ঞেস করল গুঁপো দলোরেস।

'তা হবে না। স্রোতের সঙ্গে যে পুকুরটার যোগ আছে। ইস, হারামজাদি!' ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল জরিতা বাড়ি যেতে যেতে, মুঠো পাকিয়ে একটা জানলার উদ্দেশে শাসাল সে।

'দ্যাখ, কেমন তোর রূপসী?' ঘ্যানঘেনিয়ে ফোড়ন কাটল বুড়ি।

গুত্তিয়েরের ঠাঁই হয়েছিল চিলেকোঠায়। এ রাত সে ঘুমতে পারল না। গুমোট আবহাওয়ায় ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা। নানারকম দুর্ভাবনায় মনটা তার ভরে উঠেছিল।

ইকথিয়াস্তরকে, তার মৃত্যুকে সে ভুলতে পারে নি। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা ছিল না। শাশুড়িকে দেখে তার বিশ্রী লেগেছিল অথচ এই গুঁপো বুড়ির সঙ্গেই তাকে দিন কাটাতে হবে।

সে রাতে তার মনে হয়েছিল যেন সে ইকথিয়াণ্ডরের কথা শুনতে পেলে, তাকে যেন সে ডাকলে নাম ধরে। বাগান থেকে কী একটা গোলমালের শব্দ, কার যেন চাপা আলাপ ভেসে এল। গুত্তিয়েরে ঠিক করল, এ রাতে তার আর ঘুম হবে না। বাগানে বেরিয়ে এল সে।

সূর্য তখনো ওঠে নি। ঊষার আধো অন্ধকারে বাগান নিঝুম। মেঘ কেটে গেছে, ঘাসে আর গাছপালায় ঝিকমিক করছে বড়ো বড়ো শিশিরের ফোঁটা। খালি পায়ে হালকা ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে হাঁটছিল গুত্তিয়েরে। হঠাৎ থেমে গিয়ে মাটিটা নজর করতে লাগল সে। তার জানলার সামনে মাটিটায় রক্তের দাগ, রক্তমাখা বেলচাটাও পড়ে আছে সেখানে।

রাত্রে এখানে নিশ্চয় কোনো খুনজখম হয়ে গেছে। নইলে এ রক্তের দাগগুলো আসবে কোত্থেকে?

অজ্ঞাতসারেই গুত্তিয়েরে রক্তের দাগ ধরে ধরে এসে গেল পুকুরটার কাছে।

'খুনের শেষ চিহ্নটা কি এই পুকুরেই তলিয়ে আছে?' সবজেটে জলের দিকে তাকিয়ে সভয়ে ভাবল সে।

আর দেখা গেল পুকুরের সবজেটে জলের ভেতর থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে ইকথিয়াণ্ডর। তার রগের চামড়া ছড়ে গেছে, মুখে তার যন্ত্রণার ছাপ, সেই সঙ্গে আনন্দ।

একদৃষ্টে গুত্তিয়েরে তাকিয়ে রইল ডুবো ইকথিয়াণ্ডরের দিকে। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? ইচ্ছে হল পালায়, কিন্তু পালাতে পারল না সে, চোখ ফেরাতে পারল না।

আর ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে আসতে লাগল ইকথিয়াণ্ডরের মুখ। শান্ত জলটা নড়িয়ে দিয়ে সে মুখ উঠে এল জলের ওপরে। কড়া-বাঁধা হাত সে এগিয়ে দিল গুত্তিয়েরের দিকে। ক্ষীণ হেসে এই প্রথম তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করল :

'গুত্তিয়েরে, প্রাণেশ্বরী আমার। শেষকালে তাহলে আমি...' কিন্তু কথাটা সে শেষ করল না।

টলে উঠল গুত্তিয়েরে, মাথা চেপে ধরে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল :

'দূর হও! দূর হও প্রেতাত্মা! আমি যে জানি তুমি মরে গেছ! কেন দেখা দিচ্ছ আমার সামনে?'

'না, না গুত্তিয়েরে, আমি মরি নি'—তাড়াতাড়ি করে জবাব দিল প্রেতাত্মা, 'আমি ডুবি নি। মাপ করো আমায়...আমি শুধু তোমাকে কথাটা বলি নি...কেন যে বলি নি কে জানে...পালিয়ে যেও না, আমার কথাটা শোনো। আমি বেঁচে আছি, দেখো না আমার হাতটা ছুঁয়ে...'

কড়া-পরানো হাত দুখানা সে বাড়িয়ে দিল তার দিকে। গুত্তিয়েরে একইভাবে চেয়ে রইল।

'ভয় পেও না, আমি জীবন্ত। জলের তলে থাকতে পারি আমি। অন্য সব মানুষের মতো আমি নই। জলের তলে দিন কাটাতে পারি শুধু আমি একা। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবিনি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, কারণ বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না।'

দুলে ওঠে ইকথিয়াণ্ডর, তারপর আগের মতোই হড়বড়ে অসংলগ্নভাবে বলে যেতে লাগল:

'আমি তোমার খোঁজে এসেছিলাম, গুত্তিয়েরে। কাল রাতে আমি যখন তোমার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন তোমার স্বামী এসে আমার মাথায় ঘা মারে। পুকুরে ফেলে দেয় আমায়। জলে আমার জ্ঞান ফেরে। পাথর-ভরা থলেটা আমি খসিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এইটা...' হাত-কড়াটা দেখাল ইকথিয়াণ্ডর, 'এটা খসাতে পারছি না।'

গুত্তিয়েরের যেন খানিকটা বিশ্বাস হল যে সে ভূত দেখছে না, তার সামনে সত্যিই জীবন্ত মানুষ। জিজ্ঞেস করল :

'কিন্তু হাত-কড়াটা কেন?'

'পরে তোমায় সব বলব... চলো গুত্তিয়েরে, আমরা পালাই। আমার বাবার ওখানে থাকব, তুমি আমি একসঙ্গে। কেউ-ই আমাদের খুঁজে পাবে না। নাও, আমার হাত ধরো

গুত্তিয়েরে। অল্‌সেন বলেছিল আমায় নাকি সবাই 'দরিয়ার দানো' বলে। কিন্তু আমি যে মানুষ। কেন ভয় পাচ্ছ আমায়?'

সারা গায়ে পাঁক মেখে পুকুর থেকে উঠে এল ইকথিয়াস্তর। ক্লান্তভাবে বসে পড়ল ঘাসের ওপর।

নিচু হয়ে গুত্তিয়েরে শেষ পর্যন্ত হাত ধরলে ওর।

বললে, 'আহা রে, দুঃখী আমার!'

'কী মধুর অভিসার!' হঠাৎ শোনা গেল একটা বিদ্রূপের কণ্ঠস্বর।

ফিরে তাকাতেই দেখা গেল অদূরে দাঁড়িয়ে আছে জুরিতা।

গুত্তিয়েরের মতো জুরিতাও সে রাতে ঘুমোতে পারে নি। গুত্তিয়েরের চিৎকার শুনে সে বাগানে আসে এবং গোটা আলাপটা শোনে। দরিয়ার যে 'দানো'কে ধরার জন্য সে এতদিন ধরে বৃথাই সন্ধান চালিয়েছে, সে তারই হাতের নাগালে এ কথা আবিষ্কার করে সে খুব খুশি হয়ে ওঠে, ঠিক করে তক্ষুণি তাকে নিয়ে যাবে তার 'জেলি-মাছ' জাহাজে। কিন্তু পরে ভেবে দেখে সে তার মত ঘোরাল।

'ডাক্তার সালভাতরের কাছে গুত্তিয়েরেকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না, ইকথিয়াস্তর, কারণ গুত্তিয়েরে আমার স্ত্রী। আপনি নিজেই আপনার বাবার কাছেই পৌঁছবেন কিনা সন্দেহ। পুলিস আপনার দায়িত্ব নেবে।'

'কিন্তু আমি তো কোনো অপরাধ করি নি!' চেঁচিয়ে উঠল ইকথিয়াস্তর।

'অপরাধ না করলে অমন এক জোড়া অপূর্ব কঙ্কণ পুলিস কাউকে উপহার দেয় না। আমার হাতে যখন পড়েছেন তখন আমার কর্তব্য হল আপনাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া।'

'আপনি সত্যি তাই করবেন?' সরোষে জিজ্ঞেস করল গুত্তিয়েরে।

'ওটা আমার কর্তব্য।'

কয়েদিকে ছেড়ে দিলে খুবই মঙ্গল হবে বৈকি'—হঠাৎ এসে আলাপের মধ্যে নাক গলাল দলোরেস, 'কিন্তু কেন? কয়েদিটা পরের জানালায় এসে উঁকি দিচ্ছে, পরের বৌ নিয়ে ভাগতে চায় বলে?"

স্বামীর কাছে সরে এল গুত্তিয়েরে, তার হাতটা ধরে নরম গলায় বলল :

'ছেড়ে দিন ওকে। মিনতি করছি। আপনার কাছে আমি কোনো দোষ করি নি।'

পাছে ছেলে বৌয়ের অনুরোধ মেনে নেয়, এই ভয়ে দলোরেস হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'শুনিস না ওর কথা, পেদ্রো!'

'নারী অনুরোধ করলে আমি নিরুপায়'—সৌজন্যের অবতার হয়ে বলল জুরিতা, 'বেশ, তোমার কথাই রইল।'

'বিয়ে করতে না করতেই একেবারে বৌয়ের আঁচল-ধরা হয়ে বসেছ'—গজগজ করলে বুড়ি।

'আরে, দাঁড়াও না মা! আমরা আপনার হাত-কড়া কেটে দেব হে ছোকরা, আরেকটু ভদ্রগোছের পোশাক পরিয়ে নিয়ে যাব 'জেলি-মাছ' জাহাজে। রিও-দে-লা-প্লাতায় আপনি জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে যথা-ইচ্ছে সাঁতরে বেড়াতে পারবেন। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেব শুধু একটি শর্তে—গুত্তিয়েরেকে ভুলে যেতে হবে। আর তোমায় গুত্তিয়েরে, আমি নিজের কাছে রাখব। সেটা হবে অনেক নিরাপদ।'

'আপনাকে যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে আপনি লোক ভালো'—অকপটেই বলল গুত্তিয়েরে। আত্মতৃপ্তিতে মোচে পাক দিয়ে বৌয়ের উদ্দেশে মাথা নোয়াল জুরিতা।

নিজের ছেলেকে বুড়ি ভালোই চিনত। চট করেই সে আন্দাজ করল কোনো একটা মতলব আছে তার। তলে তলে তার চালটাকে সাহায্য করার জন্যে সে তার লোক-দেখানি বিরক্তিকর গজগজানি চালিয়ে গেল : 'একেবারে মজে বসেছে। এখন থাকো বৌয়ের আঁচল ধরে।'

পুরোদমে

'কাল সালভাতর আসছে। আমি জ্বরে আটকে পড়েছিলাম, অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে'—বালতাজারকে বলল ক্রিস্টো; আলাপটা হচ্ছিল বালতাজারের দোকানে বসে, 'আমার কথাটা শোন্ মন দিয়ে, ধুম-ধড়াক্কা কথা কয়ে আমায় গুলিয়ে দিস না।'

একটু চুপ করে থেকে ভাবনাগুলো গুছিয়ে নিয়ে ক্রিস্টো বলে গেল :

'জুরিতার জন্যে আমরা দু'জন অনেক খেটেছি। আমাদের চেয়ে ও অনেক ধনী, কিন্তু আরো ধনী হতে চায় সে। ওর ইচ্ছে, 'দরিয়ার দানো'কে ধরবে।'

নড়েচড়ে উঠল বালতাজার।

'কথা কইবি না, নইলে কী বলতে যাচ্ছিলাম গুলিয়ে যাবে। জুরিতা চায়, 'দরিয়ার দানো' হবে ওর গোলাম। আর 'দরিয়ার দানো' মানে কী বুঝলি? তার মানে হাতে স্বর্গ পাওয়া। ধনের আর শেষ থাকবে না। সমুদ্রের তল থেকে রাশি-রাশি রতন তুলে আনবে সে। শুধু মুক্তোই নয়। সমুদ্রের পেটে অঢেল ধনসম্পদ নিয়ে জাহাজ ডুবে আছে অনেক। সেটা এনে দিতে পারে আমাদের জন্যে। বলছি আমাদের জন্যে, জুরিতার জন্যে নয়। জানিস তো ভাই, ইকথিয়াণ্ডর ভালোবাসে গুত্তিয়েরেকে?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল বালতাজার, ক্রিস্টো তার ফুরসত দিলে না।

'চুপ, করে শুনে যা। কথার মাঝখানে কেউ বাধা দিলে আমি আর বলতে পারি না। হ্যাঁ, ইকথিয়াণ্ডর গুত্তিয়েরেকে ভালোবাসে। আমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া সহজ নয়। যখন টের পেলাম, বললাম, ঠিক আছে। ভালোবাসা আরো জমুক। জুরিতার চেয়ে ও হবে ভালো জামাই। গুত্তিয়েরেও ওকে ভালোবাসে। ইকথিয়াণ্ডরকে বাধা না দিয়ে আমি ওদের অনুসরণ করে দেখেছি। চলুক না দেখা-সাক্ষাৎ।'

নিশ্বাস ফেললে বালতাজার, কিন্তু উচ্চবাচ্য করল না।

'শুধু এইটুকুই নয় রে ভাই। শোন, আরো বলি। বহুকাল আগের একটা কথা তোকে বলি। বিশ বছর আগের ব্যাপার। তোর বৌ যখন বাড়ি ফিরছিল আমি ছিলাম তার সঙ্গে। মনে নেই? পাহাড়ে গিয়েছিল সে তার মায়ের শ্রাদ্ধে। ফেরার পথে ছেলে হতে গিয়ে সে মারা যায়। ছেলেটাও বাঁচে না। তখন আমি তোকে সব কথা ভাঙি নি, ভেবেছিলাম তুই কষ্ট পাবি। এখন বলি, বৌ তোর পথেই মারা যায়, কিন্তু ছেলেটা বেঁচে ছিল, তবে খুবই কাহিল অবস্থায়। ব্যাপারটা ঘটে রেড-ইন্ডিয়ানদের একটা গ্রামে। একজন বুড়ি বলল, কাছেই নাকি থাকে এক নামজাদা বিশ্বকর্মা, ঈশ্বর সালভাতর...'

উদগ্রীব হয়ে উঠল বালতাজার।

'বুড়ি আমাকে ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে সালভাতরের কাছে নিয়ে যেতে বললে। আমিও পরামর্শ মেনে নিয়ে গেলাম তার কাছে। বললাম 'বাঁচান একে।' সালভাতর ওকে

নিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'বাঁচানো কঠিন।' বলে নিয়ে চলে গেল। আমি সন্ধে পর্যন্ত বসে রইলাম। সন্ধ্যেয় নিগ্রোটা এসে বলল, 'ছেলে মারা গেছে।' আমি তখন চলে আসি।

'তা এই হল ব্যাপার'—বলে চলল ক্রিস্টো, 'তার নিগ্রোটাকে দিয়ে সালভাতর বলে পাঠাল যে ছেলেটি মারা গেছে। তোর ছেলের গায়ে একটা জন্মগত জড়ুল আমার তখন চোখে পড়েছিল। তার আকারটা আমার ভালোই মনে আছে।' একটু চুপ করে থেকে ক্রিস্টো আবার শুরু করল, 'কিছুদিন আগে ইকথিয়ান্ডর জখম হয় ঘাড়ের কাছটায়। সেটা ব্যান্ডেজ করে দেবার সময় আমি তার আঁশের কলারটা খানিকটা খুলি, আর কী দেখলাম জানিস, ঠিক তোর ছেলের জড়ুলের মতো দাগ।'

চোখ বড়ো বড়ো করে বালতাজার তাকাল ক্রিস্টোর দিকে, বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তোর ধারণা ইকথিয়ান্ডর আমার ছেলে?'

'চুপ করে থাক ভাই, চুপ করে শোন। হ্যাঁ, তাই আমার ধারণা। আমার মনে হয় সালভাতর সত্যি কথা বলে নি। ছেলে তোর মরেনি, সালভাতর তাকে দিয়ে 'দরিয়ার দানো' বানিয়েছে।'

'উহ্!' উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠল বালতাজার, 'এ কী তার দুঃসাহস! নিজের হাতে আমি তাকে খুন করব!'

'মুখ বুজে থাকে রে। সালভাতরের বল তোর চেয়ে বেশি। তাছাড়া, আমি তো ভুল করতে পারি। বিশ বছর কেটে গেছে! ঘাড়ে একটা জড়ুল অন্য লোকেরও থাকতে পারে। ইকথিয়ান্ডর তোর ছেলে হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। তাই সাবধান হতে হবে। তুই সালভাতরের কাছে গিয়ে বলবি যে ইকথিয়ান্ডর তোর ছেলে। আমি হব তোর সাক্ষী। তুই ছেলে ফেরত নেবার দাবি করবি। যদি না দেয়, তাহলে বলবি যে শিশুদের বিক্রলাঙ্গ করছে বলে তুই ওর নামে মামলা আনবি। এ কথায় সে ভয় পাবে। তাতেও কাজ না দিলে মামলা ঠুকবি। ইকথিয়ান্ডর তোর ছেলে সেটা যদি আদালতেও প্রমাণ না হয়, তাহলে ইকথিয়ান্ডর বিয়ে করবে গুত্তিয়েরেকে—সে তো তোর পালিতা কন্যা, বৌ-ছেলের জন্যে তুই তখন খুব কাতর হয়েছিলি। তাই আমিই তো তখন গুত্তিয়েরেকে জুটিয়ে দিয়েছিলাম তোর জন্যে।'

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল বালতাজার। শাঁখ, কাঁকড়া তছনছ করে সে পায়চারি করতে লাগল দোকানটায়।

'ছেলে! আমার ছেলে! উহ্, কী পোড়া কপাল!'

'পোড়া কপাল কেন?' অবাক হল ক্রিস্টো।

'আমি তোর কথায় এতক্ষণ বাধা দিইনি, মন দিয়ে শুনেছি। এবার আমার কথা শোন। তুই যখন জ্বরে ভুগছিলি তখন পেদ্রো জুরিতার সঙ্গে গুত্তিয়েরের বিয়ে হয়ে গেছে।'

এ খবরে স্তম্ভিত হয়ে গেল ক্রিস্টো।

'আর ইকথিয়ান্ডর—অভাগা ছেলে আমার...' মাথা নিচু করল বালতাজার, 'ইকথিয়ান্ডর পড়েছে জুরিতার কবলে।'

'হতে পারে না'—আপত্তি করল ক্রিস্টো।

'সত্যি কথাই বলছি, ইকথিয়ান্ডর এখন 'জেলি-মাছ' জাহাজে। আজ সকালেই জুরিতা এসেছিল আমার কাছে। আমাদের নিয়ে খুব একচোট ঠাট্টা করল, গালাগালি দিলে। বললে, আমরা নাকি ওকে ধাপ্পা দিচ্ছিলাম। আমাদের সাহায্য ছাড়াই সে এখন ইকথিয়ান্ডরকে ধরেছে। আমাদের আর এক পয়সাও দেবে না। তবে নিজেই ওর টাকা ছোঁব না আমি। নিজের ছেলেকে কি কেউ বিক্রি করতে পারে?'

হতাশ হয়ে উঠল বালতাজার। অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ক্রিস্টো চাইল তার ভাইয়ের দিকে। এখন উচিত দৃঢ় সংকল্পে কাজে নামা। কিন্তু বালতাজারের কাজে সাহায্যের বদলে ক্ষতি করেই বসতে পারে। ইকথিয়াস্তর যে বালতাজার ছেলে সে কথায় ক্রিস্টোর নিজেরই তেমন বিশ্বাস ছিল না। ক্রিস্টো অবশ্য সদ্যজাত ছেলেটির গায়ে জড়ুল দেখেছিল। কিন্তু সেটা কি একটা অকাট্য প্রমাণ হতে পারে? ইকথিয়াস্তরের ঘাড়ে জড়ুল দেখে ক্রিস্টো ঠিক করেছিল ওই মিলটা কাজে লাগিয়ে কিছু টাকা নিংড়ে নেবে। কে ভেবেছিল যে বালতাজার তার কাহিনীকে অমনভাবে নেবে? অন্যদিকে বালতাজার যা শোনাল, তাতেও ভয় হল ক্রিস্টোর।

'এখন চোখের জল ফেলার সময় নয় রে, কাজে নামতে হবে। কাল ভোরে ফিরে আসছে সালভাতর। বুক বাঁধ। কাল সূর্যোদয়ের সময় আমার জন্যে অপেক্ষা করিস বাঁধে। ইকথিয়াস্তরকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু সাবধান, সালভাতরকে বলিস না যে তুই ইকথিয়াস্তরের বাপ। জুরিতা রওনা দিয়েছে কোন দিকে?'

'আমায় বলে নি, তবে মনে হচ্ছে উত্তরের দিকে। অনেক দিন থেকেই পানামার তীরে যাবার কথা ভাবছিল সে।'

মাথা নাড়ল ক্রিস্টো।

'মনে রাখিস, কাল সকালে সূর্যোদয়ের আগে তোকে বাঁধে হাজির থাকতে হবে। বসে থাকবি, সন্ধে পর্যন্ত বসে থাকতে হলেও নড়বি না।'

তাড়াতাড়ি ফিরে গেল ক্রিস্টো। সালভাতরের সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাৎকারের কথাটা সে ভাবল সারা রাত। বিশ্বাসযোগ্য একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করা দরকার।

সালভাতর এলেন ভোর বেলায়। মুখের ওপর একটা শোক ও আনুগত্যের ভাব ফুটিয়ে ক্রিস্টো ডাক্তারকে স্বাগত জানিয়ে বলল :

'একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। কত বার আমি ইকথিয়াস্তরকে সাবধান করে দিয়েছিলাম যেন খাঁড়িতে সাঁতরাতে না যায়...'

'কী হয়েছে ওর?' অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সালভাতর।

'ধরা পড়েছে...নিয়ে গেছে একটা জাহাজে...আমি...।'

সজোরে ক্রিস্টোর কাঁধ চেপে ধরে এক দৃষ্টিতে তার চোখে চেয়ে রইলেন সালভাতর। মুহূর্তের দৃষ্টি। সেই তীব্র দৃষ্টির সামনে অজ্ঞাতসারেই ক্রিস্টোর মুখের রঙ পালটে গেল। ভুরু কুঁচকে সালভাতর কী বিড়বিড় করলেন, ক্রিস্টোর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন : 'সে কথা খুঁটিয়ে তুই আমায় বলবি পরে।'

নিগ্রোটাকে ডাকলেন সালভাতর। ক্রিস্টোর কাছে দুর্বোধ্য কী ভাষায় তাকে কতকগুলো কথা বলে ক্রিস্টোকে হুকুম করলেন :

'চল্ আমার সঙ্গে!'

একটুও না জিবিয়ে, রাস্তার পোশাক না বদলিয়ে সালভাতর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন বাগানে। তাঁর হাঁটার সঙ্গে তাল রাখা কঠিন হচ্ছিল ক্রিস্টোর পক্ষে। তৃতীয় দেয়ালটার কাছে দু'জন নিগ্রো এসে সঙ্গ ধরল তাদের।

'প্রভুভক্ত কুকুরের মতো আমি ইকথিয়াস্তরকে পাহারা দিয়ে গেছি'—দ্রুত হাঁটায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ক্রিস্টো, কিন্তু সালভাতর শুনছিলেন না। পুলটার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি অধীরভাবে লাথি মারছিলেন—খুলে যাওয়া কপাটকল দিয়ে জল বেরিয়ে গেল।

'পেছু পেছু আয়'—ভূগর্ভের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফের হুকুম করলেন সালভাতর। গভীর অন্ধকারে ক্রিস্টো আর নিগ্রো দু'জন চলল পেছনে পেছনে। এক

সঙ্গে গোটা কয়েক করে ধাপ লাফিয়ে নামছিলেন সালভাতর, বোঝা যায় ভূগর্ভের গোলক-ধাঁধাটা তাঁর ভালোই জানা।

নিচের চাতালে নেমে সালভাতর প্রথম বারের মতো সুইচ টিপলেন না, অন্ধকার একটু হাতড়ে একটা দুয়োর খুললেন ডানদিককার দেয়ালে, এগুতে লাগলেন একটা আঁধার করিডোর দিয়ে। সিঁড়ি ছিল না এখানে, আলো না জ্বেলেই আরো গতি বাড়িয়ে দিলেন সালভাতর।

'ফাঁদ-টাদ কিছু এখানে নেই তো, কুয়োর মধ্যে তলিয়ে যাব নাকি?' সালভাতরের হাঁটার সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে ভাবছিল ক্রিস্টো। হাঁটল তারা অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ক্রিস্টো টের পেলে যে মেঝেটা নিচু হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার মনে হল যেন জলের ক্ষীণ ছলাৎ-ছলাৎ শুনতে পাচ্ছে। তারপর হঠাৎ সফর শেষ হয়ে গেল তাদের। সালভাতর এগিয়ে গিয়েছিলেন আগে, থেমে গিয়ে আলো জ্বাললেন তিনি। ক্রিস্টো দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে জলভরা একটা মস্তো লম্বাটে গুহায়। তার ডিম্বাকার ছাদটা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মিশে গেছে জলের সঙ্গে। আর যে পাথুরে মেঝেটার ওপর তারা দাঁড়িয়ে ছিল, আর একেবারে প্রান্তে জলের ওপর দেখা গেল ছোট্ট একটা সাবমেরিন। সালভাতর, ক্রিস্টো আর নিগ্রো দু'জন চাপল তাতে। কেবিনের আলো জ্বাললেন সালভাতর, একজন নিগ্রো ওপরকার হ্যাচ বন্ধ করে দিল, আরেকজন চালু করতে লাগল ইঞ্জিন। ক্রিস্টো টের পেলে যে জাহাজটা কাঁপছে, ধীরে ধীরে মোড় নিয়ে নিচে নেমে গেল, তারপর একই রকম ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সামনে। মিনিট দুয়েক পরে জাহাজ উঠে এল ওপরে। সালভাতর আর ক্রিস্টো বেরিয়ে এল পাটাতনের ওপর। সাবমেরিনে চাপার সুযোগ ক্রিস্টোর কখনো হয় নি। কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগে পিছলে চলা এই জাহাজটা যে কোনো ডিজাইনারকে অবাক করে দিতে পারে। বিচিত্র তার গঠন, বোঝা যায় ইঞ্জিনটাও প্রচণ্ড শক্তিশালী। এখনো পুরোদমে না চললেও জাহাজ এগোতে লাগল খুবই দ্রুত।

'ইকথিয়ান্ডরকে চুরি করে কোন দিকে জাহাজটা গেছে?'

'তীর বরাবর উত্তর দিকে'—জবাব দিল ক্রিস্টো, 'যদি সাহস দেন তো বলি, আমার ভাইকেও সঙ্গে নিন। ও তীরে অপেক্ষা করছে। আমি আগেই বলে রেখেছিলাম।'

'কেন?'

'ইকথিয়ান্ডরকে চুরি করেছে মুক্তো-কারবারি জুরিতা।'

'তুই জানলি কোত্থেকে?' সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলেন সালভাতর।

'খাঁড়িটার যে জাহাজটা ইকথিয়ান্ডরকে চুরি করে, সেটা দেখতে কেমন তা বলেছিলাম ভাইয়ের কাছে। ভাই ওটাকে পেদ্রো জুরিতার 'জেলি-মাছ' জাহাজ বলে শনাক্ত করে। জুরিতা নিশ্চয় ইকথিয়ান্ডরকে চুরি করেছে তাকে দিয়ে মুক্তো তোলানোর জন্যে। আর আমার ভাই মুক্তো পাওয়া জায়গাগুলো ভালো জানে। ওকে দিয়ে কাজ হবে।'

একটু ভেবে দেখলেন সালভাতর।

'বেশ, তোর ভাইকেও সঙ্গে নেব।'

বাঁধটার ওপর ভাইয়ের অপেক্ষায় ছিল বালতাজার। তীরের দিকে ফিরল জাহাজ। সালভাতর তার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার দেহ বিকৃত করেছে, তাই ভুরু কুঁচকে বালতাজার চাইলে তাঁর দিকে। তাহলেও ভদ্রভাবে সে কুর্নিশ করল সালভাতরকে, তারপর সাঁতরে এসে উঠল জাহাজে।

'পুরোদমে চালাও!' হুকুম দিলেন সালভাতর।

ক্যাপটেনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন সমুদ্রের সুদূরে।

অসাধারণ বন্দি

করাত দিয়ে ইকথিয়াণ্ডরের হাত-কড়া কেটে ফেললে জুরিতা, নতুন পোশাক দিল তাকে; বালিতে লুকানো তার দস্তানা-চশমাও ইকথিয়াণ্ডর পেলে। কিন্তু 'জেলি-মাছ' জাহাজের ডেকে আসা মাত্রই জুরিতার হুকুমে রেড-ইণ্ডিয়ানরা তাকে ধরে বন্দি করে রাখল জাহাজের খোলের মধ্যে। বুয়েনাস-আইরেসে জুরিতা রসদ নেবার জন্য কিছুটা থামে। বালতাজারের সঙ্গে দেখা করে সে, বড়াই করে নিজের সাফল্যের, তারপর তীর বরাবর রওনা দেয় রিও-ডি-জেনেইরোর দিকে। ঠিক করেছিল দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব তীর বরাবর পাড়ি দিয়ে মুক্তো সংগ্রহে নামবে ক্যারিবিয়ান সাগরে।

গুস্তিয়েরের ঠাঁই হল ক্যাপটেনের কেবিনে। জুরিতা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল ইকথিয়াণ্ডরকে সে রিও-দে-লা-প্লাতা উপসাগরে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মিথ্যাটা ফাঁস হয়ে যায় অচিরেই। সন্ধ্যায় জাহাজের খোলের ভেতর থেকে গোঙানি ও চিৎকার শুনতে পায় গুস্তিয়েরে। ইকথিয়াণ্ডরের গলার স্বর সে চিনতে পারে। জুরিতা সে সময় ছিল ওপরের ডেকে। কেবিন থেকে বেরোবার চেষ্টা করে গুস্তিয়েরে, কিন্তু দরজা ছিল বাইরে থেকে বন্ধ। দরজার কিল মারতে শুরু করে সে, কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না তার চিৎকারে।

ইকথিয়াণ্ডরের চিৎকার শুনে জুরিতা বেদম মুখখিস্তি করে তার একজন রেড-ইণ্ডিয়ান খালাসি নিয়ে নেমে এল খোলের ভেতর। জায়গাটা অসাধারণ গুমোট আর অন্ধকার।

'চ্যাঁচাচ্ছ কেন?' রূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করল জুরিতা।

'আমি...আমার দম ফুরিয়ে যাচ্ছে' শোনা গেল ইকথিয়াণ্ডরের গলা, 'জল ছাড়া আমি বাঁচব না। অসম্ভব গুমোট এখানে। সমুদ্রে ছেড়ে দিন আমায়। এ রাত আর টিকব না...'

খোলের হ্যাচ বন্ধ করে জুরিতা উঠে এল ডেকে।

'সত্যিই যদি টেঁসে যায়'—উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবল জুরিতা, ইকথিয়াণ্ডরের মৃত্যু তার কাছে মোটেই লাভের ব্যাপার নয়।

জুরিতার হুকুমে একটা পিপে নিয়ে যাওয়া হল খোলে, খালাসিরা তাতে জল ভরল।

'এই নাও তোমার স্নানের ব্যবস্থা'—ইকথিয়াণ্ডরকে বলল জুরিতা, 'এখন সাঁতরে বেড়াও, কাল সকালে তোমায় সমুদ্রে ছাড়ব।'

তাড়াতাড়ি করে পিপের মধ্যে ঢুকল ইকথিয়াণ্ডর! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রেড-ইণ্ডিয়ানগুলো অবাক হয়ে তার স্নান দেখছিল। তারা জানত না যে 'জেলি-মাছের' বন্দিটি আর কেউ নয়, 'দরিয়ার দানো'।

'ভাগো সব ডেকে!' তাদের উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল জুরিতা।

পিপেটায় সাঁতরানো অসম্ভব, দেহটাকে পুরোপুরি টান করাও চলে না। ডুব দেবার জন্য শরীর গুটিয়ে আনতে হল ইকথিয়াণ্ডরকে। পিপেটায় এক সময় নোনা মাংস রাখা হত। শিগগিরই জলটা ভরে উঠল তার গন্ধে; ফলে খোলের গুমোটের চেয়ে মাত্র সামান্যই সুস্থ বোধ করল ইকথিয়াণ্ডর।

সমুদ্রে সে সময় তাজা দক্ষিণপূর্বী বাতাস বইছিল, জাহাজটাও এগুতে লাগল উত্তরের দিকে।

ক্যাপটেনের মঞ্চে জুরিতা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, কেবিনে ফিরল সে ভোরের আগে। ভেবেছিল, বৌ নিশ্চয় অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু দেখা গেল হাতের ওপর মাথা রেখে সরু একটা টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছে গুস্তিয়েরে। জুরিতা ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল, সিলিং থেকে ঝুলন্ত ফুরিয়ে-যাওয়া একটা বাতির ক্ষীণ আলোয় জুরিতার চোখে পড়ল তার ফ্যাকাশে ভ্রুকুটিত মুখ।

চাপা গলায় গুস্তিয়েরে বলল, 'আমায় ধাপ্পা দিয়েছেন আপনি!'

স্ত্রীর সরোষ দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করছিল জুরিতা, সেটা চাপা দেবার জন্য একটা নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে তুলল, মোচে তা দিয়ে রহস্য করে বলল :

'ইকথিয়ান্ডর আপনার কাছাকাছি থাকার জন্যে 'জেলি-মাছ' জাহাজেই থাকতে চাইছে।'

'মিথ্যে কথা! আপনি একটা হীন পাষণ্ড। ঘেন্না করি আপনাকে!' বলেই দেয়াল থেকে একটা বড়ো ছোরা নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জুরিতার ওপর।

'বটে!' জুরিতা খপ করে গুস্তিয়েরের হাতটা ধরে ফেলে এমন চাপ দিলে যে ছোরাটা খসে পড়ল।

কেবিন থেকে ছোরাটা লাথি মেরে সরিয়ে বৌয়ের হাত ছেড়ে দিল সে :

'এটা বরং ভালো। ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছেন আপনি। এক গ্লাস জল খেয়ে নিন।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় চাবি দিল সে, তারপর উঠে গেল ওপরের ডেকে।

পুব দিকটা ততক্ষণে গোলাপি হয়ে উঠেছে, দিগন্তের নিচে লুকানো সূর্যের আলো পড়ে হালকা মেঘগুলোকে দেখাচ্ছিল যেন আগুনের শিখা। সকালের লবণাক্ত তাজা বাতাসে ফুলে উঠেছে পাল। সাগরের ওপর ওড়াওড়ি করছে সিন্ধুচিলেরা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে ছলবলিয়ে ওঠা মাছগুলোর ওপর।

সূর্য উঠে এল। পেছনে হাত রেখে তখনো পায়চারি করে যাচ্ছিল জুরিতা।

'ঠিক আছে, যে করেই হোক সামলে ওঠা যাবে'—বলল গুস্তিয়েরের কথা ভেবে।

তারপর চিৎকার করে খালাসিদের হুকুম দিলে পাল নামিয়ে নিত। নোঙর ফেলে ঢেউয়ে দুলতে লাগল 'জেলি-মাছ'।

'একটা শেকল আনো আর খোল থেকে লোকটাকে নিয়ে এসো'—হুকুম দিল জুরিতা। মুক্তো সংগ্রহে ইকথিয়ান্ডরের কৃতিত্ব সে যত তাড়াতাড়ি পারে পরখ করে দেখতে চাইছিল।

'সেই সঙ্গে ও তাজাও হয়ে উঠবে সমুদ্রে'—ভাবল সে।

দুইজন রেড-ইন্ডিয়ানের পাহারায় এসে দাঁড়াল ইকথিয়ান্ডর। বেশ কাহিল দেখাচ্ছিল তাকে। এপাশে-ওপাশে চেয়ে দেখল সে। মাত্র কয়েক পা দূরে জাহাজের রেলিংটা। হঠাৎ সামনে ছুটে গেল ইকথিয়ান্ডর, রেলিং টপকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় জুরিতার প্রচণ্ড ঘুষি নেমে এল তার মাথায়। অচৈতন্য হয়ে ডেকে লুটিয়ে পড়ল সে।

'তাড়াহুড়ো করা ভালো নয়'—গুরুমশায়ী ঢঙে বললে জুরিতা।

লোহার ঝনঝন শোনা গেল। লম্বা, সরু একটা লোহার শেকল দেওয়া হল জুরিতাকে, তার শেষ প্রান্তে লোহার একটা কড়া।

অচৈতন্য ইকথিয়ান্ডরের কোমরে কড়াটা পরিয়ে তালা লাগিয়ে জুরিতা বলল খালাসিদের:

'এবার জল ঢালো ওর মাথায়।'

শিগগিরই জ্ঞান ফিরল ইকথিয়ান্ডরের, হতভম্বের মতো সে চাইল তার কোমরে বাঁধা শেকলটার দিকে।

'এতে তুমি পালাতে পারবে না আমার কাছ থেকে'—বুঝিয়ে বলল জুরিতা, 'তোমায় সমুদ্র নামিয়ে দিচ্ছি। আমার জন্যে তুমি মুক্তোভরা ঝিনুক খুঁজে আনবে। মুক্তো যত বেশি হবে, জলেও থাকতে পাবে তত বেশি। মুক্তো যদি না আনো, তাহলে জাহাজের খোলে

আটকে রাখব তোমায়, পিপেতে বসে থাকবে। বুঝেছ তো? রাজি?'

মাথা নাড়ল ইকথিয়াস্তর।

সমুদ্রের নির্মল জলে তাড়াতাড়ি ডুবতে পারলে সে জুরিতার জন্য সাগরের সমস্ত রতনই এনে দিতে রাজি।

জুরিতা, শেকলে বাঁধা ইকথিয়াস্তর আর খালাসিরা এল ডেকের রেলিংয়ের কাছে। গুত্তিয়েরের কেবিনটা ছিল জাহাজের অন্য পাশে। ইকথিয়াস্তরকে শেকলে বাঁধা অবস্থায় সে দেখবে, এটা জুরিতা চায় নি।

শেকল সমেত সমুদ্রে নেমে গেল ইকথিয়াস্তর। আহ্, শুধু এই শেকলটাকে যদি কোনো রকম ছেঁড়া যেত! কিন্তু খুবই শক্ত শেকল। নিজের ভাগ্যকেই মেনে নিল ইকথিয়াস্তর। মুক্তোভরা ঝিনুক খুঁজে খুঁজে সে তা জমাতে লাগল তার পাঁজরায় বাঁধা বড়ো থলিটায়। লোহার কড়াটায় চাপ পড়ছিল পাঁজরে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তাহলেও গুমোট খোলা আর দুর্গন্ধে ভরা পিপেটার পর প্রায় সৌভাগ্যবান বলেই নিজেকে মনে হল তার।

জাহাজের ওপর থেকে অভূতপূর্ব এক দৃশ্য দেখছিল খালাসিরা। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে, অথচ ফেরবার নামও করছে না ডুবুরি। প্রথম দিকটায় বাতাসের বুদ্বুদ ভেসে উঠছিল জলের ওপরে, কিন্তু শিগগিরই সেটাও বন্ধ হয়ে গেল।

'বাজি রেখে বলছি, বুকের ভেতর ওর আর এক বিন্দু দমও থাকার কথা নয়, নইলে যেন হাঙ্গরেই আমায় খায়। এ যে দেখছি মানুষ নয়, মাছ'—জলের দিকে তাকিয়ে, অবাক হয়ে বলছিল পুরনো এক ডুবুরি। সমুদ্রের তলদেশে ইকথিয়াস্তরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে।

'এই হয়তো সেই 'দরিয়ার দানো?' আস্তে করে বললে একজন খালাসি।

'যাই হোক খাসা মাল জুটিয়েছে ক্যাপ্টেন জুরিতা'—বললে হেড মেট, 'একজন এই রকম ডুবুরিতে দশ জনার কাজ হয়ে যাবে।'

ওপরে ওঠার জন্য ইকথিয়াস্তর যখন শেকলে টান দিলে, সূর্য তখন মাঝ আকাশে গড়িয়ে এসেছে। থলি তার ঝিনুকে বোঝাই। মুক্তো খোঁজা চালিয়ে যেতে হলে সেটা খালি করা দরকার।

চটপট খালাসিরা ডেকে তুলে নিলে অসাধারণ এই ডুবুরিকে। সংগ্রহটা কেমন হল দেখবার জন্য কারো আর তর সইছিল না।

মুক্তোভরা ঝিনুক সাধারণত দিন কতক ফেলে রেখে পচানো হয়, ঝিনুক খোলা সহজ হয় তাতে। কিন্তু এখন মাঝিমাল্লা এবং খোদ জুরিতার ধৈর্য আর বাগ মানছিল না। সবাই ছুরি দিয়ে লেগে গেল ঝিনুক খুলতে।

কাজ শেষ হতেই কলরব করে আলাপ শুরু হয়ে গেল। অসম্ভব একটা চাঞ্চল্য জাগল ডেকে। সৌভাগ্যক্রমে মুক্তো পাবার মতো একটা ভালো জায়গা হয়তো পেয়ে গিয়েছিল ইকথিয়াস্তর। কিন্তু এক ডুবেই যা সে তুলে এনেছে, তা অপ্রত্যাশিত। এর মধ্যে গোটা বিশেক মুক্তো খুব ভারি, চমৎকার তাদের গড়ন, আশ্চর্য নরম তাদের রঙ। প্রথম দফাতেই বড়োলোক হয়ে উঠেছে জুরিতা। একটি বড়ো মুক্তোর দামেই সে নতুন একটা চমৎকার জাহাজ কিনতে পারে। ঐশ্বর্যের পথ খুলে গেছে জুরিতার সামনে। স্বপ্ন তার সার্থক হচ্ছে।

কী রকম লোলুপ দৃষ্টিতে খালাসিরা মুক্তোগুলো দেখছিল সেটা চোখে পড়ল জুরিতার। ব্যাপারটা তার ভালো ঠেকল না। তাড়াতাড়ি মুক্তোগুলো নিজের স্ট্র-হ্যাটে কুড়িয়ে রেখে সে বলল:

'খাওয়ার সময় এখন। আর তুমি ইকথিয়াস্তর, খাসা শিকারি তুমি। খালি একটা কেবিন আছে আমার। সেখানে তুমি থাকবে। গুমোট নয় জায়গাটা আর তোমার জন্যে বড়ো একটা টিনের চৌবাচ্চার বরাত দেব। তবে হয়তো তার তেমন দরকার হবে না, কেননা প্রত্যেক দিনই তো তুমি সমুদ্রে সাঁতরাবে। অবিশ্যি শেকল-বাঁধা হয়ে, কিন্তু কী করা যাবে? নইলে যে তুমি তোমার কাঁকড়াগুলোর কাছে গিয়ে আসর জমাবে, ফিরবে না।'

জুরিতার সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছে ছিল না ইকথিয়াস্তরের। কিন্তু যখন সে এই লোভী মানুষটার বন্দি হয়ে পড়েছে। তখন নিজের থাকার ব্যবস্থাটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। বলল:

'পিপের চেয়ে চৌবাচ্চা ভালো, তবে খাবি খেতে না হলে ঘন ঘনই তার জল বদলাতে হবে।'

কী রকম ঘন ঘন? জিজ্ঞেস করল জুরিতা।

'আধ ঘণ্টা অন্তর'—বলল ইকথিয়াস্তর, 'আরো ভালো হয় অবিরাম স্রোতের ব্যবস্থা থাকলে।'

'বটে, গুমর তোমার বেড়ে গেল দেখছি। একটু তারিফ করতে না করতেই যত রকম বায়না।'

'বায়না'—রেগে উঠল ইকথিয়াস্তর, 'আমার যে...বুঝতে পারছেন না কেন?' বড়ো একটা মাছকে যদি বালতিতে রেখে দেন, শিগগিরই তা মরে যাবে। মাছ নিশ্বাস নেয় জলের অক্সিজেন থেকে। আর আমি...আমি তো একটা প্রকাণ্ড মাছই'—হেসে যোগ দিল ইকথিয়াস্তর।

'অক্সিজেনের ব্যাপার-ট্যাপার জানি না, তবে জল না বদলালে মাছ যে মরে যায় সেটা আমার জানা আছে। তা কথাটা তোমার সত্যি। কিন্তু তোমার চৌবাচ্চায় দিন-রাত জল পাম্প করার জন্যে যদি লোক রাখতে হয়, তাহলে খরচ অনেক, তোমার মুক্তোগুলোর দামেও কুলোবে না। এভাবে আমাকে দেউলিয়া করে দেবে দেখছি!'

মুক্তোর দাম কেমন সেটা ইকথিয়াস্তর জানত না, এ-ও জানত না যে ডুবুরি খালাসিদের জুরিতা বেতন দেয় নগণ্য। তাই জুরিতার কথা বিশ্বাস করে সে বলে উঠল:

'আমায় এখানে রাখলে যদি আপনার অসুবিধা হয়, তাহলে সমুদ্রে ছেড়ে দিন।' সমুদ্রের দিকে চাইল ইকথিয়াস্তর।

'বলো কী!' সশব্দে হেসে উঠল জুরিতা।

'সত্যি বলছি, ছেড়ে দিন। নিজেই আমি মুক্তো নিয়ে আসব। অনেক দিন আগে এই এত মুক্তো জড়ো করেছিলাম'—হাত দিয়ে নিজের হাঁটু পর্যন্ত দেখাল ইকথিয়াস্তর, 'নিটোল চিকন গা, বরবটির বিচির মতো বড়ো বড়ো। সব আমি আপনাকে দিয়ে দেব, শুধু ছেড়ে দিন আমায়।'

জুরিতার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

'বাজে কথা যত সব'—সন্দেহ প্রকাশ করল জুরিতা, চেষ্টা করল শান্ত থাকার।

'জীবনে আমি কখনো মিছে কথা বলি নি'—চটে উঠল ইকথিয়াস্তর।

'কোথায় তোমার এই গুপ্তধন?' এবার আর উত্তেজনা না চেপেই জিজ্ঞেস করলে জুরিতা।

'সমুদ্রতলের গুহায়। লিডিঙ ছাড়া কেউ জানে না জায়গাটা।'

'লিডিঙ! সে আবার কে?'

'আমার ডলফিন।'

'বটে!'

'সত্যিই ভারি গোলমেলে ব্যাপার'—ভাবল জুরিতা। 'কথাটা যদি সত্যি হয়, আর ছেলেটা মিথ্যে বলছে না বলেই মনে হয়, তাহলে এটা যে তার সমস্ত কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আশাতীত বড়োলোক হয়ে যাব আমি। রথশিল্ড আর রকফেলাররা তো আমার তুলনায় তখন ভিখিরি। ছেলেটাকে বিশ্বাস করা যায় বলেই তো মনে হচ্ছে। সত্যিই ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে দেখলে হয় না?'

কিন্তু জুরিতা কারবারি লোক। কারো কথায় বিশ্বাস করা তার অভ্যেস নয়। ইকথিয়াস্তরের এই ধন কীভাবে আত্মসাৎ করা যায় তার ফন্দি আঁটতে লাগল সে। 'শুধু গুত্তিয়েরে যদি ইকথিয়াস্তরকে অনুরোধ করে, তাহলে সে আপত্তি করবে না, মুক্তোগুলো নিয়ে আসবে।'

'সম্ভবত আমি তোমায় ছেড়ে দেব'—বললে জুরিতা, কিন্তু কিছুটা সময় তোমায় থাকতে হবে আমার কাছে। হ্যাঁ, তার কারণ আছে। আর আমার ধারণা, থাকলে আফসোস করবে না। আপাতত যখন তুমি আমার পরাধীন হলেও অতিথি, তখন আমি তোমার জন্যে কিছু আরামের ব্যবস্থা করতে চাই। চৌবাচ্চাটায় খুবই খরচা পড়বে, তার চেয়ে বরং আমি

তোমার জন্যে একটা মস্ত লোহার খাঁচার ব্যবস্থা করব। তাতে হাঙরে কামড়াতে পারবে না, খাঁচা সমেত তোমায় সাগরে নামিয়ে দেব।'

'কিন্তু হাওয়াতে থাকাও যে আমার দরকার।'

'বেশ তো, মাঝে মাঝে তুলে আনব। চৌবাচ্চায় জল পাম্প করার চাইতে তাতে সস্তা পড়বে। মোট কথা, সব ব্যবস্থা করে দেব, তোমার নালিশ থাকবে না।'

জুরিতার মেজাজ হয়ে উঠল শরীফ। কখনো যা হয় নি, হুকুম দিলে খাবার সময় এক পাত্র করে মদ দেওয়া হোক খালাসিদের।

ফের জাহাজের খোলে নিয়ে যাওয়া হল ইকথিয়াণ্ডরকে, চৌবাচ্চা তখনো তৈরি হয় নি। বেশ আন্দোলিত হৃদয়েই নিজে কেবিনের দরজা খুললে জুরিতা। দরজায় দাঁড়িয়ে মুক্তোভরা টুপিটা দেখালে গুত্তিয়েরেকে।

'আমার প্রতিশ্রুতি আমি ভুলি নি'—হাসতে শুরু করলে সে, বৌ আমার মুক্তো ভালোবাসে, উপহার ভালোবাসে। অনেক মুক্তো পেতে হলে দরকার ভালো ডুবুরি। সেই জন্যেই বন্দি রেখেছি ইকথিয়াণ্ডরকে। এই দ্যাখো, একদিনের কাজ!'

চকিতে চোখ বুলিয়ে নিলে গুত্তিয়েরে। আপনা থেকেই বেরিয়ে আসা বিস্ময়ের অস্ফুট ধ্বনিটা তাকে চাপতে হল বহু কষ্টে। তবে প্রতিক্রিয়াটা জুরিতার চোখে পড়েছিল, আত্মতৃপ্তিতে হেসে উঠল সে :

'তুমি হবে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে ধনী মহিলা, হয়তো-বা গোটা আমেরিকায়। যা চাইবে সব পাবে। এমন প্রাসাদ বানাব তোমার জন্যে যে রাজরাজড়ারাও হিংসে করবে। আর এখন ভবিষ্যতের আগাম হিশেবে মুক্তোগুলোর অর্ধেকটা তুমি নাও।

'না, পাপ করে পাওয়া এই মুক্তোর একটিতেও আমার প্রয়োজন নেই'—কড়া করে বলল গুত্তিয়েরে, দয়া করে আমায় শান্তিতে থাকতে দিন।'

বিব্রত ও বিরক্ত হয়ে উঠল জুরিতা। এমন সম্বোধন সে আশা করে নি।

'আরো দুটো কথা। আমি ইকথিয়াণ্ডরকে ছেড়ে দিই, এটা কি আপনি চান না?' গুরুত্ব দেবার জন্য সে আপনি করে বলল।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে জুরিতার দিকে তাকাল গুত্তিয়েরে, আন্দাজ করতে চাইল নতুন কী মতলব সে ভেজেছে। ঠাণ্ডা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'অতঃপর?'

'ইকথিয়াণ্ডরের ভাগ্য আপনারই হাতে। জলের তলে ও কোথায় যে সব মুক্তো জমিয়ে রেখেছে সেগুলো 'জেলি-মাছ' জাহাজে ও এনে দিক—এই কথাটুকু যদি আপনি বলেন তাহলেই 'দরিয়ার দানো'কে আমি একেবারে মুক্তি দিয়ে দেব।'

'আমার কথাটা ভালো করে শুনে রাখুন। আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না।'

মুক্তোগুলো নিয়ে আপনি ফের ইকথিয়াণ্ডরকে শেকলে বাঁধবেন। আমি যে সবচেয়ে এক মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতকের স্ত্রী—এটা যেমন অভ্রান্ত, আমার এই কথাটাও তেমনি। ভালো করে শুনে রাখুন, আপনার নোংরা ব্যাপারে আমায় জড়াবার চেষ্টা আর কখনো করতে আসবেন না। তাছাড়া আবার বলছি, দয়া করে আমায় শান্তিতে থাকতে দিন।'

এরপর আর কথা চলে না, জুরিতা বেরিয়ে গেল। নিজের কেবিনে এসে সে মুক্তোগুলো থলিতে ভরে সন্তর্পণে রেখে দিলে সিন্দুকে। তারপর তালাবদ্ধ করে বেরিয়ে এল ডেকে। বৌয়ের সঙ্গে আলাপটায় তার তেমন ক্ষোভ হয় নি। নিজেকে সে দেখতে পাচ্ছিল ধনবান, মান-মর্যাদায় ভূষিত।

ক্যাপ্টেনের মঞ্চে উঠে সে চুরুট ধরালে। ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্যের প্রীতিকর ভাবনায় সে তখন বিভোর। আর দৃষ্টি তার বরাবর তীক্ষ্ণ হলেও এবার তার নজর এড়িয়ে গেল যে খালাসিরা দলে দলে জুটে কী নিয়ে যেন জটলা করছে চুপিচুপি।

পরিত্যক্ত 'জেলি-মাছ'

ডেকে সামনের মাস্তুলটার সামনে দাঁড়িয়েছিল জুরিতা, এমন সময় হেড মেটের ইঙ্গিতে জনা কয়েক খালাসি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। অস্ত্র ছিল না তাদের হাতে, তবে সংখ্যায় তারা অনেক। কিন্তু জুরিতাকে কাবু করা তাদের পক্ষে তেমন সহজ হল না। পেছন থেকে দু'জন খালাসি আঁকড়ে ধরেছিল তাকে, ভিড়টা থেকে বেরিয়ে এসে জুরিতা কয়েকপা ছুটে গিয়ে আপ্রাণ শক্তিতে পিঠ দিয়ে ধাক্কা মারল রেলিংয়ে।

ককিয়ে উঠে খালাসি দুটো শিকার ছেড়ে লুটিয়ে পড়ল ডেকের ওপর। সিধে হয়ে জুরিতা ঘুষি চালিয়ে নতুন হামলা ঠেকাতে লাগল। রিভলবার সে কখনো হাতছাড়া করত না। কিন্তু আক্রমণটা হয় এমনি আচমকা যে সেটা সে বার করে ওঠার ফুরসত পায় নি। ধীরে ধীরে সে পেছুতে লাগল সামনের মাস্তুলটার দিকে, তারপর হঠাৎ বানরের মতো ক্ষিপ্রতায় উঠতে লাগল মাস্তুল বেয়ে।

একজন খালাসি তার ঠ্যাং চেপে ধরেছিল কিন্তু আলগা পা-টা দিয়ে জুরিতা এমন লাথি কষলে তার মাথায় যে লোকটা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ডেকটায়। কোনোক্রমে ওপরে উঠে বসল জুরিতা। খিস্তি করতে লাগল মরিয়ার মতো। এখানে সে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। রিভলবার বার করে সে হাঁকল :

'প্রথম যে ওপরে ওঠার সাহস করবে তার খুলি উড়িয়ে দেব।'

খালাসিরা কলরব করতে লাগল নিচে, আলোচনা করতে লাগল কী করা যায়।

'ক্যাপ্টেনের কেবিনে বন্দুক আছে। সবার গলা ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হেড মেট, 'চল যাই, দুয়োর ভেঙে ফেলি।

কিছু খালাসি ছুটল হ্যাচ-ওয়ের দিকে।

'এবার খতম'—ভাবলে জুরিতা, 'গুলি করেই মারবে।'

হতাশ হয়ে সাহায্যের আশায় সমুদ্রের দিকে চাইলে জুরিতা। আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার, দেখা গেল সমুদ্রের জল কেটে অসম্ভব দ্রুতগতিতে 'জেলি-মাছ' জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে একটা সাবমেরিন।

'শুধু যেন আবার ডুবতে শুরু না করে।' মনে মনে প্রার্থনা করলে জুরিতা। 'ডেকে লোক দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে কি আর লক্ষ করবে না, পাশ দিয়ে চলে যাবে?'

'বাঁচাও! জলদি! আমাকে খুন করবে!' প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল জুরিতা।

সাবমেরিনের লোকগুলো নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিল তাকে। গতি না কমিয়ে তা সোজা এগিয়ে আসতে লাগল 'জেলি-মাছ' জাহাজের দিকে।

সশস্ত্র খালাসিরা ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছিল। ডেকে ছড়িয়ে পড়ে অনিশ্চিতের মতো থেমে গেল তারা। 'জেলি-মাছ' জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে সশস্ত্র সাবমেরিন—সম্ভবত জঙ্গী।

অনাহূত এই সাক্ষীদের সামনে তো আর জুরিতাকে খুন করা চলে না।

উল্লসিত হয়ে উঠল জুরিতা। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী উল্লাস। সাবমেরিনের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস্টো আর বালতাজার। সঙ্গে কে একজন ঢ্যাঙা লোক—হিংস্র তার নাক, চোখদুটো ঈগলের মতো। ডেক থেকে তিনি চেঁচিয়ে বললেন :

'পেদ্রো জুরিতা। অপহৃত ইকথিয়ান্ডরকে অবিলম্বে সমর্পণ করুন। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, অন্যথায় আপনার জাহাজ ডুবিয়ে দেব।'

'বিশ্বাসঘাতক ব্যাটারা! আক্রোশে ক্রিস্টো আর বালতাজারের দিকে তাকিয়ে ভাবলে জুরিতা। তবে নিজের মাথা খোয়ানোর চেয়ে বরং ইকথিয়ান্ডরকে হারানো ভালো।

'এক্ষুণি এনে দিচ্ছি ওকে'—মাস্তুল বেয়ে নামতে নামতে বললে জুরিতা।

খালাসিরাও ততক্ষণে বুঝে গেছে চাচা আপন বাঁচা। ঝটপট নৌকো নামালে তারা, কেউ কেউ জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতরাতে লাগল তীরের দিকে। প্রত্যেকেই তখন যে যার জান বাঁচাতে ব্যস্ত। মই বেয়ে ছুটে নেমে জুরিতা ঢুকল তার কেবিনে, তাড়াতাড়ি মুক্তোভরা থলিটা নিয়ে শার্টের তলে গুঁজলে, সঙ্গে নিলে কয়েকটা বেল্ট আর রুমাল। পরের মুহূর্তে সে ঢুকল গুত্তিয়েরের কেবিনে, গুত্তিয়েরেকে আঁকড়ে ধরে তুলে নিয়ে এল ডেকে :

'ইকথিয়ান্ডর একটু অসুস্থ, ও রয়েছে কেবিনে'—গুত্তিয়েরেকে হাতছাড়া না করেই বললে জুরিতা। ডেকের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে সে গুত্তিয়েরেকে নৌকোয় বসিয়ে নামিয়ে দিল জলে, তারপর নিজে লাফিয়ে পড়ল তাতে।

নৌকোটাকে অনুসরণ করা সাবমেরিনের পক্ষে তখন আর সম্ভব ছিল না, জল ছিল খুবই অগভীর। কিন্তু ডেকে বালতাজারকে দেখতে পেয়েছিল গুত্তিয়েরে।

'বাবা, ইকথিয়ান্ডরকে বাঁচাও! সে আছে...' কথাটা শেষ করতে পারল না গুত্তিয়েরে।

জুরিতা ততক্ষণে তার মুখে রুমাল গুঁজে বেল্ট দিয়ে তার হাত বাঁধতে শুরু করে দিয়েছিল।

'ছেড়ে দিন মহিলাকে!' ব্যাপার দেখে হাঁক দিলেন সালভাতর।

'এ মহিলা আমার স্ত্রী, আমার ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার কারো নেই।' জবাবে হাঁকল জুরিতা, এবং দ্রুত দাঁড় বাইতে লাগল।

'নারীর প্রতি এ রকম আচরণের অধিকারও কারো নেই!' চটে উঠে চেঁচালেন সালভাতর, নৌকো থামান নইলে গুলি করব!'

কিন্তু দাঁড় বাওয়া থামাল না জুরিতা।

রিভলবার ছুঁড়লেন সালভাতর। গুলি লাগল নৌকোর গায়ে।

জুরিতা গুত্তিয়েরেকে সামনে ঠেলে দিয়ে তার আড়ালে থেকে চেঁচাল :

'গুলি চালাবেন, চালিয়ে যান-না!'

তার কবলের ভেতর ছটফট করছিল গুত্তিয়েরে।

'রাম পাষণ্ড!' রিভলবার নামিয়ে মন্তব্য করলেন সালভাতর।

সাবমেরিনের ডেক থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বালতাজার, চেষ্টা করল সাঁতরে নৌকোর পাল্লা ধরতে। কিন্তু জুরিতা ততক্ষণে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। কয়েকবার দাঁড় টানতেই ঢেউয়ের তোড়ে নৌকো গিয়ে পড়ল বালুময় তীরে। গুত্তিয়েরেকে টানতে টানতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল তীরের পাথরগুলো পেছনে।

জুরিতার পাল্লা ধরা যাবে না দেখে বালতাজার সাঁতরে এল জাহাজটার কাছে, নোঙরের শেকল বেয়ে উঠে গেল ডেকে। মই বেয়ে নেমে সে সর্বত্র খুঁজে বেড়ালে ইকথিয়ান্ডরকে।

জাহাজের খোল পর্যন্ত সবকিছু সে দেখল। কাউকেই পাওয়া গেল না। সালভাতরকে সে চেঁচিয়ে বলল :

'ইকথিয়ান্ডর জাহাজে নেই!'

'কিন্তু সে তো বেঁচেই আছে, এইখানেই কোথাও তার থাকার কথা। গুত্তিয়েরে যে বলল, 'ইকথিয়ান্ডর আছে...' ডাকাতটা ওর মুখ বন্ধ না করে দিলে জানা যেত কোথায় খুঁজতে হবে'—বলল ক্রিস্টো।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রিস্টো লক্ষ করল এক জায়গায় একটা মাস্তুলের ডগা উঁচিয়ে আছে। নিশ্চয় এখানে কোনো জাহাজডুবি হয়েছে কিছু দিন আগে। ইকথিয়ান্ডর কি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয় নি?

'ডুবো জাহাজের ধনসম্পদ খোঁজার জন্যে হয়তো ওখানে ইকথিয়ান্ডরকে পাঠিয়েছে জুরিতা!' বলল ক্রিস্টো।

প্রান্তে কড়া লাগানো শেকলটা পড়েছিল ডেকে। বালতাজার টেনে তুলল সেটাকে।

'বোঝা যাচ্ছে জুরিতা ইকথিয়ান্ডরকে সমুদ্রে ছাড়ত এই শেকলে বেঁধে। শেকল না থাকলে ইকথিয়ান্ডর নিশ্চয় সাঁতরে পালাত। না, ডোবা জাহাজটায় ও নেই।'

'ঠিকই, নেই ওখানে'—চিন্তিতভাবে বললেন সালভাতর, 'জুরিতার ওপর জিতলাম বটে, কিন্তু ইকথিয়ান্ডরকে পাওয়া গেল না।'

মগ্ন জাহাজ

সেদিন সকালে 'জেলি-মাছ' জাহাজে কী ঘটেছিল, জুরিতার অনুসরণকারীরা সেটা জানত না।

সারা রাত সেদিন গুজগুজ চলে খালাসিদের মধ্যে, সকালের দিকে ঠিক হয় প্রথম সুযোগেই জুরিতাকে আক্রমণ করে খুন করা হবে, দখল করবে জাহাজ সমেত ইকথিয়াণ্ডরকে।

ভোর হতেই জুরিতা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার মঞ্চে। বাতাস মরে এসেছিল, খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল 'জেলি-মাছ'।

সাগরের কোনো একটা বিন্দুর দিকে চেয়েছিল জুরিতা। দুরবিন দিয়ে সে দেখছিল ডোবা জাহাজটার রেডিও-মাস্তুল। অচিরেই তার চোখে পড়ল একটা লাইফ বেল্ট ভাসছে। বোট নামিয়ে বেল্টটা তুলে আনার হুকুম দেয় জুরিতা।

দেখা গেল বেল্টটায় 'মাফাল্‌ডু' জাহাজের নাম লেখা। "মাফাল্‌ডু" ডুবেছে? অবাক হল জুরিতা। মস্ত এই ডাক ও যাত্রীবাহী মার্কিন জাহাজটা তার অজানা নয়। অনেক সোনাদানা তাতে থাকার কথা। 'সেগুলো উদ্ধার করার জন্যে ইকথিয়াণ্ডরকে লাগালে কেমন হয়? কিন্তু শেকলটা কি লম্বায় কুলুবে? মনে হয় না...আর ইকথিয়াণ্ডরকে যদি বিনা শেকলে ছাড়া হয়, সে আর ফিরবে না...'

ভাবতে লাগল জুরিতা। একদিকে লোভ আরেকদিকে ইকথিয়াণ্ডরকে হারাবার ভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধল তার।

ধীরে ধীরে উঁচিয়ে থাকা মাস্তুলটার কাছে এল 'জেলি-মাছ'।

ডেকে ভিড় করে এল খালাসিরা। একেবারে মরে গেল বাতাস। থেমে গেল 'জেলি-মাছ'।

'আমি একসময় 'মাফাল্‌ডু' জাহাজে কাজ করতাম'—বলল একজন মাল্লা, 'দিব্যি মস্ত জাহাজ। যেন পুরো একটা শহর। প্যাসেঞ্জাররা সব বড়োলোক আমেরিকান।'

'বোঝা যাচ্ছে, বিপদের কথা বেতারে জানাবার সুযোগ পায় নি 'মাফাল্‌ডু'—ভাবল জুরিতা। 'হয়তো রেডিও ট্রান্সমিটার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে আশেপাশের বন্দর থেকে এতক্ষণে ছুটে আসত যত লঞ্চ, স্পিডবোট, ইয়ট, জুটত যত অফিসার, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, ক্যামেরাম্যান, ডুবুরি। সুতরাং দেরি করা উচিত নয়। শেকল ছাড়াই ইকথিয়াণ্ডরকে ছাড়তে হবে দেখছি। অন্য কোনো উপায় নেই। কিন্তু কী করে ওকে ফেরানো যায়? ঝুঁকি যদি নিতেই হয়, তাহলে ওর মুক্তিপণ হিশেবে সেই মুক্তোর সংগ্রহটা আনবার জন্যে পাঠানোই কি ভালো হবে না? কিন্তু সত্যিই কি অত দামী হবে মুক্তোগুলো? ইকথিয়াণ্ডর কি বাড়িয়ে বলছে না?

'অবিশ্যি মুক্তোগুলো আর 'মাফাল্‌ডু'র সোনাদানা দুই-ই হস্তগত করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। মুক্তোর সংগ্রহটা পালিয়ে যাচ্ছে না। ইকথিয়াণ্ডর ছাড়া তা খুঁজে পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়, শুধু ইকথিয়াণ্ডরকে জুরিতার হাতে রাখতে পারলেই হল। কিন্তু 'মাফাল্‌ডু'র সম্পদ

হয়তো দিন কয়েক, হয়তো ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাহলে 'মাফাল্‌ডু'-কেই প্রথম ধরা যাক'—স্থির করল সে। হুকুম দিল নোঙর ফেলতে। তারপর কেবিনে গিয়ে কী একটা চিরকুট লিখে চলে গেল ইকথিয়ান্ডরের কেবিনে।

'তুমি তো পড়তে পারো ইকথিয়ান্ডর, তাই না? গুত্তিয়েরে তোমায় এই চিঠি পাঠিয়েছে।' দ্রুত চিরকুটটা নিয়ে পড়ল ইকথিয়ান্ডর :

'ইকথিয়ান্ডর! আমার একটা অনুরোধ রাখো। 'জেলি-মাছ' জাহাজের কাছেই একটা জাহাজ ডুবে রয়েছে। ডুব দিয়ে জাহাজে মূল্যবান যা কিছু আছে নিয়ে এসো। বিনা শেকলেই জুরিতা তোমায় ছেড়ে দেবে, 'জেলি-মাছ' জাহাজে তোমায় ফিরে আসতে হবে কিন্তু। আমার জন্যে এটা তুমি করে দাও ইকথিয়ান্ডর, তাহলে শিগগির ছাড়া পাবে তুমি। —গুত্তিয়েরে।'

গুত্তিয়েরের কাছ থেকে কখনো কোনো চিঠি পায় নি ইকথিয়ান্ডর, তার হাতের লেখা সে চিনত না। চিঠি পেয়ে তার খুবই আনন্দ হয়েছিল সত্যি, কিন্তু কেমন ভাবনা হল।

জুরিতার কোনো চাল নয়ত?

'গুত্তিয়েরে নিজে এসে বলল না কেন?' চিরকুটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ইকথিয়ান্ডর।

'ও একটু অসুস্থ'—বলল জুরিতা, 'তবে তুমি ফিরে এলেই ওকে দেখতে পাবে।'

'এসব ধনসম্পদের কী দরকার পড়ল গুত্তিয়েরের?' তখনো অবিশ্বাস তার যায় নি।

'তুমি যদি স্বাভাবিক মানুষ হতে তাহলে অমন প্রশ্ন করতে না। কোন্ মেয়েই-বা না চায় যে ভালো পোশাক-আশাক, দামী গয়না পরবে? আর তার জন্যে দরকার টাকা। আর ডোবা জাহাজটায় টাকাকড়ি আছে অনেক। এখন কেউ তার মালিক নয়। তাহলে গুত্তিয়েরের জন্যে তুমিই-বা তা নেবে না কেন? প্রধান কথা, সোনার মোহরগুলো খুঁজে বার করা দরকার। নিশ্চয় ডাকবিভাগের চামড়ার থলিতে তা থাকবে। তাছাড়া যাত্রীদের কাছেও সোনার জিনিসপত্র আংটি-ফাংটি থাকতে পারে...'

'ভেবেছেন আমি আবার লাশও ঘাঁটতে যাব?' সরোষে জিজ্ঞেস করল ইকথিয়ান্ডর, 'তাছাড়া মোটেই আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি না। গুত্তিয়েরে লোভী মেয়ে নয়, এমন কাজে পাঠাতে সে আমায় পারে না...'

'আ ম'লো ছাই!' ক্ষেপে উঠেছিল জুরিতা। তবে টের পেলে এক্ষুণি ইকথিয়ান্ডরকে নিঃসন্দেহ করতে না পারলে তার চাল ফেঁসে যাবে।

তখন আত্মসম্বরণ করে সে ভালোমানুষি হাসি হাসল। বলল :

'না, তোমায় দেখছি ধাপ্পা দেওয়া যাবে না। তাহলে খোলাখুলিই বলা যাক, শোনো। 'মাফাল্‌ডু'র সোনাদানা পেতে চায় গুত্তিয়েরে নয়, আমি। এটা বিশ্বাস করো?'

হেসে উঠল ইকথিয়ান্ডর, 'ষোলো আনা!'

'ভালো কথা। আমায় যখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছ, তখন আমাদের মধ্যে বোঝাবুঝি করে নিতে অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, আমার দরকার সোনা। 'মাফাল্‌ডু' জাহাজের সোনাদানার দাম যদি হয় তোমার ওই মুক্তোগুলোর মতোই, তাহলে ও সোনা এনে দেওয়া মাত্রই তোমায় ছেড়ে দেব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই : তুমি আমায় পুরো বিশ্বাস করো না, আমিও তোমায় করি না। আমার ভয় আছে, শেকল ছাড়া তোমায় ছেড়ে দিলে তুমি সেই যে ডুব দেবে...'

'কথা দিলে আমি তা রাখি।'

'তাতে নিঃসন্দেহ হবার মতো সুযোগ আমার এখনো হয় নি। আমায় তুমি পছন্দ করো না, তাই কথা না রাখলে আমি অবাক হবো না। কিন্তু গুত্তিয়েরেকে তুমি ভালোবাস, সে

অনুরোধ করলে তুমি তা রাখবে। ঠিক কিনা? তাই ওর সঙ্গে কথা বলি আমি। বলাই বাহুল্য যে ও খুব চায় যে আমি তোমায় ছেড়ে দিই। তাই ও চিঠিটা লিখে আমায় দেয়, তোমার মুক্তির পথ যাতে সহজ হয়। এবার বুঝলে?'

জুরিতা যা বলল, সেটা ইকথিয়ান্ডরের কাছে মনে হল বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্য। তবে ইকথিয়ান্ডর এটা খেয়াল করে নি যে জুরিতা তাকে মুক্তি দেবার কথা দিচ্ছে কেবল তখন, যখন সে দেখবে 'মাফাল্ডু'র সোনাদানার দাম তার মুক্তোগুলোর চেয়ে কম নয়।

নিজের মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল জুরিতা : 'দামের তুলনা করতে হলে মুক্তোগুলো না দেখলে চলে কী করে—সেগুলো এনে দেবার দাবি করব ইকথিয়ান্ডরের কাছে। তখন মুক্তো, সোনা, ইকথিয়ান্ডর সবই থেকে যাবে আমার হাতে।

কিন্তু জুরিতা কী ভাবছিল সেটা ইকথিয়ান্ডরের জানার কথা নয়। জুরিতার খোলাখুলি কথায় তার সন্দেহ ঘোচে, একটু ভেবে রাজি হয়ে যায় ইকথিয়ান্ডর।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জুরিতা।

মনে মনে ভাবল, 'নিশ্চয় কথার খেলাপ করবে না ও।' বলল :

'চলো যাই, জলদি!'

দ্রুত ডেকে উঠে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল ইকথিয়ান্ডর।

বিনা শেকলে ইকথিয়ান্ডরকে সমুদ্রে ডুব দিতে দেখেছিল খালাসিরা। সঙ্গে সঙ্গেই তারা বুঝল যে ইকথিয়ান্ডর যাচ্ছে 'মাফাল্ডু' জাহাজের সোনাদানা উদ্ধারের জন্য। 'মাফাল্ডু' জাহাজের সমস্ত সম্পদ কি কেবল একা জুরিতার ভোগে যাবে? দেরি করার আর সময় ছিল না, সঙ্গে সঙ্গেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে জুরিতার ওপর।

খালাসিরা যখন আক্রমণ করছিল জুরিতাকে, ইকথিয়ান্ডর তখন ডোবা জাহাজটা পরীক্ষা করতে থাকে।

ওপরের ডেকের প্রকাণ্ড হ্যাচ-ওয়ে দিয়ে সে নেমে আসে নিচে, মইটা এক প্রকাণ্ড বাড়ির সিঁড়ির মতো। পৌঁছল সে একটা চওড়া করিডোর। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। শুধু খোলা দরজাগুলোর মধ্য দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়ছিল।

এমন একটা দরজা দিয়ে ঢুকে ইকথিয়ান্ডর পৌঁছল সেলুনে। হলটা এতই বড়ো যে বেশ কয়েকশ' লোক এঁটে যাবে তাতে। বড়ো বড়ো গবাক্ষ দিয়ে মিটমিটে আলো এসে পড়েছে। সাড়ম্বর এক ঝাড়লণ্ঠনের ওপর বসে চারদিকে নজর করতে লাগল সে। দৃশ্যটা ভয়াবহ। ছোটো ছোটো টেবিল আর কাঠের চেয়ারগুলো ভেসে উঠে সিলিংয়ের কাছে দুলছে। ছোট্ট মঞ্চটায় একটা ডালা খোলা পিয়ানো। মেঝে ঢাকা নরম কার্পেটে। মেহগনি কাঠের দেয়াল, বার্নিশ তার কোথাও কোথাও উঠে গেছে। একটা দেয়ালের কাছে সারি সারি পাম গাছ।

ঝাড়লণ্ঠন ছেড়ে ইকথিয়ান্ডর সাঁতরে গেল পাম গাছগুলোর দিকে। হঠাৎ অবাক হয়ে সে থেমে গেল। তারই মুখোমুখি কে যেন সাঁতরে আসছে তারই অঙ্গভঙ্গি নকল করে। বোঝা গেল আয়নার ব্যাপার। আয়নাটা গোটা দেয়াল জোড়া, সেলুনের ভেতরকার আসবাবপত্রের মিটমিটে ছায়া পড়ছে তাতে।

এখানে সোনাদানা খোঁজার মানে হয় না : করিডোরে বেরিয়ে এসে ইকথিয়ান্ডর আরো একতলা নিচে নেমে গেল, পৌঁছল সেলুনটার মতোই বিশাল ও সাড়ম্বর একটা কক্ষে, বোঝা গেল এটা রেস্তরাঁ। বুফের তাকগুলোয়, কাউন্টারে, মেঝেয় গড়াচ্ছে মদের বোতল, খাবারের টিন। জলের চাপে ছিপিগুলো বোতলের ভেতর ঢুকে গেছে, দুমড়ে গেছে টিনের কৌটাগুলো। প্লেট ডিশ রয়েছে, কিন্তু কিছু বাসন, রুপোর ছুরি-কাঁটা মেঝেয় গড়াচ্ছে।

কেবিনগুলোয় ঢুকে দেখতে গেল ইকথিয়ান্ডর।

কয়েকটা কেবিনে গেল সে, আমেরিকান আরামের সর্বাধুনিক নিদর্শন সব। কিন্তু কোনো মৃতদেহ তার চোখ পড়ল না। শুধু তৃতীয় ডেকের একটা কেবিনে ফুলে ওঠা একটা লাশ চোখে পড়ল তার, সিলিংয়ের কাছে দুলছে।

'বোঝা যায় লাইফবোটে চেপে অনেকেই বেঁচে গেছে'—ভাবল ইকথিয়ান্ডর।

কিন্তু আরো নিচে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা যে ডেকে থাকে, সেখানে নেমে এক বীভৎস দৃশ্য দেখলে সে : নারী, পুরুষ, শিশু কেউ এসব কেবিন থেকে বেরুতে পারে নি। শ্বেতকায়, চীনা, নিগ্রো, রেড-ইন্ডিয়ান—সবারই লাশ রয়েছে এখানে।

বোঝা যায়, খালাসিরা সর্বাগ্রে বাঁচাবার চেষ্টা করে প্রথম শ্রেণীর ধনী যাত্রীদের, বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয় ভাগ্যের কবলে। কয়েকটা কেবিনে ইকথিয়ান্ডর ঢুকতেও পারল না, লাশের স্তূপে দুয়োরগুলো বন্ধ। আতঙ্কে লোকে ভিড় করে ছুটে আসে দরজায়। নিজেরাই গাদাগাদি করে বাঁচার শেষ পথটাও আটকে ফেলে।

খোলা গবাক্ষ দিয়ে জল ঢুকে পড়েছে দীর্ঘ করিডোরটায়, ফুলে ওঠা লাশগুলো ধীরে ধীরে দুলছে। গা ছমছম করে উঠল ইকথিয়ান্ডরের। তাড়াতাড়ি করে এই সলিল সমাধি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল সে।

'সত্যিই কি গুত্তিয়েরে জানত না আমায় কোথায় সে পাঠিয়েছে?' ভাবতে লাগল ইকথিয়ান্ডর। সত্যিই কি এই ডুবে মরা মানুষগুলোর পকেট হাতড়াতে, স্যুটকেস ভাঙতে সে পাঠাতে পারে তাকে, ইকথিয়ান্ডরকে? না, এ হতে পারে না। নিশ্চয় সে ফের জুরিতার ফাঁদে পড়েছে। 'ফিরে যাব ওপরে'—ঠিক করল ইকথিয়ান্ডর, 'দাবি করব গুত্তিয়েরে ডেকে এসে নিজ মুখে আমায় অনুরোধ করুক।'

মাছের মতো ইকথিয়ান্ডর ডেকের পর ডেক উঠল জলের ওপরে।

তাড়াতাড়ি 'জেলি-মাছ'-এর কাছে চলে এল সে। ডাকল :

'জুরিতা! গুত্তিয়েরে!'

কোনো জবাব এল না। শুধু তরঙ্গে টলমল করছে নিস্তব্ধ 'জেলি-মাছ'।

'গেল সবাই কোথায়?' অবাক লাগল তার, 'আবার কোনো ফন্দি এঁটেছে নাকি জুরিতা?'

সন্তর্পণে সাঁতরে এসে ইকথিয়ান্ডর জাহাজের ঢেকে উঠল :

'গুত্তিয়েরে!' আরেকবার ডাক দিল সে।

'আমরা এখানে!' তীর থেকে ভেসে এল জুরিতার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। চারদিকে তাকিয়ে দেখতে তার চোখে পড়ল তীরের একটা ঝোপের পেছন থেকে সন্তর্পণে উঁকি দিচ্ছে জুরিতা।

গুত্তিয়েরের অসুখ করেছে! এখানে সাঁতরে এসো, ইকথিয়ান্ডর!' চেঁচাল জুরিতা।

অসুখ করেছে গুত্তিয়েরের! এক্ষুণি সে তাকে গিয়ে দেখবে। জলে ঝাঁপিয়ে দ্রুত তীরের দিকে সাঁতরাতে লাগল ইকথিয়ান্ডর।

জল থেকে উঠে আসছিল ইকথিয়ান্ডর, হঠাৎ শুনলে গুত্তিয়েরের চাপা গলা :

'মিথ্যে কথা বলছে জুরিতা! পালার ইকথিয়ান্ডর!'

দ্রুত পেছনে ফিরে ডুবসাঁতার দিলে সে। তীর থেকে অনেক দূরে চলে যাবার পর সে ওপরে ভেসে উঠল। চোখে পড়ল তীরে সাদা মতো কী একটা নড়ছে। হয়তো রুমাল নাড়ছে গুত্তিয়েরে। আর কি কখনো দেখা হবে তার সঙ্গে?...

দ্রুত খোলা সাগরে সাঁতরে গেল ইকথিয়ান্ডর, দূরে দেখা গেল একটা ছোটো জাহাজ। ফেনার ঝড় তুলে তা ছুঁচলো গলুইয়ে জল কেটে চলেছে দক্ষিণের দিকে।

'লোকের কাছ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়'—এই ভেবে গভীর ডুব দিয়ে সে তলিয়ে গেল।

তৃতীয় অংশ

নবোদিত পিতা

অসার্থক সাবমেরিন অভিযানের পর খুবই মুষড়ে পড়ল বালতাজার। ইকথিয়াণ্ডরকে পাওয়া গেল না, জুরিতাও কোথায় উধাও হল গুত্তিয়েরেকে নিয়ে।

নিজের দোকানটায় একা বসে গজগজ করছিল সে, 'শালা সাদা-চামড়ার দল। আমাদের নিজেদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাদের গোলাম বানিয়েছে। বিকলাঙ্গ করে আমাদের ছেলেদের, লুট করে আমাদের মেয়েদের। আমাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় ওরা।'

'কেমন আছিস ভাই?' শোনা গেল ক্রিস্টোর গলা, 'খবর আছে রে, মস্ত খবর! ইকথিয়াণ্ডরকে পাওয়া গেছে।'

'কী বললি!' প্রায় লাফিয়ে উঠল বালতাজার, 'চটপট বল ব্যাপারটা!'

'বলছি, বলছি, শুধু আমার কথার মধ্যে কথা বলিস না। নইলে যা বলতে চাই সব গুলিয়ে যাবে। ইকথিয়াণ্ডরকে পাওয়া গেছে। আমি তখন ঠিকই বলেছিলাম : ও ছিল সেই ডোবা জাহাজটায়। আমরা চলে যাই, ও-ও সাঁতরে বাড়ি ফিরে আসে।'

'কোথায় সে এখন?'

'সালভাতরের কাছেই।'

'আমি সালভাতরের কাছে গিয়ে দাবি করব, আমার ছেলে ফিরিয়ে দিক।'

'দেবে না'—আপত্তি করলে ক্রিস্টো, 'ইকথিয়াণ্ডরের সাগরে সাঁতরানো বারণ করে দিয়েছে সালভাতর, শুধু মাঝে মাঝে আমি চুপিচুপি ওকে ছেড়ে দিই।

'আলবৎ দেবে! না দিলে খুন করব সালভাতরকে। চল যাই, এক্ষুণি।'

ভয় পেয়ে হাত নাড়ল ক্রিস্টো।

'আরে অন্তত কাল পর্যন্ত সবুর কর। 'নাতনি'কে দেখার জন্যে আমি বহু বলে কয়ে এই ছুটিটা পেয়েছি। ভারি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে সালভাতর। চোখের দিকে যখন তাকায় তখন যেন ছুরি চালিয়ে দেয়। কথা শোন, কাল পর্যন্ত সবুর কর।'

'বেশ, কালকেই নয় সালভাতরের কাছে যাব। কিন্তু এখন যাচ্ছি ওই খাঁড়িটার কাছে, অন্তত দূর থেকেও যদি ছেলের দেখা পাই সমুদ্রে।'

সারা রাত বালতাজার খাঁড়ির পাড়ে বসে তাকিয়ে রইল ঢেউয়ের দিকে। উত্তাল হয়ে উঠেছিল সমুদ্র। দমকে দমকে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা দক্ষিণী হাওয়ার ঝাপটা, ঢেউয়ের মাথার ফেনা উড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলছে তীরের পাহাড়ে। সগর্জনে আছড়ে পড়ছে তরঙ্গভঙ্গ। দ্রুত সঞ্চরমাণ মেঘের মধ্যে ছুটোপুটি করে চাঁদ কখনো আলো ফেলছে ঢেউয়ে, কখনো হারিয়ে যাচ্ছে। ফেনায়িত সাগরের বুকে হাজার চেষ্টা করেও কিছু তার চোখে পড়ল না। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করল, বালতাজার কিন্তু নিশ্চল হয়েই বসে রইল পাড়ে। কালো সাগর হয়ে উঠল ধূসর, কিন্তু তখনো তা একই রকম শূন্য আর জনহীন।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল বালতাজার। দোলায়িত তরঙ্গের মধ্যে কালো কী একটা জিনিস ধরা পড়ল তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। মানুষ! ডুবে যাওয়া মানুষ নাকি? না তো, মাথার তলে হাত দিয়ে শান্তভাবে চিত হয়ে শুয়ে আছে সে। সেই নয় তো?

বালতাজারের ভুল হয়নি। ইকথিয়ান্ডরই বটে।

বালতাজার উঠে দাঁড়াল, বুকে হাত রেখে চিৎকার করে বলল, 'ইকথিয়ান্ডর! ব্যাটা আমার!' তারপর হাত তুলে বুড়ো ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

পাহাড় থেকে ঝাঁপানোর ফলে সে তলিয়ে গিয়েছিল অনেক গভীরে, যখন ভেসে উঠল, জলের ওপর কাউকে কোথাও দেখা গেল না। ঢেউয়ের সঙ্গে মরিয়ার মতো লড়ে বালতাজার ফের ডুব দিলে, কিন্তু প্রকাণ্ড একটা ঢেউ তাকে উল্টেপাল্টে তীরে আছড়ে ফেলে চাপা গর্জনে ফিরে গেল সমুদ্রে। সিক্তদেহে উঠে দাঁড়াল বালতাজার, ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল :

'সত্যিই কি এটা আমার দৃষ্টিভ্রম?'

সদ্য-ওঠা সূর্যের কিরণে আর হাওয়ায় যখন তার পোশাক শুকিয়ে উঠল, তখন সালভাতরের সম্পত্তি-ঘেরা দেয়ালটার দিকে রওনা দিল সে, টোকা মারল লোহার ফটকে।

'কে?' আধ-খোলা ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করল নিগ্রোটা।

'ডাক্তারের কাছে যেতে চাই। জরুরি দরকার।'

ডাক্তার কারো সঙ্গে দেখা করবেন না'—বলে ফুটো বন্ধ করে দিল নিগ্রো।

অনেক ধাক্কাধাক্কি করল বালতাজার। চেঁচামেচি করল, কিন্তু ফটক খুলল না। দেয়ালের ওপাশ থেকে শুধু শোনা গেল কুকুরের ভয়ঙ্কর ডাক।

'দাঁড়াও তবে, হারামজাদা স্পেনিয়ার্ড, তোমায় দেখাচ্ছি!' হুমকি দিয়ে বালতাজার রওনা দিল শহরে।

আদালত-ভবনের অদূরে ছিল 'লা পালমেরা' নামে এক পুলকেরিয়া—মোটা মোটা পাথুরের দেয়ালের একটা পুরনো, সাদা নিচু বাড়ি। ঢোকবার মুখে একটা সরু বারান্দা, ডোরাকাটা শামিয়ানায় ছাওয়া, সারি সারি টেবিল পাতা সেখানে, এনামেল করা টবে ফণিমনসা সাজানো। বারান্দা সরগরম হয়ে উঠত কেবল সন্ধ্যায়। দিনের বেলায় লোকে ভেতরকার নিচু ঠাণ্ডা কামরাগুলোতেই বসত। পুলকেরিয়াটা ছিল যেন আদালতেরই একটা বিভাগ। বিচার চলার সময় এখানে এসে জুটত ফরিয়াদি আর প্রতিবাদী, সাক্ষী আর জামিনে ছাড়া পাওয়া আসামি।

নিজেদের পালা না আসা পর্যন্ত এখানে তারা মদ আর 'পুল্‌কে' খেয়ে বিরক্তিকর ঘণ্টাগুলো কাটাত। চটপটে একটা ছেলে অবিরাম আদালত আর 'লা-পালমেরা'র মধ্যে ছুটোছুটি করে জানিয়ে যেত আদালতে কী হচ্ছে। অনেক ঝামেলা এতে বাঁচে। নানারকমের কুচুটে দালাল; আর মিথ্যাসাক্ষীও জুটত এখানে, মক্কেল খুঁজত।

নিজের দোকানের ব্যাপারে অনেক বার এখানে এসেছে বালতাজার। জানত, আর্জি লেখার জন্য দরকারি লোক এখানেই মিলবে। তাই এখানেই ঢুঁ দিলে সে।

তাড়াতাড়ি বারান্দা পেরিয়ে ঠাণ্ডা হলখানায় ঢুকল বালতাজার, কপালের ঘাম মুছে আরাম করে নিশ্বাস টানলে, কাছেই যে ছেলেটা ঘুরঘুর করছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে:

'লারা এসেছে?'

'দন ফ্লোরেস-দে-লারা এসেছেন, নিজের জায়গায় বসে আছেন'—চটপট জবাব দিলে সে। দন ফ্লোরেস-দে-লারা বলে জমকালো নামে যাকে ডাকা হয়, এক সময় সে ছিল আদালতের একজন সামান্য কর্মচারী, ঘুষ খাওয়ার জন্য চাকরি যায় তার। এখন তার

মক্কেল অনেক। মামলা যাদের গোলমেলে, সবাই গিয়ে তারা ধন্না দেয় এই বটতলার ফেরেববাজের কাছে। বালতাজারও আগে কয়েকবার তার কাছে এসেছে।

চওড়া বাজুর একটা গথিক জানলার কাছে বসেছিল লারা। সামনে টেবিলের ওপর এক মগ মদ আর পেটমোটা বাদামি একটা পোর্টফোলিও। সর্বদাই কর্মোদ্যত কলমটি তার জলপাই রঙের জীর্ণ স্যুটের বুকপকেটে গোঁজা। দেখতে লারা মোটাসোটা, টাক পড়া, লালচে গাল, লালচে নাক, চাঁচাছোলা গুমরে মুখ। জানলা দিয়ে আসা ফুরফুরে হাওয়ায় তার অবশিষ্ট পাকা চুলগুলো উড়ছিল। স্বয়ং জজ সাহেবও অমন ভারিক্কি ভাব দেখাতে পারে না।

বালতাজারকে দেখে সে অবহেলাভরে মাথা নোয়াল, ইঙ্গিতে সামনের বেতে-বোনা কেদারাটা দেখিয়ে বলল :

'বসুন। কী ব্যাপার? একটু মদ খাবেন নাকি? পুল্‌কে?'

সাধারণত বরাত দিত সে, কিন্তু দাম মেটাত মক্কেল।

বালতাজার না শোনার ভাব করল :

'মস্ত ব্যাপার, জবর ব্যাপার লারা।'

'দন ফ্লোরেস-দে-লারা' মগে চুমুক দিয়ে সংশোধন করে দিল সে।

কিন্তু বালতাজার সেটা কেয়ার করল না।

'তা ব্যাপারটা কী?'

'তুমি তো জানো লারা..'

'দন ফ্লোরেস-দে...'

'তোমার ওসব চাল রেখে দাও আনাড়িদের জন্যে!' চটে উঠল বালতাজার, 'ব্যাপার খুব গুরুতর।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি ভেঙে বলো'—লারা বললে একেবারেই অন্য সুরে।

'দরিয়ার দানো'র কথা শুনেছ?'

'সরাসরি পরিচয়ের সুযোগ হয় নি, তবে গল্প শুনেছি অনেক...' ফের অভ্যাসসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে জবাব দিল লারা।

'এখন যাকে 'দরিয়ার দানো' বলা হয়, সে হল আমার ছেলে ইকথিয়াণ্ডর।'

'হতে পারে না!' চেঁচিয়ে উঠল লারা, 'তুমি একটু বেশি টেনেছ বালতাজার?'

টেবিলে ঘুষি মারল বালতাজার।

'কাল থেকে কয়েক ঢোক সাগরের জল ছাড়া আমার পেটে কিছু পড়ে নি।'

'তার মানে, অবস্থাটা আরো খারাপ?'

'ভাবছ পাগল হয়ে গেছি? মাথা আমার বিলকুল ঠিক আছে। চুপ করে শোনো।'

বলে গোটা ঘটনাটা সে জানাল লারাকে। একটি কথাও না কয়ে লারা শুনে গেল। ক্রমেই কপালে উঠতে লাগল তার পাকা ভুরু। শেষ পর্যন্ত আর সে পারলে না, নিজের দেবদুর্লভ মহিমা ভুলে মুটকো হাতে টেবিল চাপড়ে হাঁকল :

'এই ফিঁচকে ভূত!'

সাদা অ্যাপ্রন পরা একটা ছেলে ময়লা তোয়ালে হাতে ছুটে এল :

'কী আনব, বলুন।'

'বরফ দেওয়া দু'বোতল সর্টেন।' তারপর বালতাজারের দিকে ফিরে লারা বলল, 'চমৎকার! খাসা ব্যাপার! নিজেই মাথা খাটিয়ে বার করলে? তবে খোলাখুলিই বলছি, তোমার পিতৃত্বের ব্যাপারটা এখানে সবচেয়ে কাঁচা।'

'সন্দেহ হচ্ছে তোমার?' রাগে এমনকি লাল হয়েই উঠল বালতাজার।

'নাও হয়েছে, রাগ করো না ভায়া। আমি বলছি কেবল আইনের দিক থেকে। আদালতে ওজনদার প্রমাণ হিশেবে ওটা একটু কাঁচা। তবে শুধরে নেওয়া যায়। হুঁ! প্রচুর টাকা করা যাবে।'

'আমার দরকার টাকা নয়, ছেলে'—আপত্তি করল বালতাজার।

'টাকা দরকার সবারই, বিশেষ করে তোমার মতো যাদের সংসার বাড়ছে'—গুরুমশায়ী ঢঙে বললে লারা, তারপর সেয়ানার মতো চোখ কুঁচকে যোগ দিলে, 'সালভাতরের গোটা ব্যাপারটার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি আর ভরসার কথা হল এই যে, কী ধরনের পরীক্ষা আর অপারেশন সে চালিয়েছে তা আমরা জানতে পেরেছি। এখানে এমন প্যাঁচ করা যায় যে পাকা কমলালেবু ঝড়ে পড়ার মতো ওই বড়োলোক সালভাতর মশায়ের পকেট থেকে টাকা পড়তে থাকবে।'

লারা যে মদ ঢেলে দিয়েছিল সেটায় সামান্য ঠোঁট ঠেকিয়ে বালতাজার বলল :

'আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই। এই নিয়ে তুমি একটা মামলা রুজু করে দাও।'

'উঁহুঁ, উঁহুঁ! কদাচ নয়!' প্রায় আঁতকে উঠে আপত্তি করল লারা। 'ওই দিয়ে শুরু করলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। ওটা হচ্ছে শেষের মার।'

'তাহলে কী করতে বলছ?' জিজ্ঞেস করল বালতাজার।

'প্রথম কথা'—মুটকো একটা আঙুল দুমড়াল লারা, 'অতি ভদ্র ভাষায় আমরা একটি চিঠি পাঠাব সালভাতরকে। বলব যে তাঁর বেআইনি সব পরীক্ষা আর অপারেশনের কথা আমরা জানি। সেটা আমরা প্রকাশ করে দেব। এটা যদি তিনি না চান, তাহলে আমাদের কিছু মোটা টাকা ছাড়ুন। এক লাখ। হুঁ, এক লাখের কমে চলবে না।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লারা চাইল বালতাজারের দিকে। মুখ ঘোঁচ করে সে চুপ করে রইল।

'দ্বিতীয়ত'—বলে চলল লারা, 'টাকাটা যখন পাব, সেটা আমরা পাবই, তখন আরো ভদ্র ভাষায় দ্বিতীয় চিঠি পাঠাব প্রফেসর সালভাতরকে। বলব সে ইকথিয়াণ্ডরের আসল বাপকে পাওয়া গেছে, অকাট্য প্রমাণও আছে। তার বাপ তার ছেলে ফিরে পেতে চায়, তার জন্যে মোকদ্দমা করতে হলেও সে পেছোবে না, আর সালভাতর কিভাবে ইকথিয়াণ্ডরের দেহ বিকৃত করেছেন, সে-কথা তাতে ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

সালভাতর যদি মামলা এড়িয়ে ছেলেটাকে নিজের কাছে রাখতে চান তাহলে অমুক জায়গায়, অমুক সময়ে, অমুক-অমুক ব্যক্তিকে দিতে হবে দশ লক্ষ ডলার।'

কিন্তু বালতাজার আর শুনছিল না। আরেকটু হলেই ধাঁ করে মদের বোতলটা নিয়ে বসিয়ে দিত দালালটার মাথায়। বালতাজারকে অমন প্রচণ্ড রাগতে লারা আগে কখনো দেখে নি।

'আরে রাগ করো না। ঠাট্টা করছিলাম একটু, নাও বোতলটা রেখে দাও তো!' হাত দিয়ে টেকো মাথাটা আড়াল করে বলে উঠল সে।

'কী বললে! চেঁচিয়ে উঠল উন্মত্ত বালতাজার, 'টাকা নিয়ে ছেলেকে বেচে দিতে বলছ তুমি! কলজে বলতে তোমার কি কিছুই নেই। নাকি তুমি মানুষ নও, বিছে, পিতৃস্নেহ কী তা তোমার জানা নেই!'

'পাঁচটা, পাঁচটা, পাঁচটা! এবারে রেগে চেঁচিয়ে উঠল লারা, পাঁচটা পিতৃস্নেহ, পাঁচটা ছেলে আমার, নানা আকারের পাঁচটি ভূত। পাঁচটা পেট! সব জানি সব বুঝি! ছেলে তোমার হাতছাড়া হবে না। শুধু একটু ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত শুনে যাও।'

শান্ত হয়ে এল বালতাজার। বোতলটা সে টেবিলে রেখে মাথা নিচু করে তাকাল লারার দিকে। 'বেশ বলো।'

'এই তো ভালো ছেলের মতো কথা। সালভাতর আমাদের দশ লাখ ছাড়বে। এটা হবে তোমার ইকথিয়াণ্ডরের জন্যে যৌতুক। আমারও কিছু জুটবে। এইসব ঝামেলা এবং

মতলবটার উদ্ভাবন স্বত্বের জন্যে লাখখানেক। ওটা আমরা কথা কয়ে নেব। দশ লাখ সালভাতর দেবে, বাজি রেখে তা বলতে পারি। আর যেই টাকাটা পাব...'

'মামলা রুজু করব।'

'আরো একটু ধৈর্য চাই। বড়ো বড়ো খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে আমরা বলব অতি চাঞ্চল্যকর সব অপরাধের খবর দেবার জন্যে আমাদের—ধরা যাক হাজার বিশ কি তিরিশ দিক—ছোটোখাটো খরচাপাতিতে কাজ দেবে। গোয়েন্দা পুলিশের কাছে থেকেও কিছু খসানো যায়। এ রকম ব্যাপারে পুলিসের এজেন্টরা যে নিজের কেরিয়ার বানিয়ে নিতে পারে। সালভাতরের ব্যাপারটা থেকে যা নিংড়াবার সব নিংড়ে নেবার পরে ঠোকো মামলা, দেখাও তোমার যত পিতৃস্নেহ, বিচারের দেবী স্বয়ং থেমিস তোমার দাবি প্রমাণে সাহায্য করুন, তোমার কোলে ফিরিয়ে দিন আদরের ছেলেটিকে।'

লারা এক ঢোকে মদটা শেষ করে ঠক করে গেলাসটা রাখল টেবিলে, বালতাজারের দিকে চাইল বিজয়ীর দৃষ্টিতে।

'কেমন? কী মনে হচ্ছে?'

'আমার খাওয়া-দাওয়া গেছে, রাতে ঘুমোই না। আর তুমি কিনা ব্যাপারটা কেবল টেনেই চলেছ'—শুরু করল বালতাজার।

'হ্যাঁ, কিন্তু কিসের জন্যে... বাধা দিলে লারা, 'কিসের জন্যে? দশ লাখ! দশ লাখ টাকা! বোধশক্তি খোয়ালে নাকি। বিশ বছর তো কাটিয়েছ ইকথিয়াস্তরকে ছাড়াই।'

'কাটিয়েছি। কিন্তু এখন...' সাফ কথা, মামলার আর্জিটা লিখে দাও।'

'সত্যিই দেখছি ওর মাথা খারাপ হয়েছে?' টাকা, সোনা! যা খুশি কেনা যায়, সেরা তামাক, মোটরগাড়ি, বিশটা জাহাজ, এই পুলকেরিয়া...'

'মামলার আর্জি লেখো, নইলে অন্য উকিলের কাছে যাব'—দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলে বালতাজার।

লারা বুঝলে আপত্তি আর খাটবে না। হতাশভাবে মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাগজ বার করল পোর্টফোলিওটা থেকে, বুকপকেটের কলম তুলে নিল।

বালতাজারের ছেলেকে বেআইনিভাবে নিজের কাছে রাখা ও তার দেহকে বিকৃত করার জন্য সালভাতরের বিরুদ্ধে নালিশের বয়ান তৈরি হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

'শেষ বারের মতো বলছি, ভেবে দ্যাখো'—বলল লারা।

'দাও আমায়'—অভিযোগপত্রের জন্য হাত বাড়াল বালতাজার।

'প্রধান অভিশংসকের হাতে দিও। চেনো তো তাকে?' মক্কেলকে উপদেশ দিল লারা এবং নাকি সুরে গজগজ করল, 'সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে ঠ্যাঙটা যেন তোমার ভাঙে।'

অভিশংসকের আপিস থেকে বেরুতেই মস্ত সাদা সিঁড়িটায় বালতাজারের দেখা হয়ে গেল জুরিতার সঙ্গে।

'এখানে এসেছ যে?' সন্দিগ্ধের মতো তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল জুরিতা। 'আমার বিরুদ্ধেই নালিশ করছ-না তো?'

'তোমাদের সবার নামেই নালিশ ঠোকা দরকার'—সবাই বলতে বালতাজার স্পেনীয়দের কথা ভাবছিল, 'শুধু ঠোকবার লোক নেই। কোথায় লুকিয়ে রেখেছ আমার মেয়েকে?'

'কী আস্পর্ধা যে আমায় 'তুমি' বলে কথা কইছ?' চটে উঠল জুরিতা, 'নেহাৎ শ্বশুর, তাই রক্ষে পেলে, নইলে তোমায় লাঠিপেটা করে ছাড়তাম।'

রূঢ়ভাবে বালতাজারকে ঠেলে সরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে জুরিতা ওপরে উঠে গেল, অদৃশ্য হল ওক-কাঠের প্রকাণ্ড দরজাটার ওপাশে।

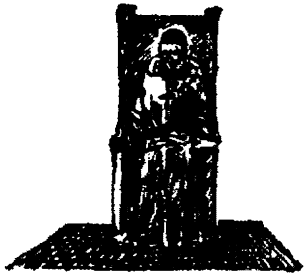

ব্যতিক্রমী মামলা

বুয়েনাস-আইরেসের অভিশংসকের কাছে দেখা করতে এলেন এক বিরল অভ্যাগত—স্থানীয় গির্জার আচার্য, বিশপ জুয়ান-দে-গার্সিলাসো।

অভিশংসক লোকটি দেখতে মোটাসোটা, বেঁটে, চটপটে, ফুলো ফুলো চোখ, ছোটো করে ছাঁটা চুল, কলপ দেওয়া মোচ। বিশপকে স্বাগত জানাবার জন্য তিনি কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মান্যবর অতিথিকে বসালেন তার টেবিলের সামনে চামড়ার ভারি একটা আরামকেদারায়।

বিশপ আর অভিশংসকের চেহারায় মিল বিশেষ নেই। অভিশংসকের মুখখানা মাংসল, লালচে, পুরু পুরু ঠোঁট, চওড়া নাকটা দেখায় পেয়ারার মতো। আঙুলগুলো যেন মোটা মোটা সতেজ। গোল পেটটার ওপর বোতামগুলো চর্বির চাপ সইতে না পেরে যে কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হয়।

বিশপের মুখখানা অবাক করে তার শীর্ণতা আর পাণ্ডুরতায়। শুকনো বাঁকা নাক, ছুঁচলো থুতনি আর পাতলা, প্রায় নীলাভ ঠোঁটে তাকে মনে হবে টিপিক্যাল জেশুইট। কথা বলা সময় তিনি কখনো চোখে চোখে চাইতেন না বটে, তাহলে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে তাঁর বাধা হত না। অগাধ তার প্রতিপত্তি, প্রায় আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে তিনি নামতেন জটিল রাজনৈতিক খেলায়। অভিশংসকের সঙ্গে সম্বোধন বিনিময়ে চট করেই তিনি তার আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন।

'জানতে এলাম'—মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন বিশপ, 'প্রফেসর সালভাতরের মামলাটার অবস্থা এখন কী?'

'আপনিও দেখছি, গুরুদেব, ব্যাপারটায় আগ্রহী! সৌজন্য সহকারে বললেন অভিশংসক। 'হ্যাঁ, একটা অসাধারণ মামলা! মোটা একটা ফাইলের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলে চললেন তিনি। 'পেদ্রো জুরিতার কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে আমরা প্রফেসর সালভাতরের বাড়িতে খানাতল্লাশ চালাই। জীবজন্তুর ওপর সালভাতর আশ্চর্য সব অপারেশন করেছে, জুরিতার এই বিবৃতি পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সালভাতরের বাগানগুলো বিকৃত প্রাণীর এক সত্যিকারের কারখানা। তাজ্জব ব্যাপার, যেমন সালভাতর...

'তল্লাশির ফলাফল আমি খবরের কাগজেই দেখেছি'—নরম গলায় বাধা দিলেন বিশপ, 'খোদ সালভাতরকে নিয়ে কী করছেন, গ্রেপ্তার করেছেন?'

'হ্যাঁ, গ্রেপ্তার হয়েছে। তাছাড়া সাক্ষী এবং মোক্ষম প্রমাণ হিশেবে আমরা শহরে নিয়ে এসেছি ইকথিয়াণ্ডর নামে এক ছোকরাকে, সেই হল 'দরিয়ার দানো'। নামকরা এই যে 'দরিয়ার দানো'কে নিয়ে আমরা এত খেটে মরলাম, কে ভাবতে পেরেছিল সে কিনা সালভাতরের চিড়িয়াখানার এক চিজ। এখন বিশেষজ্ঞরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এইসব বিকটাঙ্গ নিয়ে সন্ধান চালাচ্ছেন। চিড়িয়াখানা খুব জীবন্ত এবং ভারিক্কি প্রমাণ হলেও

গোটাগুটি তাকে তো শহরে আনা যায় না। কিন্তু ইকথিয়াস্তরকে এনে আদালতের তল কুঠুরিতে রাখা হয়েছে। ওকে নিয়ে আমাদের ঝামেলা সইতে হচ্ছে কম নয়। ব্যাপার বুঝুন, মস্ত একটা চৌবাচ্চা বানাতে হয়েছে ওর জন্যে, জল ছাড়া ও বাঁচতে পারে না। সত্যি খুবই কষ্ট হচ্ছিল ওর। বোঝাই যায়, সালভাতর তার দেহযন্ত্রের অস্বাভাবিক কিছু একটা বদল ঘটিয়েছে, ছেলেটাকে বানিয়েছে উভচর মানুষ। আমাদের বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা খোলসা করার চেষ্টা করছেন।'

'আমার জিজ্ঞাস্য সালভাতরের কী হবে?' একই রকম আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন বিশপ, 'আইনের কোন্ ধারায় ওকে ফেলছেন? আপনার কী মনে হয়, শাস্তি পাবে?'

'সালভাতরের মামলাটা আইনের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার'—জবাব দিলেন অভিশংসক, 'সত্যি বলতে কি, ঠিক কোন্ ধারায় ওকে ফেলব, সেটা এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি। সহজ হয় বেআইনি ব্যবচ্ছেদ এবং এই ছোকরাটিকে বিকৃত করার অভিযোগ আনলে...'

বিশপের ভুরু কোঁচকাতে লাগল :

'আপনি মনে করছেন সালভাতরের এইসব কার্যকলাপে অপরাধের কোনো ভিত্তি নেই?'

'আছে অথবা থাকার কথা, কিন্তু ঠিক কী?' বললেন অভিশংসক, 'আরো একটা আর্জি এসেছে বালতাজার নামে কে এক রেড-ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে। ও বলছে ইকথিয়াস্তর নাকি তার ছেলে। প্রমাণ জোরদার নয়, তবে বিশেষজ্ঞরা যদি স্থির করে যে ইকথিয়াস্তর সত্যিই তারই ছেলে, তাহলে ওকে আমরা সাক্ষী হিশেবে কাজে লাগাতে পারব।'

'তার মানে সালভাতরের বিরুদ্ধে বড়ো জোর চিকিৎসাবিধি ভঙ্গের নালিশ আনা যাবে এবং বাপ-মায়ের অনুমতি ছাড়াই একটি শিশুর ওপর অস্ত্রোপচারের জন্যে তার বিচার হবে?'

হ্যাঁ এবং তাছাড়াও অঙ্গবিকৃতি ঘটাবার জন্যে। এটা গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একটা জটিল ব্যাপার আছে। অবশ্য এটা এখনো চূড়ান্ত নয়, তাহলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা হচ্ছে—স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে জীবজন্তুদের অমনভাবে বিকৃত করার ইচ্ছেই হবে না, ইকথিয়াস্তরের ওপর অপারেশন করা তো দূরের কথা। হয়তো তারা সালভাতরকে মানসিক রোগী বলে ঘোষণা করবে।'

পাতলা ঠোঁট চেপে টেবিলের কোণার দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইলেন বিশপ। তারপর খুব আস্তে করে বললেন :

'আপনার কাছ থেকে এটা আশা করি নি।'

'কী বলছেন গুরুদেব?' থমমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন অভিশংসক।

'আপনি ন্যায়ের রক্ষক, সেই আপনিও যেন সালভাতরের কাণ্ডখারখানাকে নরম করে দেখছেন, ভাবছেন তার একটা কৈফিয়ৎ থাকলেও থাকে পারে।'

'কিন্তু এর মধ্যে খারাপটা কী?'

'অপরাধ বলে গণ্য করতে ইতস্তত করছেন। কিন্তু গির্জার ধর্মাধিকরণ, ঐশ্বরিক ধর্মাধিকরণ সালভাতরের ব্যাপারটকে অন্যভাবে দেখে। আপনাকে একটু সাহায্য করি, কিছু উপদেশ দিই।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়'—বিব্রতভাবে বললেন অভিশংসক।

মৃদু কণ্ঠে শুরু করে প্রচারকের মতো, অভিযোক্তার মতো আস্তে আস্তে গলা চড়াতে লাগলেন বিশপ :

'আপনি বলছেন সালভাতরের কাণ্ডকারখানার পেছনে কোনো কৈফিয়ৎ থাকলেও থাকতে পারে। আপনি মনে করেন যে সব জীবজন্তু ও মানুষের ওপর যে অপারেশন চালিয়েছে,

তারা এমন কিছু সুবিধা লাভ করেছে যা তাদের আগে ছিল না। কিন্তু তার মানে কি? স্রষ্টা কি মানুষকে গড়েছেন অসম্পূর্ণ করে? মানবদেহকে সম্পূর্ণ করার জন্যে কি প্রফেসর সালভাতরকে হস্তক্ষেপ করতে হবে?'

মুখ নিচু করে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন অভিশংসক। গির্জার সামনে তিনিই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছেন অভিযুক্ত। এটা তিনি আশা করতে পারেননি।

'ভুলে গেছেন কি বাইবেলের 'সৃষ্টিতত্ত্বে' প্রথম অধ্যায় ২৬ নং শ্লোকে কী বলা হয়েছে: 'ঈশ্বর কহিলেন, মানুষ সৃষ্টি করিব আমাদের আদর্শে। আমাদের সাদৃশ্যে।' তারপর ২৭ নং শ্লোক : ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিবেন নিজের আদর্শে।' সে আদর্শ ও সাদৃশ্যকে বিকৃত করার স্পর্ধা করেছে সালভাতর আর আপনি, এমনকি আপনিও তার পেছনে কৈফিয়ৎ দেখতে পাচ্ছেন।'

'মাপ করবেন গুরুদেব...'এইটুকু ছাড়া অভিশংসকের মুখ দিয়ে আর কিছু বেরল না।

'ঈশ্বর কি তার সৃষ্টিকে অনবদ্য বলে মনে করেননি?' উদ্দীপিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন বিশপ, 'ভাবেন নি সুসম্পূর্ণ? ইহলৌকিক আইনের ধারাগুলো আপনার ভালোই জানা আছে। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন ঐশ্বরিক আইনের ধারা। 'সৃষ্টিতত্ত্বের' ঐ একই অধ্যায়ে ৩১ নম্বর শ্লোকটি মনে করুন : এবং ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিলেন তাহা চাহিয়া দেখিলেন, অহো, ইহা অতি সুন্দর।' আর আপনার সালভাতর মনে করছেন কিছু কিছু সংশোধন করতে হবে, ঢেলে সাজাতে, বিকৃত করতে হবে, ভাবছেন মানুষকে হতে হবে জলে-স্থলে উভচর, আর আপনি ভাবছেন ব্যাপারটা বুদ্ধিমত্ত, যুক্তিযুক্ত। এটা কি ঈশ্বর প্রসঙ্গে ধৃষ্টতা নয়? অশুচিকরণ নয়, নাকি রাষ্ট্রীয় আইন আজকাল ধর্মীয় অপরাধে আর শাস্তি দিচ্ছে না? কী হবে যদি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলতে শুরু করে : 'হ্যাঁ ঈশ্বর মানুষকে ভালোভাবে গড়েন নি। ঢেলে সাজার জন্যে তাদের সালভাতরের হাতে দেওয়া উচিত? এটা কি একটা বিকট অধর্ম নয়?... ঈশ্বর যা কিছু গড়েছেন তা তাঁর কাছে উত্তম মনে হয়েছে। আর জীবজন্তুর ঘাড়ে অন্য মাথা বসাচ্ছে সালভাতর। বদলে দিচ্ছে চামড়া, বানাচ্ছে অনৈশ্বরিক সব দানব, উপহাস করছে সৃজনকর্তাকে। আর অপরাধের ধারায় সালভাতরকে ফেলতে অসুবিধা বোধ করছেন আপনি?'

চুপ করলেন বিশপ, অভিশংসকের ওপর তার বক্তৃতার প্রভাব দেখে খুশিই হলেন তিনি। একটু চুপ করে থেকে ফের মৃদুস্বরে শুরু করলেন, গলা চড়তে থাকল ধীরে ধীরে:

'আগেই বলেছি সালভাতরের ভাগ্যে কী ঘটবে সেইটেতেই আমার সবচেয়ে আগ্রহ। কিন্তু ইকথিয়ান্ডরের ভাগ্য সম্পর্কেও কি আমি নির্বিকার থাকতে পারি? এ প্রাণীটির নামটা পর্যন্ত খ্রিস্টীয় নয়, গ্রিক ভাষায় ইকথিয়ান্ডর মানে হল মৎস্যকুমার। ইকথিয়ান্ডরের নিজের কিছু দোষ না থাকলেও ও মাত্র শিকার—তাহলেও সে হল এক ঈশ্বরদ্বেষী ধৃষ্টতা। ওর অস্তিত্বটাই লোকের মাথা গুলিয়ে দেবে, পাপচিন্তায় প্রণোদিত করবে, প্রলোভিত করবে দুর্বলদের, দ্বিধান্বিত করবে ক্ষীণবিশ্বাসীদের। সবচেয়ে ভালো হয় যদি ঈশ্বর ওকে নিজের কাছে ডেকে নেন, তার বিকৃত দেহের অসম্পূর্ণতার জন্যে যদি মারা যায় এই হতভাগ্য ছেলেটা, এইখানে বিশপ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন অভিশংসকের দিকে, অন্ততক্ষেত্রে ওকে অভিযুক্ত, পৃথকীকৃত করতে হবে, মুক্ত থাকা ওর চলবে না। ও নিজেও তো কিছু কিছু অপরাধ করেছে—মাছ চুরি করেছে জেলেদের, জাল নষ্ট করেছে এবং শেষ পর্যন্ত জেলেদের এমন ভয় দেখিয়েছে, যে মাছ ধরা তারা বন্ধ করে দেয়, মাছের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় শহরে। 'নিরীশ্বর' সালভাতর আর তার কুকীর্তি ইকথিয়ান্ডর—এ হল গির্জা, ঈশ্বর, স্বর্গের প্রতি এক ধৃষ্ট চ্যালেঞ্জ! ওদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত গির্জাও তার অস্ত্র সংবরণ করবে না।'

বিশপ তাঁর অভিযোগ-ভাষণ চালিয়ে যেতে লাগলেন ; একেবারে মুষড়ে পড়ে মাথা নিচু করে বসে রইলেন অভিশংসক, ভয়ঙ্কর এই তর্জনের স্রোতের বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করলেন না। অবশেষে যখন বিশপের বক্তব্য শেষ হল, অভিশংসক উঠে বিশপের কাছে গিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন :

'খ্রিস্টান হিশেবে আমি আমার পাপক্ষালণের জন্যে গির্জায় যাব আপনার কাছে স্বীকারোক্তি দিতে! আর আপনি আমায় যা সাহায্য করলেন, তার জন্যে একজন সরকারি কর্মকর্তা হিশেবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সালভাতর যে অপরাধী সেটা এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হবে সালভাতর, ইকথিয়ান্ডরও বিচারের খড়্গ থেকে রেহাই পাবে না।'

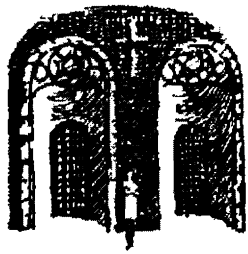

প্রতিভাবান উন্মাদ

মামলায় ড. সালভাতর ভেঙে পড়েন নি। হাজতে তিনি রইলেন আগের মতোই সুস্থির, আত্মস্থ, তদন্তকারী ও এক্সপার্টদের সঙ্গে কথা বলতেন একটা অহঙ্কারী প্রশ্রয়দানের ভঙ্গিতে, বড়োরা যেভাবে বলে বাচ্চাদের সঙ্গে।

চুপ করে বসে থাকা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। লেখাজোখা তিনি করেন অনেক, জেলের হাসপাতালের চমৎকার অস্ত্রোপচারও করেন কয়েকটি। তাঁর অন্যতম রোগী ছিল জেলরের স্ত্রী। বিষাক্ত ফোঁড়ায় জীবন বিপন্ন হয় তার। ডাক্তারের দল যখন হাল ছেড়ে দিয়ে বলে যে চিকিৎসাশাস্ত্র এক্ষেত্রে অক্ষম, সেই সময়েই অপারেশন করে তিনি তাকে বাঁচান।

বিচারের দিন এল।

আদালতের প্রকাণ্ড হলটায় লোক আর ধরে না। করিডোরে ভিড় করল তারা, সামনের চত্বরটা ভরে গেল, উঁকি দিতে লাগল খোলা জানলা দিয়ে। অনেক কৌতূহলী উঠে বসল আদালতগৃহের কাছের গাছটায়।

আসামির বেঞ্চিটায় শান্তভাবে বসে রইলেন সালভাতর। নিজের জন্য কোনো উকিল নেননি তিনি। মুখের ভাবে তাঁর এমনি মর্যাদা যে মনে হতে পারত যে তিনিই বিচারক—আসামি নন।

শত শত উৎসুক দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু সালভাতরের স্থির দৃষ্টির সামনে চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল অনেকেই।

ইকথিয়াণ্ডরকে নিয়েও লোকের আগ্রহ কম ছিল না, কিন্তু আদালত কক্ষে আনা হয়নি তাকে। ইদানীং শরীর তার খারাপ যাচ্ছিল, অনবরতই সে থাকছিল তার চৌবাচ্চায়, লুকিয়ে থাকত জ্বালিয়ে মারা কৌতূহলী চোখগুলো থেকে। সালভাতরের মামলায় সে ছিল মাত্র সাক্ষী, অভিশংসকের ভাষায়, অকাট্য একটা প্রমাণ।

ইকথিয়াণ্ডরের দৌরাত্ম্য নিয়ে মামলাটা হবে আলাদাভাবে, সালভাতরের পর।

অভিশংসককে ব্যাপারটা একইভাবেই চালাতে হয়, কারণ সালভাতরের মামলা নিয়ে তাড়া দিচ্ছিলেন বিশপ, ওদিকে ইকথিয়াণ্ডরের বিরুদ্ধে সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করতে হলে সময় দরকার। ভবিষ্যতে ইকথিয়াণ্ডরকে আসামি করে যে মামলাটা হবে তার সাক্ষীর খোঁজে অভিশংসকের এজেন্টরা জোর যাতায়াত শুরু করলে পুলকেরিয়া 'লা পালমেরাতে', তবে সন্তর্পণে। বিশপ কিন্তু অভিশংসককে এই ইঙ্গিত দিয়েই চললেন যে হতভাগ্য ইকথিয়াণ্ডরকে ঈশ্বর নিজের কাছে টেনে নিলেই সবচেয়ে ভালো হয়। মৃত্যুটা সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো প্রমাণ হবে যে মানুষের হস্তক্ষেপে কেবল ঐশ্বরিক সৃষ্টিটারই অকল্যাণ হয়।

তিনজন বৈজ্ঞানিক এক্সপার্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাঁদের সিদ্ধান্ত পড়ে গেলেন। একটি কথাও ফসকে যেতে না দিয়ে প্রচণ্ড মনোযোগে তা শুনলে গোটা প্রেক্ষাগৃহ।

'আদালতের নির্দেশক্রমে'—শুরু করলেন এক্সপার্টদের মুখপাত্র, বর্ষীয়ান অধ্যাপক শেইন, 'আমরা প্রফেসর সালভাতর যে সব জন্তুর ওপর অপারেশন চালান তাদের এবং ইকথিয়ান্ডরকে পরীক্ষা করে দেখেছি। তার ছোটো হলেও অতি সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি ও অস্ত্রোপাচার কক্ষও আমরা দেখেছি। প্রফেসর সালভাতর শুধু বৈদ্যুতিক ব্যবচ্ছেদ ও অতিবেগুনি রশ্মি মারফত নির্বীজন ইত্যাদি অতি সাম্প্রতিক সব পদ্ধতিই প্রয়োগ করেন না, এমন সব যন্ত্র তার আছে যা বিশ্বের সার্জনদের অজ্ঞাত। নিশ্চয় তাঁর নির্দেশেই তা তৈরি, জীবজন্তুদের ওপর প্রফেসর সালভাতরের অপারেশন সম্পর্কে আমি বেশি কিছু বলব না। পরীক্ষাগুলোর পরিকল্পনা অসাধারণ দুঃসাহী, সম্পন্নও হয়েছে চমৎকার। টিসু এবং গোটাগুটি এক-একটা অঙ্গের অবরোপণ, দুটি জন্তুকে এক সঙ্গে জোড়া লাগানো, একশ্বাসী জন্তুদের দ্বিশ্বাসীতে এবং দ্বিশ্বাসীদের একশ্বাসীতে, মাদিকে মর্দায় পরিণতকরণ সম্ভব হয়েছে, পুনঃযৌবন লাভের নতুন প্রকরণ বেরিয়েছে। সালভাতরের বাগানে কয়েক মাস থেকে শুরু করে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত নানা বয়সের কিছু রেড-ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েও আমরা দেখেছি।'

'ছেলেগুলোকে কী অবস্থায় দেখলেন?' জিজ্ঞাসা করলেন অভিশংসক।

'সবাই সুস্থ, প্রাণোচ্ছল। বাগানে হুটোপুটি করে বেড়ায়, খেলা জমায়। ওদের অনেকেরই প্রাণ বাঁচিয়েছেন সালভাতর। রেড-ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস আছে তাঁর ওপর, আলাস্কা থেকে তেরাদেল-ফুয়েগো পর্যন্ত নানা দূর-দূর থেকে এস্কিমো, ইয়াগান, আপাচি, তাউলিপাঙ্গি, পানো, আরাউকানিরা...'

একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

'এইসব জাতিই তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসে এখানে।'

অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন অভিশংসক। বিশপের সঙ্গে আলাপের ফলে তাঁর ভাবনা অন্য ধারায় বাঁক নেবার পর থেকে তিনি আর শান্তভাবে সালভাতরের প্রশংসা শুনতে পারতেন না। জিজ্ঞেস করলেন :

'আপনি কি ভাবছেন সালভাতরের অপারেশনগুলো হিতকর এবং যুক্তিযুক্ত?'

কিন্তু পাছে এক্সপার্ট হ্যাঁ বলে বসে, এই ভয়ে কঠোর-দর্শন বৃদ্ধ বিচারপতি তাড়াতাড়ি করে বাধা দিলেন :

'বৈজ্ঞানিক প্রশ্নে এক্সপার্টের ব্যক্তিগত মতামতে আদালতের আগ্রহ নেই। আপনি বলে যান, আরাউকান জাতের ছেলে ইকথিয়ান্ডরকে পরীক্ষা করে কী পেলেন?'

'দেহ তার কৃত্রিম আঁশে ঢাকা'—বলে গেলেন এক্সপার্ট, 'নমনীয় তবে খুবই মজবুত কী একটা জিনিসে তা বানানো, তার বিশ্লেষণ এখনো শেষ হয় নি। জলের তলে ইকথিয়ান্ডর মাঝে মাঝে চশমা ব্যবহার করে, বিশেষ এক ধরনের ফ্লিন্ট-কাচে তা তৈরি, তার রিফ্র্যাকশন ইনডেক্স প্রায় দুই। এতে জলের তলে সে ভালো দেখতে পায়। ইকথিয়ান্ডরের আঁশ ছাড়িয়ে নেবার পর আমরা তার কাঁধের হাড়ের নিচে দুই দিকেই দশ সেন্টিমিটার ব্যাসের দুটো ফুটো দেখতে পাই, পাঁচটি পাতলা-পাতলা ফালি দিয়ে তা ঢাকা, অনেকটা হাঙরের কানকোর মতো।'

বিস্ময়ের চাপা গুঞ্জন উঠল হলে!

'হ্যাঁ'—বলে গেলেন এক্সপার্ট 'অবিশ্বাস্য ঠেকলেও ইকথিয়ান্ডরের দুই-ই আছে—মানুষের ফুসফুস, সেই সঙ্গে হাঙরের কানকো। সেই জন্যেই ও জলে-ডাঙায়—দু'খানেই থাকতে পারে।'

'উভচর মানুষ?' বিদ্রূপভরে জিজ্ঞাসা করলেন অভিশংসক।

'হ্যাঁ, এক ধরনের উভচর মানুষই—দ্বিশ্বাসী।'

'কিন্তু ইকথিয়ান্ডর অমন হাঙরের কানকো পেল কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করলেন বিচারপতি। হতাশ ভঙ্গিতে হাত গুলটালেন এক্সপার্ট।

'এটা প্রহেলিকা, হয়তো তা আমাদের বুঝিয়ে দেবেন স্বয়ং প্রফেসর সালভাতর। আমাদের অভিমত এইরকম : হেকেলের সূত্র অনুসারে কোনো জীবপ্রজাতি তার যুগযুগের বিবর্তনে যেসব রূপ অতিক্রম করে আজকের রূপে পৌঁছিয়েছে, গর্ভে সে এখনো সেই সব রূপের মধ্যে দিয়ে যায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানুষের পূর্বপুরুষ একদা কানকো দিয়ে নিশ্বাস নিত।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিলেন অভিশংসক, কিন্তু বিচারপতি ইঙ্গিতে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

'বিশ দিনের দিন মানব-ভ্রূণে পর পর চারটি কানকোর মতো থাক গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে তার রূপান্তর হয়। কানকোরূপী প্রথম থাকটার উপরাংশ পরিণত হয় শ্রবণ ছিদ্রসহ কানের হাড় ও ইউরেস্টকিয়ান নলে, নিম্নাংশ পরিণত হয় নিচের চোয়ালে। দ্বিতীয়টি হিঅয়েড অস্থিতে, তৃতীয়টি দেহে ও থাইরয়েড কার্টেলেজ প্রক্রিয়ায়। আমরা মনে করি না যে ভ্রূণ অবস্থাতেই ইকথিয়ান্ডরের এ বিকাশ ঠেকাতে পেরেছিলেন প্রফেসর সালভাতর। এমন ঘটনা দেখা গেছে যে, পরিণত মানুষের দেহেও অবিকশিত কানকোর ছিদ্র রয়ে গেছে গলায়, চোয়ালের নিচে, যাকে বলে এ্যাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা। কিন্তু তা দিয়ে জলের তলে নিশ্বাস নেবার কোনো কথাই ওঠে না। ভ্রূণের অস্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত দুইয়ের একটি : হয় কানকো বাড়তেই থাকত, কিন্তু শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্যান্য দেহাংশের ক্ষতি করে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ইকথিয়ান্ডর হয়ে দাঁড়াত আধা-মাছ আধা-মানুষের মাথাওয়ালা এক বিকটাঙ্গ; নয়ত মানুষের স্বাভাবিক বিকাশই জয়লাভ করত, উধাও হত কানকো। কিন্তু ইকথিয়ান্ডর স্বাভাবিক বিকশিত মানুষ, শ্রবণেন্দ্রিয় খাসা, নিচের চিবুক সুবিকশিত, ফুসফুস স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে আর সুপরিণত কানকো। কানকো আর ফুসফুস ঠিক কীভাবে কাজ চালায়, তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কী, কানকো তার জল নেয় কি মুখ আর ফুসফুসের মধ্য দিয়ে, নাকি তার কানকোর ঠিক ওপরে যে দুটো ফুটো দেখেছিলাম তাই দিয়ে, সেটা আমরা জানি না। ইকথিয়ান্ডরের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেই কেবল এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়। আবার বলছি, প্রহেলিকা, তার জবাব দেবার কথা স্বয়ং প্রফেসর সালভাতরের। তিনিই বলতে পারেন কীভাবে সব হল কুকুর-রূপী জাগুয়ার, প্রভৃতি অদ্ভুত জন্তু এবং ইকথিয়ান্ডরের দোসর এই উভচর বানরগুলোর।'

'আপনাদের মোট উপসংহার কী?' জিজ্ঞেস করলেন বিচারপতি।

প্রফেসর শেইন নিজেই একজন বড়ো বিজ্ঞানী ও অস্ত্র-চিকিৎসক হিশেবে বিখ্যাত। কিন্তু খোলাখুলিই তিনি বললেন :

'সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটার কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, প্রফেসর সালভাতর যা করেছেন তা শুধু এক বিশাল প্রতিভাধরের পক্ষেই সম্ভব। বোঝা যায়, সালভাতরের ধারণা হয়েছে যে সার্জারিতে তিনি এতই নৈপুণ্য অর্জন করেছেন যে এখন জীবজন্তু, মানুষের দেহকে যেমন খুশি কেটেকুটে বসিয়ে দিতে পারেন। এবং সত্যিই বাস্তবে সেটা চমৎকার করলেও তাঁর দুঃসাহস ও কল্পনার পরিধি প্রায়... উন্মত্ততার পর্যায়ে পড়ে।' অবজ্ঞার হাসি ফুটল সালভাতরের মুখে।

তিনি জানতেন না যে, বিশেজ্ঞরা তাঁর মানসিক অবস্থার কথা তুলে কারাবাসের বদলে হাসপাতালের ব্যবস্থা করে তাঁর দণ্ড লঘু করতে চেয়েছিলেন।

'অবশ্য জোর করে এ কথা বলছি না যে প্রফেসর সালভাতর উন্মাদ!' হাসিটা চেখে পড়ায় বললেন এক্সপার্ট, 'তবে সে যাই হোক, অন্তত আমাদের মতে আসামিকে মানসিক রোগের স্যানাটোরিয়মে পাঠিয়ে দীর্ঘদিন ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত।'

'মানসিক বিকারের প্রশ্নটা নতুন প্রশ্ন, আদালত সেটা পরে বিচার করবে'—বললেন বিচারপতি, 'প্রফেসর সালভাতর, এক্সপার্ট ও অভিশংসকের কতকগুলো প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?'

'দেব'—বললেন সালভাতর, 'তবে সেই হবে আমার চূড়ান্ত বক্তব্য।'

আসামির জবানবন্দি

শান্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন সালভাতর, চারদিকে চোখ বুলিয়ে কাকে যেন খুঁজলেন। দর্শকদের মধ্যে বালতাজার, ক্রিস্টো, জুরিতাকে দেখতে পেলেন তিনি। সামনের সারিতে বসে ছিলেন বিশপ। দৃষ্টিটা কিছুক্ষণ তাঁর ওপর নিবদ্ধ করে রাখলেন সালভাতর। মুখে তাঁর অলক্ষ হাসি ফুটে উঠল। তারপর চোখ দিয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলেন তিনি।

'এখানে আমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত লোকটিকে তো দেখছি না'—অবশেষে বললেন তিনি।

'আমি ক্ষতিগ্রস্ত!' হঠাৎ লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বালতাজার। ক্রিস্টো ভাইয়ের আস্তিন ধরে তাকে টেনে বসিয়ে দিলেন।

'কোন ক্ষতিগ্রস্তের কথা আপনি বলছেন?' জিজ্ঞেস করলেন বিচারপতি, 'যদি আপনার বিকৃত-দেহ জানোয়ারগুলোর কথা ভেবে থাকেন, তাহলে বলি যে আদালত তাদের এখানে প্রদর্শন করার প্রয়োজন বোধ করে নি। আর যদি উভচর মানুষ ইকথিয়াণ্ডরের কথা ভেবে থাকেন, তাহলে সে আদালত ভবনেই আছে।'

'আমি প্রভু ঈশ্বরের কথা বলছি'—শান্তভাবে গুরুত্ব সহকারেই বললেন সালভাতর।

এ জবাব শুনে বিচারপতি হতভম্বের মতো কেদারার পিঠে ঠেস দিলেন। সত্যিই কি সালভাতর পাগল হয়ে গেছেন? নাকি কারাদণ্ড এড়াবার জন্যে পাগলামির ভান করছেন?' জিজ্ঞেস করলেন :

'আপনি ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন?'

'আমার ধারণা, আদালতের কাছে তা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়'—বললেন সালভাতর, 'এ ব্যাপারে প্রধানত ও একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত কে? স্পষ্টতই প্রভু ঈশ্বর। আদালতের মতে, আমার ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আমি তাঁর প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ন করেছি, হানা দিয়েছি তাঁর এক্তিয়ারে। নিজের সৃষ্টিতে তিনি বেশ সন্তুষ্টই ছিলেন, হঠাৎ কিনা কোন এক ডাক্তার এসে বললে, 'ওটা ভালো করে গড়া হয় নি, ঢেলে সাজা দরকার।' এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নিজের মতো করে অদলবদল করতে শুরু করল...'

'এ একেবারে ঈশ্বরদ্রোহিতা, আসামির কথাগুলো রেকর্ড করে রাখা হোক!' এমন ভাব করে অভিশংসক দাবিটা জানালেন যেন তাঁর পবিত্র ধর্মে ঘা লেগেছে।

কাঁধ ঝাঁকালেন সালভাতর।

'অভিযোগপত্রে যা আছে তার মূল কথাটাই আমি বলছি। সমস্ত নালিশ কি কেবল এইটেতেই দাঁড়াচ্ছে না? ফাইলটা আমি পড়েছি। প্রথমে আমার বিরুদ্ধে কেবল এই নালিশ ছিল যে আমি ব্যবচ্ছেদ করে অঙ্গবিকৃতি ঘটিয়েছি। এখন আমার বিরুদ্ধে ঐশ্বরিক পবিত্রতাহানির অভিযোগ এসেছে। এ হাওয়াটি এল কোত্থেকে? ক্যাথড্রাল থেকে নয়ত?'

বিশপের দিকে তাকালেন সালভাতর।

'আপনারাই এমন একটা মামলা সাজিয়েছেন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হিশেবে অদৃশ্য ফরিয়াদির স্থান নিয়েছেন প্রভু ঈশ্বর, আর আসামির কাঠগড়ার দাঁড়িয়েছেন আমার সঙ্গে সঙ্গে চার্লস ডারউইন। এ কক্ষে উপবিষ্টদের কেউ কেউ হয়তো আমার কথায় আরেকবার আহত বোধ করবেন, কিন্তু এটা আমি বলেই যাব যে পশু এমনকি মানুষের দেহযন্ত্রও সুসম্পূর্ণ নয়, তার সংশোধন প্রয়োজন। আশা করি, এ কক্ষে উপস্থিত ক্যাথড্রালের আচার্য, বিশপ জুয়ান-দে-গার্সিলাসো এ কথা সমর্থন করবেন।

কথাটায় চাঞ্চল্য জাগল হলে।

'উনিশ শ' পনের সালে, আমি ফ্রন্টে চলে যাবার কিছু আগে'—বলে গেলেন সালভাতর, 'শ্রদ্ধেয় বিশপের দেহযন্ত্রে একটা ছোট্ট সংশোধন করতে হয়েছিল আমায়। তাঁর অ্যাপেনডিক্স, অথবা লোকে যা বলে, তাঁর কানা নাড়ির ওই নিষ্প্রয়োজন ও ক্ষতিকর লেজুড়টিকে আমি কেটে বাদ দিই। ছুরি দিয়ে বিশপীয় দেহের একাংশ ছেঁটে দেওয়ায় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সদৃশ্যের ওপর যে বিকৃতি আমি ঘটাই, মনে হচ্ছে অপারেশন টেবিলে শোয়ার সময় আমার আধ্যাত্মিক রোগী তার কোনো প্রতিবাদ করেন নি। তাই নাকি? বিশপের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সালভাতর।

নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন জুয়ান-দে-গার্সিলাসো। শুধু সামান্য রাঙা হয়ে উঠল তাঁর গাল, ঈষৎ কেঁপে গেল সরু-সরু আঙুলগুলো।

'তাছাড়া, আমি যখন ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস চালাতাম এবং নবযৌবন লাভের অপারেশন করতাম, তখনকার আরেকটা ঘটনাও কি বলব? যৌবন লাভের অনুরোধ নিয়ে আমার দ্বারস্থ হন নি কি শ্রদ্ধেয় অভিশংসক সেনর আগুস্তো-দে...'

এ কথার প্রতিবাদ করতে গেলেন অভিশংসক, কিন্তু শ্রোতাদের তুমুল অট্টহাস্যে কথা তাঁর শোনা গেল না।

'অনুরোধটা অভিযোগকর্তাদের কাছে জানালেই অনেক সঙ্গত হত'—বললেন সালভাতর, 'আমি নই, আদালতই প্রশ্নটা এইভাবে রেখেছে। এখানকার উপস্থিতরা সবাই যে কেবল গতকালের বানর, এমনকি মাছ, কথা কইতে ও শুনতে পাচ্ছে কেবল কানকোর ভাঁজগুলো শ্রবণ ও বাকযন্ত্রে পরিণত হওয়ার ফলে—এ কথা শুনে কেউ কেউ কি আর আঁতকে উঠছেন না? মানে, ঠিক বানর বা মাছ না হলেও তাদের বংশধর।' অভিশংসকের অধৈর্য লক্ষ করে সালভাতর তাঁর দিকে ফিরলেন, 'চঞ্চল হবেন না! আমি এখানে কারো সঙ্গে তর্ক জুড়তে বা বিবর্তনবাদ নিয়ে বক্তৃতা শোনাতে যাচ্ছি না।' তারপর কিছুক্ষণ থেমে সালভাতর বললেন, 'বিপদটা এই নয় যে মানুষ পশু থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সর্বনাশের কথা বরং এই যে মানুষ পশুই থেকে যাচ্ছে...রূঢ়, হিংস্র, নির্বোধ। আমার সহযোগী বিজ্ঞানী খামোকাই আপনাদের ভয় দেখিয়েছেন। ভ্রূণের বিকাশের কথাটা উনি না বললেও পারতেন। ভ্রূণকে প্রভাবিত করা বা জীবজন্তুর সংকর সৃষ্টি করার দিকে আমি যাই নি। সার্জন হিশেবে লোকের চিকিৎসা করতে হয়েছে আমায়। প্রায়ই টিসু, প্রত্যয়, গ্ল্যান্ড বসাতে হয়েছে নতুন করে। পদ্ধতিটাকে নিখুঁত করে তোলার জন্য জীবজন্তুর দেহে পরীক্ষা চালিয়েছি আমি।'

'অপারেশন-করা জন্তুদের দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করেছি আমার ল্যাবরেটরিতে, নতুন এমনকি একেবারেই অস্বাভাবিক একটা জায়গায় বসিয়ে দেওয়া অঙ্গগুলোয় কী প্রক্রিয়া চলছে তা ধরতে চেষ্টা করেছি। পর্যবেক্ষণ শেষ হলে জন্তুটাকে ছেড়ে দেওয়া হত বাগানে। এইভাবেই গড়ে উঠেছে আমার জীব-মিউজিয়াম। সুদূর প্রজাতি—যেমন মাছ আর স্তন্যপায়ীদের দেহাঙ্গের আদান-প্রদানের সমস্যাটা আমায় খুবই আগ্রহী করে তোলে।

এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা যেটাকে একেবারেই অকল্পনীয় মনে করেন, সেটা আমি ঘটাতে পেরেছি। তাতে অবাক হবার কী আছে? আমি আজ যা করেছি, কাল সেটা করবেন মামুলি সার্জনরা। জার্মান জাউয়েরব্রুখের বিগত অপারেশনটার কথা প্রফেসর শেইন নিশ্চয় জানেন। রুগ্ণ উরু কেটে তিনি সেখানে নালির হাড় বসিয়ে দিয়েছেন।'

'কিন্তু ইকথিয়ান্ডর?' জিজ্ঞেস করলেন এক্সপার্ট।

'হ্যাঁ, ইকথিয়ান্ডর। এ আমার গর্বের ধন। ইকথিয়ান্ডরের অপারেশন শুধু টেকনিক্যাল দুরূহ তাই ছিল না। মানব দেহযন্ত্রের গোটা প্রক্রিয়াটা বদলে দেবার প্রয়োজন হয়। আমার লক্ষ্যসিদ্ধ হবার আগে প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রাণ দিয়েছে ছ'টি বানর। তার পরেই কেবল জীবন শঙ্কা না করে ছেলেটিকে অপারেশন করি।'

'অপারেশনটা ঠিক কী?' জিজ্ঞাসা করলেন বিচারপতি।

'ছেলেটির দেহে আমি বাচ্চা হাঙরের কানকো বসিয়ে দিই, ফলে সে জলে স্থলে উভয়তে থাকার সুযোগ পায়।'

শ্রোতাদের মধ্যে বিস্ময়ের ধ্বনি উঠল। খবরটা দপ্তরে জানিয়ে দেবার জন্য তড়িঘড়ি টেলিফোন করতে ছুটল সাংবাদিকরা।

'পরে আরো বড়ো সাফল্য লাভ আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। যে উভচর বানরটিকে আপনারা দেখেছেন, ওটা আমার শেষ কাজ। ডাঙায়-জলে সর্বত্রই সে যতক্ষণ খুশি থাকতে পারে, দেহের কোনো ক্ষতি হয় না। আর জল ছাড়া ইকথিয়ান্ডর থাকতে পারে না তিন-চার দিনের বেশি। বিনা জলে ডাঙায় বেশি থাকা তার পক্ষে ক্ষতিকর—ফুসফুস ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শুকিয়ে ওঠে কানকো, পাঁজরায় শূল বেদনা শুরু হয় ইকথিয়ান্ডরের। দুঃখের বিষয়, আমি ওর জন্যে যে রুটিন বেঁধে দিয়েছিলাম, আমার অনুপস্থিতির সময় সেটা সে ভঙ্গ করে, ডাঙায় থাকতে শুরু করে বেশিক্ষণ, ফুসফুস ওর কাহিল হয়ে পড়েছে, গুরুতর রোগে ধরেছে তাকে। দেহের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে, এখন অধিকাংশ সময়েই তাকে জলে থাকতে হবে। উভচর মানুষ থেকে পরিণত হচ্ছে মানবিক মাছে...'

'আসামিকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই'—উঠে দাঁড়িয়ে বিচারপতির উদ্দেশে বললেন অভিশংসক : 'উভচর মানুষ গড়ার আইডিয়াটা সালভাতরের মাথায় এল কীভাবে, কী তাঁর উদ্দেশ্য?'

'আইডিয়াটা ওই তো বলেছি। মানুষ সুসম্পূর্ণ নয়। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষ তার পূর্বপুরুষ জীবদের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলেও নিম্নস্তরের প্রাণীদের অনেক গুণ হারিয়েছে। যেমন জলে বাস করতে পারলে মানুষের সুবিধা হয় অনেক। দেওয়া যাক না তাকে সে সুযোগটা? জীবের ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে স্থলচর জীব ও পাখি এসেছে জলচর প্রাণী থেকে, মহাসাগর থেকে। জানি যে কিছু স্থলচর প্রাণী ফের জলে ফিরে গেছে। ডলফিন ছিল মাছ, ডাঙায় উঠে আসে, হয়ে দাঁড়ায় স্তন্যপায়ী জন্তু, কিন্তু ফের চলে যায় জলে, তবে তিমির মতো স্তন্যপায়ীই থেকে যায়। তিমি আর ডলফিন দুই-ই ফুসফুস দিয়ে নিশ্বাস নেয়। ডলফিনকে দ্বিশ্বাসী উভচরে পরিণত করা যেত, ইকথিয়ান্ডর আমায় সেই অনুরোধ জানায়, সেক্ষেত্রে তার বন্ধু ডলফিন লিডিঙ তার সঙ্গে জলের তলে থাকতে পারত বেশিক্ষণ। আমিও অপারেশনটা করব ঠিক করেছিলাম। মানুষদের মধ্য থেকে প্রথম মাছ, আর মাছেদের মধ্য থেকে প্রথম মানুষ—ইকথিয়ান্ডরের কেমন যেন একলা-একলা লাগত। আর তার দেখাদেখি যদি অন্য মানুষও সমুদ্রে নামত, জীবন হয়ে উঠত একেবারে অন্যরকম। জল নামক এই পরাক্রান্ত ভৌতশক্তি তখন হত মানুষের বশীভূত। কী সে শক্তি জানেন কী? পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশই জলে ঢাকা। কিন্তু সে শুধু উপরিপৃষ্ঠের কথা। গর্ভে তার অফুরন্ত

খাদ্য, তার শিল্পের কাঁচামাল। কোটি কোটি, শত শত কোটি লোক এঁটে যাবে তাতে, লোক থাকবে জলের তলে, স্তরে স্তরে। ঠেলাঠেলি, ঘেঁষাঘেঁষি কিছুরই প্রয়োজন হবে না।

'আর কী তার শক্তি! আপনারা হয়তো জানেন যে মহাসমুদ্র যে পরিমাণ সৌর তেজ শুষে নেয় তা ৭৯০০ কোটি অশ্বশক্তির সমতুল্য। বাতাসে তাপের প্রত্যাবর্তন ও অন্যান্য লোকসান না ঘটলে সমুদ্র অনেক আগেই ফুটতে থাকত। শক্তির এ-এক অক্ষয় ভাণ্ডার। স্থলচর মানুষ তাকে কী কাজে লাগাচ্ছে? প্রায় কিছুই না।

'আর সামুদ্রিক স্রোতের শক্তি? শুধু গালফ স্ট্রিম আর ফ্লোরিডা স্রোতেই ৯১০০ কোটি টন জল বয়ে যায় প্রতি ঘণ্টায়; কোনো একটা মহানদীর প্রায় ৩০০০ গুণ। আর এ শুধু কেবল একটা সামুদ্রিক স্রোত। স্থলচর মানুষ এটাকে কী কাজে লাগাচ্ছে? প্রায় কিছুই না।

'আর সামুদ্রিক তরঙ্গ আর জোয়ার-ভাটার শক্তি! আপনারা জানেন যে তরঙ্গের ঘাতশক্তি আটত্রিশ হাজার কিলোগ্রামের সমান হতে পারে, এক বর্গমিটার পিছু আটত্রিশ টন, ওপরে উঠতে পারে তেতাল্লিশ মিটার, ফলে তা ধরা যাক, পাথর তুলতে পারে হাজার টন। আর জোয়ার ওঠে ষোলো মিটারেরও 'উঁচুতে'—চারতলা বাড়ির সমান। এ শক্তির কী সুবিধা নিচ্ছে মানুষ? প্রায় কিছুই না। ডাঙায় মানুষ ভূপৃষ্ঠ থেকে খুব ওপরে থাকতে পারে না, বেশি নামতে পারে না ভূগর্ভে। মহাসমুদ্রে বিষুব রেখা থেকে মেরু, ওপর থেকে তলদেশ সর্বত্রই অবাধ জীবন।

'মহাসাগরের অসীম সম্পদ আমরা কী কাজে লাগাচ্ছি? মাছ ধরি, আর সেটা নিতান্ত ওপরটুকু থেকে। সমুদ্রের গভীরটায় একেবারেই হাত পড়ে না। খুঁজে বেড়াই স্পঞ্জ, প্রবাল, মুক্তো, সামুদ্রিক উদ্ভিদ—এবং তাতেই শেষ। জলের তলে আমরা কিছু কিছু কাজ চালাই, সাঁকোর জন্যে খুঁটি গাড়ি, বাঁধ দিই, ডোবা জাহাজ টেনে তুলি। কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর এটুকুও আমরা করি অনেক মেহনত ঝরিয়ে, অনেক ঝুঁকি নিয়ে, মানুষের প্রাণ যায় কম নয়। হতভাগ্য মানুষ—জলের তলে দু'মিনিট থাকলেই তার শেষ, কী কাজ সে সেখানে করবে?

'কিন্তু ডাইভিং স্যুট আর অক্সিজেনের পাত্র ছাড়াই যদি মানুষ জলের তলে থাকতে ও খাটতে পারত, তাহলে সেটা হত একবারেই অন্য ব্যাপার। কত সম্পদই-না সে আবিষ্কার করত সেখানে! যেমন এই ইকথিয়ান্ডর আমায় বলেছিল...কিন্তু ভয় হচ্ছে হয়তো বা মানবিক লোলুপতার দানবকে খুঁচিয়ে তুলব...সমুদ্রতল থেকে ইকথিয়ান্ডর বিরল সব ধাতু ও আকরিকের নমুনা এনে দিয়েছিল আমায়। না-না, উত্তেজিত হবেন না, ও এনে দিয়েছিল মাত্র সামান্য কিছু নমুনা, কিন্তু বিশাল বিশাল খনিস্তর থাকা সেখানে খুবই সম্ভব।

'আর ডুবে যাওয়া ধন?

'লুজিতানিয়া' জাহাজটার কথাই ধরুন। ১৯১৬ সালের বসন্তে এটিকে জার্মানরা ডুবিয়ে দেয় আয়র্ল্যান্ড উপকূলের কাছে। তার সহস্রাধিক যাত্রীর কাছে ধনসম্পদ যা ছিল তাছাড়াও এ জাহাজে ছিল ১৫ কোটি ডলার পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা এবং পাঁচ কোটি ডলার মূল্যের স্বর্ণপিণ্ড।' (বিস্ময়ের ধ্বনি শোনা গেল কক্ষে) 'তাছাড়া আমস্টারডামে পৌঁছবার জন্যে হিরে-ভরা দুটি পেটিকা ছিল 'লুজিতানিয়া'য়। বিশ্বের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ হীরক 'কালিফ' ছিল তার ভেতরে—কোটি কোটি টাকা তার দাম। বলাই বাহুল্য, ইকথিয়ান্ডরের মতো মানুষও খুব গভীরে নামতে পারে না, তার জন্যে গড়া দরকার এমন মানুষ' (অভিশংসকের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল), 'যা গভীর জলের মাছের মতো প্রবল চাপ সইতে পারে। বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়, অবশ্যই চট করেই না।'

'মনে হচ্ছে আপনি সর্বশক্তিশান ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে চাইছেন?' টিপ্পনি কাটলেন অভিশংসক।

সালভাতর সেদিকে দৃকপাত না করে বলে চললেন :

'মানুষ যদি জলে থাকতে পারত, তাহলে মহাসমুদ্রে ও সমুদ্রগর্ভ কাজে লাগাবার উদ্যোগটা চলত প্রচণ্ড বেগে। ভয়াবহ একটা রাক্ষসী ভৌতশক্তি হয়ে মহাসমুদ্র আর থাকত না। ডুবন্তদের জন্যে কাঁদবার প্রয়োজন ফুরুত আমাদের।'

মনে হল যেন শ্রোতাদের সকলের সামনে ফুটে উঠেছে মানুষের পদতলে বিজিত সমুদ্রগর্ভের ছবি। এমনকি বিচারপতিও স্থির থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন :

'তাহলে আপনার পরীক্ষাগুলোর ফলাফল আপনি প্রকাশ করলেন না কেন?'

'আসামির কাঠগড়ায় পৌঁছবার অত তাড়া ছিল না আমার'—হেসে জবাব দিলেন সালভাতর, 'তাছাড়া ভয় ছিল আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় আমার উদ্ভাবন উপকারের চেয়ে অপকারই করবে বেশি। এর মধ্যেই ইকথিয়ান্ডরকে নিয়ে লড়াই বেঁধে উঠেছিল। প্রতিহিংসার জ্বালায় কে রিপোর্ট দেয় আমার নামে? এই জুরিতা, যে ইকথিয়ান্ডরকে চুরি করে আমার কাছ থেকে। আর জুরিতার কাছ থেকে তাকে সম্ভবত চুরি করতেন মহামান্য জেনারেল অ্যাডমিরালরা, শত্রুজাহাজ ডোবাবার কাজে লাগাতেন। না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর লোলুপতা যে দেশে মহত্তম সব আবিষ্কারকে পরিণত করে অভিশাপে, বাড়িয়ে তোলে মানুষের যন্ত্রণা, সেখানে ইকথিয়ান্ডর আর তার মতো লোকদের আমি সাধারণ্যের আওতায় তুলে দিতে পারতাম না। আমি ভেবেছিলাম...'

অর্ধপথে থেমে গেলেন সালভাতর। তারপর গলার সুর ভয়ানক পাল্টে বলে উঠলেন :

'না, ও কথা আমি বলতে চাই না, লোকে ভাববে আমি উন্মাদ'—সহাস্যে সালভাতর তাকালেন এক্সপার্টের দিকে, 'না, উন্মাদ হবার সম্মান আমি প্রত্যাখ্যান করছি, তার সঙ্গে প্রতিভাধর কথাটা জুড়ে দিলেও। আমি পাগল নই, বাতিকগ্রস্ত নই। যা চেয়েছিলাম, তা কি করি না? নিজের চোখেই তো আপনারা আমার কাজগুলো দেখেছেন। যদি মনে করেন সে কাজ অপরাধ, তাহলে আইনের সমস্ত কঠোরতায় দণ্ড দিন। আমি কোনো প্রশ্রয়ের প্রার্থী নই।'

কারাগারে

ইকথিয়াণ্ডরকে যেসব এক্সপার্টরা পরীক্ষা করছিলেন, তাঁদের কাজ ছিল শুধু তার দৈহিক নয়, মানসিক অবস্থাও যাচাই করা।

'এটা কোন সাল? কত তারিখ? কী বার?' সাধারণত এই সব প্রশ্ন করলেন এক্সপার্টরা। আর প্রতি প্রশ্নেই ইকথিয়াণ্ডর বলল :

'জানি না।'

একান্ত সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতেও তার অসুবিধা হচ্ছিল। তাহলেও তাকে অপরিণতমস্তিষ্ক বলে রায় দেওয়া চলে না। যেভাবে সে বেড়ে উঠেছে তাতে অনেক কিছুই জানা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বয়স্ক শিশু হয়েই সে থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত এক্সপার্টরা এই রায় দিলেন : 'ইকথিয়াণ্ডর অকর্মণ্য' এতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বাতিল হয়ে গেল। আদালত মামলা তুলে নিয়ে তাকে অভিভাবকের হাতে সমর্পণ করতে বলল। অভিভাবক হবার দাবি জানাল দু'জন : জুরিতা আর বালতাজার।

প্রতিহিংসার জ্বালায় জুরিতা তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে, সালভাতরের এ কথা মিথ্যা নয়। তবে সেই সঙ্গে জুরিতার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। সে চাইছিল ফের ইকথিয়াণ্ডরকে দখল করবে, তাই তার অভিভাবক হতে চাইল সে। ভজনখানেক দামী মুক্তোর বিনিময়ে সে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হাত করল। উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে তার এখন আর বিশেষ বাধা নেই।

নিজের পিতৃত্বের উল্লেখ করে বালতাজার দাবি করেছিল তাকেই অভিভাকত্ব দেয়া হোক। তবে ফল হল না। লারার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এক্সপার্টরা মত দিলেন যে শুধু ক্রিস্টোর সাক্ষ্যে ভিত্তিতে বালতাজারের বিশ বছর আগের ছেলের সঙ্গে ইকথিয়াণ্ডরের অভিন্নতা শনাক্ত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া ক্রিস্টো হল বালতাজারের ভাই, ফলে তার কথায় এক্সপার্টদের বিশেষ ভরসা হয় নি।

লারা জানত না যে ব্যাপারটায় অভিশংসক ও বিশপের হাত ছিল। যার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে দেহ বিকৃত করা হয়েছে এমন একজন বাপ হিশেবে, ক্ষতিগ্রস্ত হিশেবে বালতাজারের প্রয়োজন ছিল কেবল মামলা চলার সময়। কিন্তু তার পিতৃত্ব মেনে নিয়ে ইকথিয়াণ্ডরকে তার হাতে সমর্পণ করার ইচ্ছে আদালত বা গির্জার কারোরই ছিল না। তাদের লক্ষ ছিল ইকথিয়াণ্ডরকে একদম সরিয়ে দেওয়া।

ক্রিস্টো উঠে এসেছিল তার ভাইয়ের কাছে, তার জন্য খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ল সে। আহার-নিদ্রা ভুলে বালতাজার নিঝুম হয়ে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, হঠাৎ কখনো উত্তেজিত হয়ে ছটফট করে বেড়াত দোকানটায়, 'ব্যাটা আমার! ব্যাটা আমার!' বলে ডাকত, ঝুলি উজাড় করে গালাগালি দিত স্পেনীয়দেব।

একবার এমনি এক চোট ক্ষ্যাপামির পর বালতাজার হঠাৎ ঘোষণা করল :

'শোন ভাই তোকে বলি, আমি জেলখানায় চললাম। আমার সেরা মুক্তোগুলো সেপাইদের দিয়ে ইকথিয়ান্ডরের সঙ্গে দেখা করব। বোঝাব ওকে। নিজেই ও আমায় বাপ বলে মেনে নেবে। ছেলে কখনো বাপকে না মেনে পারে! আমার রক্ত যে ওর মধ্যে কথা কইবে।'

ভাইকে ফেরাবার অনেক চেষ্টা করল ক্রিস্টো, ফল হল না। গোঁ ধরে রইল সে।

জেলখানায় গিয়ে সে কান্নাকাটি করলে সান্ত্রীদের কাছে, পায়ে ধরে সাধল, হাতে মুক্তো গুঁজে দিয়ে দিয়ে পৌঁছল ফটক থেকে অন্দরে, এবং শেষ পর্যন্ত ইকথিয়ান্ডরের কুঠরিতে।

গরাদে বসানো সঙ্কীর্ণ জানলায় সামান্য আলো এসে পড়েছে ছোট্ট ঘরখানায়। ভেতরটা গুমোট, দুর্গন্ধ হয়েছে : প্রহরীরা চৌবাচ্চার জল বিশেষ বদলাত না, অস্বাভাবিক এই বন্দির আহার হিশেবে যে মাছ দেওয়া হত তার পচা উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে মেঝেতেই।

লোহার চৌবাচ্চাটা ছিল জানলার উল্টোদিকে, দেয়াল ঘেঁষে।

বালতাজার এসে তাকালে তার অন্ধকার জলে, যার তলে লুকিয়ে আছে ইকথিয়ান্ডর।

'ইকথিয়ান্ডর! আস্তে করে ডাকল সে 'ইকথিয়ান্ডর!'

জলের উপরিভাগে একটা স্পন্দন খেলে গেল, কিন্তু ইকথিয়ান্ডর দেখা দিল না।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বালতাজার তার কাঁপা কাঁপা হাতখানা ডুবিয়ে দিলে উক্ত জলের মধ্যে। হাত ঠেকল ইকথিয়ান্ডরের কাঁধে।

হঠাৎ ভেজা মাথা ভেসে উঠল ইকথিয়ান্ডরের। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল:

'কে আপনি? কী চাই?'

দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে, নতজানু হয়ে বালতাজার দ্রুত বলতে লাগল :

'ইকথিয়ান্ডর! তোর বাবা এসেছে তোর কাছে। তোর সত্যিকারের বাবা। সালভাতর তো বাবা নয়। খারাপ লোক সে। তোর দেহ বিকৃত করেছে সে। ইকথিয়ান্ডর! ইকথিয়ান্ডর! ভালো করে একবার আমার দিকে চেয়ে দ্যাখ। চিনতে পারছিস না নিজের বাপকে?'

ইকথিয়ান্ডরের ঘন চুল বেয়ে ধীরে ধীরে জল নেমে আসছিল তার বিষণ্ন মুখে, টিপটিপিয়ে পড়ছিল থুতনি থেকে। কিছুটা অবাক হয়ে দুঃখিত চোখে সে তাকাল বৃদ্ধ রেড-ইন্ডিয়ানের দিকে।

'আমি তো আপনাকে চিনি না'—বলল সে।

'ইকথিয়ান্ডর!' চেঁচিয়ে উঠল বালতাজার, 'ভালো করে চেয়ে দ্যাখ আমার দিকে!' তারপর হঠাৎ ইকথিয়ান্ডরের মাথাটা নিজের কাছে টেনে এনে তপ্ত অশ্রু আর অজস্র চুম্বনে ভরে দিতে লাগল।

অপ্রত্যাশিত এই আদর থেকে আত্মরক্ষায় ইকথিয়ান্ডর ছলবলিয়ে উঠল চৌবাচ্চার মধ্যে, জল উপচে পড়ল পাথুরে মেঝেয়।

এই সময় কার একখানা হাত এসে সজোরে কলার চেপে ধরল বালতাজারের, তাকে শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেললে কোণে। পাথুরে দেয়ালে প্রচণ্ড মাথা ঠুকে ধপাস করে পড়ল বালতাজার।

চোখ মেলতেই বালতাজারের চোখে পড়ল জুরিতা দাঁড়িয়ে আছে। ডানহাত ঘুষি থাকিয়ে বাঁ হাতে কী একটা কাগজ নাড়াচ্ছে বিজয়ীর মতো।

'এই দ্যাখ, আমার ওপর ইকথিয়ান্ডরের অভিভাবকত্ব দেবার হুকুমনামা। ধনীছেলের খোঁজ তোকে করতে হবে অন্য জায়গায়। আর এটিকে আমি নিজের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি কালকে। বুঝেছিস?'

মাটিতে পড়ে থেকেই বালতাজার চাপা গর্জে উঠল।

পরের মুহূর্তেই বন্য হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠল সে, শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। হাত থেকে তার কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মুখে পুরে দিলে এবং ক্রমাগত ঘুষি মারতে লাগল জুরিতাকে। শুধু হল প্রচণ্ড মারামারি।

হাতে চাবি নিয়ে জেলখানার সেপাই দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখাই তার কর্তব্য বলে সে গণ্য করেছিল। দু'জনের কাছ থেকেই ভালো ঘুস পেয়েছিল সে, কারো পক্ষেই হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছে ছিল না তার। কেবল জুরিতা যখন বুড়োর টুঁটি চেপে পিষতে লাগল তখন চঞ্চল হয়ে উঠল সে।

'না, না, টুঁটি চিপে মারবেন না!'

জরিতা কিন্তু ক্ষেপে উঠেছিল, সান্ত্রীর কথায় সে কানই দিল না। কুঠরিতে এই সময় নতুন এক ব্যক্তির আগমন না ঘটলে বালতাজারের কপালে কী হত বলা যায় না।

'চমৎকার! অভিভাবক মশায় তাঁর অভিভাবকত্ব ফলানোর তালিম নিচ্ছেন দেখি!' শোনা গেল সালভাতরের গলা, 'আর আপনি হাঁ করে কী দেখছেন? নিজের কী কর্তব্য জানেন না?'

সেপাইটাকে তিনি এমন সুরে ধমকে উঠলেন যেন তিনিই জেলখানার কর্তা।

সালভাতরের চিৎকারে কাজ হল। মারপিট ছাড়িয়ে দেবার জন্য ছুটে এল সেপাই।

গোলমালে আরো কিছু সেপাই জুটল। অচিরেই বালতাজার আর জুরিতা—দু'দিকে দু'জনকে সরিয়ে দিল তারা।

জুরিতা নিজেকে বিজয়ী বলে ভাবতে পারত। কিন্তু বিজিত সালভাতর তখনো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে শক্তিমান। এমনকি এখানে এই কুঠরিতে, আটক বন্দি অবস্থাতেও ঘটনা ও লোকের ওপর দখল সালভাতরের যায় নি।

'কুঠরি থেকে সরিয়ে নিয়ে যান ওই গুণ্ডা দুটোকে'—সেপাইদের হুকুম দিলেন সালভাতর, ইকথিয়ান্ডরের কাছে আমি থাকব একলা।'

সে হুকুম মেনে নিলে সেপাইরা। গালাগাল ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও জুরিতা আর বালতাজারকে বার করে দিল তারা। বন্ধ হল কুঠরির দরজা। করিডোরে অপসৃয়মাণ কণ্ঠস্বর থেমে যাবার পর সালভাতর চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে ইকথিয়ান্ডরকে বললেন :

'উঠে এসো ইকথিয়ান্ডর। ঘরের মাঝখানটায় এসে দাঁড়াও। তোমায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

ইকথিয়ান্ডর এসে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ এইখানে, আলোর কাছটায়'—বললেন সালভাতর, 'নিশ্বাস নাও, আরো জোরে, এবার থাম, আচ্ছা...'

সালভাতর তার বুকে টোকা দিয়ে দিয়ে দেখলেন, শুনলেন তার ছেঁড়া-ছেঁড়া নিশ্বাস।

'নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, বাবা'—বলল ইকথিয়ান্ডর।

'তোমারই দোষ'—বললেন সালভাতর, 'ডাঙায় অত বেশি সময় থাকা তোমার উচিত হয় নি।'

মাথা নিচু করে কী ভাবতে লাগল ইকথিয়ান্ডর। তারপর হঠাৎ মাথা তুলে সোজাসুজি সালভাতরের দিকে চেয়ে শুধাল :

'কিন্তু কেন উচিত হয় নি, বাবা? সবাই থাকে আর আমার থাকা চলবে না কেন?'

মামলায় জবাব দেবার চেয়েও তিরস্কার-ভরা এই দৃষ্টি সহ্য করা সালভাতরের পক্ষে কঠিন হয়েছিল। তাহলেও দমলেন না তিনি।

'তার কারণ তুমি এমন একটা জিনিস পারো যা আর কেউ পারে না। জলে ডুবে থাকতে পারো তুমি.. কোনটা তুমি চাইবে ইকথিয়ান্ডর, সবাই যেমন থাকে তেমনি ডাঙায় থাকা, নাকি কেবল জলে থাকা?'

'জানি না'—একটু ভেবে বলল ইকথিয়ান্ডর। জলতলের জগত আর ডাঙা, গুস্তিয়েরে—দুই-ই তার কাছে সমান প্রিয়। কিন্তু গুস্তিয়েরেকে তো এখন আর সে পাবে না...

'এখন আমি সমুদ্রই চাইব'—বলল ইকথিয়ান্ডর।

'আমার কথা না শুনে দেহের ভারসাম্য নষ্ট করে বাছাইটা তুমি আগেই করে বসেছ, ইকথিয়ান্ডর। এখন তুমি বেঁচে থাকতে পারবে কেবল জলে।'

'কিন্তু এই বিছছিরি নোংরা জলে নয়, বাবা। এখানে আমি মরে যাব। আমি চাই খোলামেলা সমুদ্র!'

নিশ্বাস চাপলেন সালভাতর।

জেলখানা থেকে তোমায় তাড়াতাড়ি খালাস করবার জন্য আমি যথাসাধ্য করব, ইকথিয়ান্ডর। ভেঙে পড়বে না কখনো'—ইকথিয়ান্ডরের পিঠে চাপড় দিয়ে সালভাতর বেরিয়ে গেলেন।

নিজের কুঠরিতে সরু টেবিলের সামনে টুলে বসে চিন্তায় ডুবে গেলেন সালভাতর।

যে কোনো সার্জনের মতোই ব্যর্থতাও সইতে হয়েছে তাঁকে। নৈপুণ্য অর্জনের আগে তাঁর ছুরির তলে, তার নিজস্ব ত্রুটির দরুন মানবজীবন নষ্ট হয়েছে কম নয়। কিন্তু তা নিয়ে তিনি কখনো ভারাক্রান্ত বোধ করেন নি। কয়েক ডজন মরেছে, কিন্তু বেঁচে গিয়েছে কয়েক হাজার। এই অঙ্কটা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

কিন্তু ইকথিয়ান্ডরের ভাগ্যের জন্য তিনি নিজে দায়ী। ইকথিয়ান্ডর ছিল তাঁর গর্ব। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিশেবে তাকে ভালোবাসতেন তিনি। তাছাড়া ও তাকে ভালোবাসতেন নিজের ছেলের মতো। ইকথিয়ান্ডরের রোগ আর তার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন সালভাতর।

দরজায় মৃদু টোকা পড়ল।

'ভেতরে আসুন'—বললেন সালভাতর।

'আপনার অসুবিধা ঘটালাম না তো, প্রফেসর?'মৃদু কণ্ঠে বললে জেলর।

'এতটুকু না।'—উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিলেন সালভাতর, 'আপনার স্ত্রী-পুত্র কেমন আছে?'

'ভালোই আছে, ধন্যবাদ। ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি আমার শাশুড়ির কাছে। অনেক দূর, আন্দিজ পাহাড়ে।'

'তা পাহাড়ে হাওয়ায় সুফলই হবে'—বললেন সালভাতর।

জেলর কিন্তু চলে গেলেন না। দরজার দিকে একবার তাকিয়ে সালভাতরের কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বললে : 'প্রফেসর, আমার স্ত্রীর জীবন বাঁচানোর জন্যে আমি আপনার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ। ওকে যে আমি কী ভালোবাসি...'

'ওর জন্যে কৃতজ্ঞতার কী আছে, ও তো আমার কর্তব্য।'

'আমি আপনার কাছে খুবই ঋণী'—বললে জেলর, 'শুধু তাই নয়, লেখাপড়া তেমন না থাকলেও কাগজ আমি পড়ি, জানি আপনার মূল্য। এমন লোককে চোর-ডাকুদের সঙ্গে জেলে আটকে রাখা হবে, এ সহ্য করা যায় না।'

'আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা বোধ হয়'—হেসে বললেন সালভাতর, 'উন্মাদ হিশেবে আমায় স্যানাটোরিয়মে রাখার ব্যবস্থা পাকা করে এনেছে।'

'জেলখানার স্যানাটোরিয়ম—সে-ও তো জেল'—আপত্তি জানাল জেলর, 'বরং আরো খারাপ। ডাকুর বদলে থাকবেন পাগলদের মধ্যে। পাগলদের মধ্যে সালভাতর! না, না, এ চলে না!'

গলার স্বর প্রায় ফিসফিসানিতে নামিয়ে এনে জেলর বলল :

'আমি সব ভেবে দেখেছি। বাড়ির লোকদের যে পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলাম, সেটা খামোকা নয়। এবার আপনার পালাবার ব্যবস্থা করে নিজে পালিয়ে যাব। অভাবের জ্বালায় এই চাকরি নিতে হয়েছে, কিন্তু এ কাজ আমি ঘেন্না করি। আমায় ওরা খুঁজে পাবে না, আর আপনি...আপনি দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, আরো একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছি'—একটু দ্বিধার পর বললে সে, 'আমার চাকরিগত গোপন কথা, রাষ্ট্রীয় গোপন কথা একটা ফাঁস করছি...'

'ইচ্ছে হলে ফাঁস না-ও করতে পারেন'—বললেন সালভাতর।

'হ্যাঁ, কিন্তু...আমি আর পারছি না, যে ভয়ঙ্কর হুকুম এসেছে তা পালন করতে আমি অক্ষম। সারা জীবন আমি তাহলে বিবেকের দংশনে মরব। কথাটা ফাঁস করে দিয়ে আমি এ দংশন এড়াতে চাই। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন আর ওরা...ওপরওয়ালাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকার কিছুই নেই, আর ওরা কিনা আমায় ঠেলছে অপরাধের মধ্যে।'

'বটে?' সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলেন সালভাতর।

'হ্যাঁ, আমি জানতে পেরেছি যে ইকথিয়াস্তরকে বালতাজার বা জুরিতা, কারো হাতেই দেওয়া হবে না, যদিও জুরিতা হুকুমনামাটা পেয়ে গেছে। কিন্তু যতই ঘুস দিক, জুরিতাও তাকে পাবে না, কেননা...ইকথিয়াস্তরকে মেরে ফেলা হবে বলে ওরা ঠিক করেছেন।'

সামান্য নড়ে উঠলেন সালভাতর :

'বটে! বলে যান!'

'হ্যাঁ, ইকথিয়াস্তরকে খুন করা হবে—এর জন্যে সবচেয়ে বেশি জিদ ধরেছে বিশপ, যদিও 'খুন' কথাটা সে একবারও উচ্চারণ করে নি। আমাকে বিষ পাঠিয়ে দিয়েছে, সম্ভবত পটাসিয়াম সায়ানাইড। আজ রাতে ইকথিয়াস্তরের চৌবাচ্চার জলে ওটা আমার মিশিয়ে দেবার কথা। জেলের ডাক্তারও ওদের হাতে। সে রায় দেবে যে আপনি ইকথিয়াস্তরকে উভচরে পরিণত করার জন্যে যে অপারেশন করেছিলেন, তার ফলেই ও মারা গেছে। এ-হুকুম আমি যদি না মানি, আমায় খুবই দুর্ভোগ সইতে হবে। অথচ ঘর-সংসার রয়েছে আমার...তারপর আমাকেও খুন করবে ওরা, ফলে ঘটনাটা আর কেউ জানতে পারবে না। আমি যে ওদের হাতে। অতীতে একটা অপরাধ করে বসেছিলাম...তেমন গুরুতর কিছু নয়—প্রায় দৈবাৎ...যাই হোক, আমি ঠিক করেছি পালাব, আর পালাবার সব ব্যবস্থাও তৈরি করে রেখেছি। ইকথিয়াস্তরকে খুন করতে আমি পারব না, ও আমি চাই না। আপনি, ইকথিয়াস্তর, এত অল্প সময়ের মধ্যে দু'জনকেই বাঁচানো খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। কিন্তু একলা আপনাকে বাঁচাতে আমি পারি। সব আমি ভেবে দেখেছি, ইকথিয়াস্তরের জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আপনার জীবন আরো মূল্যবান। আপনার যা বিদ্যা, তাতে আপনি নতুন ইকথিয়াস্তর গড়তে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় সালভাতর সৃষ্টি করার মতো কেউ নেই।'

সালভাতর জেলরের কাছে এসে তার করমর্দন করে বললেন :

'ধন্যবাদ আপনাকে, কিন্তু নিজের জন্যে আপনার এই আত্মত্যাগ গ্রহণে আমি অক্ষম। আপনি ধরা পড়তে পারেন।'

'কোনো আত্মত্যাগই এতে নেই, আমি সব ভেবে দেখেছি।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান! আমার নিজের জন্যে আপনার এ আত্মত্যাগ আমি নিতে পারি না। কিন্তু ইকথিয়ান্ডরকে যদি বাঁচাতে পারেন, তাতে আমি বরং বেশি উপকৃত হব। আমার স্বাস্থ্য আছে, শক্তি আছে, বন্ধুর অভাব আমার কোথাও হবে না, তাঁরা আমার মুক্তিলাভে সাহায্য করবেন। কিন্তু ইকথিয়ান্ডরকে খালাস করা দরকার অবিলম্বে।'

'বেশ, আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য'—বলল জেলর।

ও বেরিয়ে যেতে আপন মনে হেসে সালভাতর বললেন :

'এই ভালো। বিবাদের আপেলটি যেন কারো হাতেই না পড়ে।'

কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন সালভাতর, ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আহা বেচারি, বেচারি!' তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে কী যেন লিখে, এসে ধাক্কা দিলেন দরজায় :

'জেলরকে একটু ডেকে দিন।'

জেলর আসতে সালভাতর বললেন :

'আরো একটা অনুরোধ। ইকথিয়ান্ডরের সঙ্গে আমার একবার শেষ দেখার ব্যবস্থা করতে পারেন না?'

'ওতে কোনো অসুবিধা হবে না। ওপরওয়ালারা কেউ নেই। গোটা জেলখানা আমাদের হাতে।'

'চমৎকার। আরো একটা অনুরোধ।'

'আজ্ঞা করুন।'

'ইকথিয়ান্ডরকে মুক্ত করে আপনি আমার জন্যে অনেক কিছুই করছেন।'

'কিন্তু প্রফেসর, আপনি যে আমার অত উপকার করলেন...'

'ধরা যাক, আমাদের শোধবোধ হয়ে গেল'—বাধা দিলেন সালভাতর, 'কিন্তু আপনার পরিবারকে আমি সাহায্য করতে চাই এবং পারি, এই নিন চিরকুট। এখানে শুধু ঠিকানাটা আছে আর আছে একটা অক্ষর—'এস্'—মানে সালভাতর। এই ঠিকানায় যাবেন, লোকটা বিশ্বাসী। আপনার যদি সাময়িকভাবে লুকিয়ে থাকার জায়গা কি টাকার দরকার হয়...'

'কিন্তু...'

'কোনো কিন্তু-টিন্তু নয়। এবার তাড়াতাড়ি আমায় ইকথিয়ান্ডরের কাছে নিয়ে যান।'

কুঠরিতে সালভাতরকে ঢুকতে দেখে অবাক হল ইকথিয়ান্ডর। এবারকার মতো এমন বিষণ্ন আর স্নেহাতুর তাঁকে সে আগে কখনো দেখে নি।

সালভাতর বললেন, 'ইকথিয়ান্ডর, বাছা আমার, যা ভেবেছিলাম তার আগেই আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে, এবং সম্ভবত অনেক দিনের জন্যে। তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি। এখানে তোমার হাজারটা বিপদ...এখানে থাকলে তুমি মারা পড়বে, বড়ো জোর হবে ঐ জুরিতা বা অন্য কোনো পাষণ্ডের বন্দি।'

'আর তোমার কী হবে, বাবা?'

'আদালত অবশ্যই আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে জেলে পাঠাবে, বছর দুয়েক, বেশিও হতে পারে, কয়েদ থাকব। আর যতদিন আমি জেলে থাকছি, ততদিন তোমায় থাকতে হবে নিরাপদ কোনো জায়গায়, এবং এখান থেকে যথাসম্ভব দূরে। তেমন জায়গা আছে, কিন্তু এখান থেকে খুবই দূরে, দক্ষিণ আমেরিকার উল্টো দিকে, পশ্চিমে, প্রশান্ত মহাসাগরের তুয়ামতু বা নিম্ন দ্বীপপুঞ্জের একটিতে। সেখানে পৌঁছনো তোমার পক্ষে সহজ হবে না, কিন্তু এখানে বা রিও-দে-লা-প্লাতা উপসাগরের থাকলে যত বিপদ তোমায় ছেঁকে ধরবে, তার তুলনায় পথের কষ্টটা সামান্য। এখানে ধূর্ত দুশমনের ফাঁদ আর জাল এড়ানোর চেয়ে ওখানে যাওয়াই সহজ।

'এবার যাবে কীভাবে? উত্তর অথবা দক্ষিণ যে কোনো দিক দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে রওনা দেওয়া যায় পশ্চিমে। দুটো পথেরই কিছু কিছু সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। উত্তরের পথটা কিছুটা লম্বা। তাছাড়া এ পথে অ্যাটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পড়তে হলে যেতে হবে পানামা খালের ভেতর দিয়ে। তাতে লকগেটগুলোর কাছে ধরা পড়ে যাবার বিপদ আছে, কিংবা একটু অসতর্ক হলে পিষে যেতে পারো জাহাজে। খালটা তেমন চওড়াও নয়, গভীরও নয়, খুব বেশি হলে একানব্বই মিটার চওড়া, সাড়ে বারো মিটার গভীর, হালের ভারী জাহাজগুলো প্রায় তাদের তলা ছেঁচড়ে যায়।

'তবে এ পথটার সুবিধা এই যে জলটা উষ্ণ। তাছাড়া পানামা থেকে পশ্চিমে যাবার বড়ো রুট আছে তিনটে : দুটো গেছে নিউজিল্যান্ডে, আরেকটা ফিজি দ্বীপে। মাঝের রুটটা ধরে জাহাজের পেছু পেছু, ভালো হয় জাহাজ আঁকড়ে ধরে চলে গেলে প্রায় গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। অন্তত নিউজিল্যান্ডের দুটো পথই গেছে তুয়ামতু দ্বীপপুঞ্জের এলাকায়। প্রয়োজন হবে শুধু একটু উত্তরের দিকে উজিয়ে যাওয়া।

'দক্ষিণ দিক ঘুর গেলে পথটা লম্বায় কম হবে, কিন্তু তোমায় সাঁতরাতে হবে ঠাণ্ডা জলে, ভাসন্ত বরফের সীমা ঘেঁষে, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ বিন্দু আগুনে মাটিতে হর্ন অন্তরীপ ঘুরে যাবার সময়। আর মাগেল্লান প্রণালীর কথা ধরলে সেটা অসম্ভব উত্তাল। জাহাজের পক্ষে ওটা যতটা বিপজ্জনক, তোমার পক্ষে ততটা না হলেও বিপজ্জনক বৈকি। পাল-তোলা জাহাজ ওখানে অনেক কবর নিয়েছে। পুব দিকে ওটা চওড়া, কিন্তু পশ্চিমে সরু, পাথরে আর ছোট ছোট দ্বীপে ভরা। জোর পশ্চিমী হাওয়ায় ঢেউ ছোটে পুবের দিকে, তার মানে তোমার মুখোমুখি। এখানকার ঘূর্ণিগুলোর জলের তলেও তুমি ঘায়েল হয়ে যেতে পারো।

'তাই আমার পরামর্শ, মাগেল্লান প্রণালী দিয়ে না গিয়ে, একটু লম্বা হলেও বরং হর্ন অন্তরীপ ঘুরে যাওয়াই ভালো। মহাসাগরে জল ঠাণ্ডা হতে থাকবে ধীরে ধীরে, তরে আমার ধারণা ওটা তোমার সয়ে যাবে। অসুখে পড়বে না। খাদ্য আর পানীয় নিয়ে ভাবনা নেই, সব সময়ই তা পাবে হাতের কাছে, তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই তো তুমি সামুদ্রিক জল খেতে অভ্যস্ত।

'হর্ন অন্তরীপ থেকে তুয়ামতু দ্বীপপুঞ্জে যাবার পথটা ঠিক করা এখানে পানামার চেয়ে কঠিন। এখান থেকে উত্তরে যাবার বড়ো বড়ো জাহাজ চলার পথ বিশেষ নেই। সঠিক অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমা তোমায় বলে দেব। তোমার জন্যে একটা বিশেষ যন্ত্র বানিয়ে রেখেছি, তা দিয়ে নিজের অবস্থান তুমি ঠিক করে নিতে পারবে। কিন্তু যন্ত্রটা তোমার পক্ষে বোধ হয় খানিকটা বোঝা হবে, অসুবিধা ঘটাবে চলাচলের...'

'লিডিঙকে সঙ্গে নেব। বোঝাটা ওই বইবে। লিডিঙকে কি আর ছেড়ে যেতে পারি। নিশ্চয় খুব মনমরা হয়ে আছে আমায় না দেখে।'

'কে কার জন্যে বেশি মনমরা বলা কঠিন'—ফের হাসলেন সালভাতর। 'বেশ লিডিঙকে নিও। ভালোই হবে। পৌঁছবে তুয়ামতু দ্বীপপুঞ্জ। সেখানে খুঁজে বার করতে হবে একটা একটেরে প্রবাল দ্বীপ। দ্বীপটার চিহ্ন হিশেবে দেখবে একটা লম্বা মাস্তুল, আর মাস্তুলের ওপর হাওয়াই মোরগ হিশেবে মস্ত একটা মাছ। চিহ্নটা মনে রাখা কঠিন নয়। খুঁজে বার করতে এক দুই তিন মাস লাগলেও ভাবনা নেই, জল ওখানে উষ্ণ, ঝিনুকও অনেক।'

ইকথিয়ান্ডরকে কথায় বাধা না দিয়ে, ধৈর্য ধরে শুনে যাবার শিক্ষা দিয়েছিলেন সালভাতর। কিন্তু সালভাতর এই পর্যন্ত আসতেই ইকথিয়ান্ডর আর পারলে না, জিজ্ঞেস করলে :

'কিন্তু দ্বীপটায় গিয়ে আমি পাব কী?'

'বন্ধু পাবে। বিশ্বস্ত বন্ধু। পাবে তাদের যত্ন, ভালোবাসা'—বললেন সালভাতর, 'ওখানে থাকেন আমার পুরনো বন্ধু, ফরাসি বৈজ্ঞানিক আরমাঁ ভিলবুয়া, বিখ্যাত মহাসাগরবিদ। বহু বছর আগে যখন আমি ইউরোপে ছিলাম, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ও সৌহার্দ্য হয়। অতি চিত্তাকর্ষক লোক ইনি, কিন্তু এখন সে কাহিনী বলার সময় নেই। আশা করি তুমি নিজেই ওঁর সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারবে কেন এই প্রশান্ত মহাসাগরের নিঃসঙ্গ প্রবাল দ্বীপে এসে উঠেছেন। তবে নিজে উনি নিঃসঙ্গ নন,সঙ্গে আছেন তাঁর অতি সহৃদয়া স্ত্রী এবং ছেলে আর মেয়ে। মেয়েটি হয় ওই দ্বীপেই, এখন তার বয়স হওয়ার কথা বছর সতের, ছেলেটির পঁচিশ।

'আমার চিঠি থেকে ওঁরা তোমার কথা সব জানেন, কোনো সন্দেহ নেই যে তোমায় ওঁরা আপন লোকের মতোই নেবেন...' থেমে গেলেন সালভাতর, 'অবিশ্যি এখন তোমায় বেশিরভাগই কাটাতে হবে জলে। তবে দেখাসাক্ষাৎ আলাপের জন্যে দিনে কয়েক ঘণ্টা করে ডাঙায় থাকতে পারো। হয়তো ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য ফিরবে তোমার। আগের মতোই আবার অনেকক্ষণ ডাঙায় কাটাতে পারবে।

'আরমাঁ ভিলবুয়া হবেন তোমার পিতৃতুল্য। মহাসাগর নিয়ে তাঁর কাজে তুমিও তাঁকে অনেক সাহায্য করতে পারবে। সাগর আর তার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে, এর মধ্যে তুমি যা জানো তা জনদশেক প্রফেসরও জানে না।' বাঁকা হাসলেন সালভাতর, 'উদ্ভট ওই এক্সপার্টরা তোমায় যত ছকবাঁধা প্রশ্ন করেছিল, কী তারিখ, কী বার, কী মাস। তুমি তার জবাব দিতে পারো নি স্রেফ এই জন্যে যে ও জিনিসগুলোয় তোমার কিছু এসে যায় না। অথচ ওরা যদি তোমায় প্রশ্ন করত লা-প্লাতা উপসাগর আর আশেপাশের সমুদ্রের তলস্রোত, জলের লবণাক্ততা, তাপমাত্রা নিয়ে, তাহলে তোমার জবাবগুলো দিয়েই একটা পুরো গবেষণা গ্রন্থ হয়ে যেত। আর আরমাঁ ভিলবুয়ার মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক যদি তোমার ডুবো অভিযানগুলো পরিচালনা করেন, তাহলে আরো কত জিনিসই-না তুমি জানতে পারবে, জানাবে লোকদের। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, দু'জনে মিলে তোমরা মহাসাগরবিদ্যায় এমন কিছু দিয়ে যেতে পারবে, যাতে যুগান্তর ঘটবে তাতে, সচকিত হয়ে উঠবে সারা বিশ্ব। তোমার নাম থাকবে আরমাঁ ভিলবুয়ার নামে সঙ্গে একত্রে—আমি তো ওঁকে চিনি, তিনি তা দাবি করবেন। বিজ্ঞানের সেবা করবে তুমি, সেই সঙ্গে গোটা মানবজাতির।

'কিন্তু এখানে থাকলে তোমায় জোর করে খাটানো হবে অজ্ঞ, অর্থগৃধ্নু লোকদের হীন স্বার্থে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, লেগুনের নির্মল স্বচ্ছ জলে আর আরমাঁ ভিলবুয়ার পরিবারে একটা শান্ত আশ্রয় আর সুখ জুটবে তোমার।

'আরো একটা পরামর্শ। যেই তুমি সমুদ্রে ছাড়া পাবে—আর সেটা হতে পারে এমনকি আজ রাত্রিতেই—অমনি জলের তলে টানেলটা দিয়ে চলে যাবে বাড়িতে, (বাড়িতে এখন বিশ্বস্ত বলতে কেবল জিম), সেখানে ওই অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা নির্ণয়ের যন্ত্রটা এবং ছুরিটুরি যা দরকার নেবে, লিন্ডিঙকে খুঁজে বার করে রওনা দেবে সূর্য ওঠার আগেই।

'বিদায় ইকথিয়ান্ডর! না—না, বিদায় নয়, আসি।'

জীবনে এই প্রথম ইকথিয়ান্ডরকে আলিঙ্গন করে আবেগে চুমু খেলেন সালভাতর। তারপর হেসে ইকথিয়ান্ডরের পিঠে চাপড়ে বললেন :

'এমন খাসা ছোকরা, তার আবার ভাবনা কিসের!'

পলায়ন

বোতাম কারখানা থেকে সবে ফিরে খেতে বসেছে অল্‌সেন, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'কে?' ব্যাঘাত ঘটায় একটু বিরক্তভাবেই জিজ্ঞেস করল সে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল গুস্তিয়েরে।

'গুস্তিয়েরে! তুমি? কোত্থেকে?' হর্ষে বিস্ময়ে বলে উঠল অল্‌সেন, উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

গুস্তিয়েরে বলল, 'নমস্কার অল্‌সেন। না-না, খাওয়া বন্ধ করো না।' তারপর দরজায় ঠেস দিয়ে ঘোষণা করল :

'স্বামী-শাশুড়ির সঙ্গে আমি আর থাকতে পারছি না। জুরিতা...এমন স্পর্ধা—আমার গায়ে পর্যন্ত সে হাত তুলেছে। আমিও ছেড়ে এলাম ওকে। একেবারে ছেড়ে এসেছি।'

কথাটা শুনে খাওয়া থেমে গেল অল্‌সেনের। বলল :

'একেবারেই আশা করি নি। বসো, বসো। দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছ না যে। কিন্তু কী ব্যাপার? তুমি-না বলেছিলে, 'ঈশ্বর যা মিলিয়ে দিয়েছেন, মানুষ তা ভাঙতে পারে না।' ওসব কথা বাদ দেব? ভালোই তো! আনন্দের কথা। উঠেছ বাবার কাছে?'

'বাবা কিছুই জানে না। ওখানে গেলে জুরিতা আমায় সহজেই খুঁজে বার করে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। আমি উঠেছি আমার এক বান্ধবীর কাছে।'

'তা...এখন কী করবে তুমি?'

'কারখানায় ঢুকব। তোমায় বলতে এসেছি অলসেন, কারখানায় আমার একটা কাজ জুটিয়ে দাও—যে কোনো কাজ।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল অল্‌সেন।

'এখন এটা খুবই মুশকিল। চেষ্টা অবিশ্যি আমি করব'—তারপর একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু স্বামী কী বলবে?'

'তা আমি জানতেও চাই না।'

'কিন্তু বৌ কোথায় সেটা স্বামী তো জানতে চাইবে'—হেসে বলল অল্‌সেন 'ভুলে যেও না যে তুমি আছ—আর্জেন্টিনায়। জুরিতা তোমায় খুঁজে বার করবে, তখন...জানোই তো, তোমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না। আইন আর জনমত তারই দিকে।

কী ভাবল গুস্তিয়েরে, তারপর দৃঢ়ভাবে বলল, 'বেশ, তাহলে চলে যাব কানাডায়, আলাস্কায়...'

গ্রিনল্যান্ডে, উত্তর মেরুতে!' তারপর পরিহাস ছেড়ে অল্‌সেন গুরুত্ব দিয়েই বলল, 'তা সেটা ভেবে দেখা যাবে। এখানে থাকা তোমার পক্ষে নিরাপদ হবে না। আমি নিজেও অনেকদিন থেকে কোথাও চলে যাবার কথা ভাবছি। কেন যে এসেছিলাম এই লাতিন আমেরিকায়? দুঃখের কথা যে সেবার আমরা পালাতে পারলাম না। জুরিতা তোমায় হরণ

করলে, টিকিট টাকাকড়ি সব জলে গেল। এখন ইউরোপ যাবার ভাড়া নিশ্চয় তোমারও নেই, আমারও নেই, কিন্তু ইউরোপ আমাদের যেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। যদি আমরা—হ্যাঁ, আমরাই বলছি কেননা তুমি কোনো নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছনো পর্যন্ত আমি তোমায় ছাড়ব না—আমরা যদি অন্তত পাশের দেশ পারাগুয়েতে, ভালো হয় ব্রেজিলে পৌঁছতে পারি, তাহলেও জুরিতার পক্ষে তোমায় খুঁজে বার করা কঠিন হবে, আমরাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে পাড়ি দেবার জন্যে কিছু সময় পাব...জানো তো ডাক্তার সালভাতর আর ইকথিয়ান্ডর এখন জেলখানায়?'

'ইকথিয়ান্ডর? তাকে পাওয়া গেছে তাহলে? কিন্তু জেলখানায় কেন? ওর সঙ্গে দেখা করা যায়?' এক রাশ প্রশ্ন করল গুত্তিয়েরে।

'হ্যাঁ, ইকথিয়ান্ডর এখন জেলে, ফের সে জুরিতার গোলাম বনতে পারে। বিদ্‌ঘুটে এক মামলা, সালভাতর আর ইকথিয়ান্ডারের বিরুদ্ধে বিদ্‌ঘুটে সব নালিশ।'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! বাঁচানো যায় না ওকে?'

'আমি অনবরত তার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, ফল হয় নি। তবে হঠাৎ এক সহযোগী পেয়ে গেছি—স্বয়ং জেলর। আজ রাতেই ইকথিয়ান্ডরকে খালাস করতে হবে। এইমাত্র আমি দুটো চিরকুট পেয়েছি, একটা সালভাতর আর একটি জেলরের কাছে থেকে।'

'ইকথিয়ান্ডরকে দেখতে চাই আমি!' বলল গুত্তিয়েরে, 'যাব তোমার সঙ্গে?' অল্‌সেন কী ভাবল। তারপর বলল :

'উহুঁ, এসো না। তাছাড়া তোমার পক্ষেও ইকথিয়ান্ডরকে না দেখাই ভালো।'

'কেন?'

'কারণ, ইকথিয়ান্ডর অসুস্থ। মানুষ হিশেবে অসুস্থ, তবে মাছ হিশেবে সুস্থই।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ইকথিয়ান্ডার এখন আর বাতাসে নিশ্বাস নিতে বিশেষ পারে না। তোমায় দেখলে কী হবে বুঝতে পারছ তো? ওর পক্ষে, হয়তো তোমার পক্ষেও ব্যাপারটা খুবই কঠিন দাঁড়াবে। তোমার কাছে থাকতে চাইলেও আর ডাঙায় থাকলে ও একেবারেই মারা পড়বে।'

মাথা নিচু করল গুত্তিয়েরে। একটু ভেবে বলল :

'তা ঠিকই বলেছ...'

'ওর আর বাকি সব লোকের মাঝখানে এখন একটা অলঙ্ঘ্য বাধা—সমুদ্র। হতভাগ্য ইকথিয়ান্ডর। এখন থেকে জলই ওর একমাত্র আশ্রয়।'

'কিন্তু কী করে ও থাকবে সেখানে? মহাসাগরের মাছ আর সামুদ্রিক প্রাণীগুলোর মধ্যে একেবারে একলা একজন মানুষ?'

'জলরাজ্যে সে তো বেশ সুখীই ছিল, যতদিন-না...'

লাল হয়ে উঠল গুত্তিয়েরে।

'এখন অবিশ্যি সে ঠিক আগের মতো সুখী থাকবে না।'

'চুপ করো অল্‌সেন'—কাতর কণ্ঠে বলল গুত্তিয়েরে।

'তবে সময়ে সবই সেরে যায়। হয়তো আগের প্রশান্তিও সে ফিরে পাবে। সামুদ্রিক মাছ আর প্রাণীদের মধ্যেই দিন কাটিয়ে বুড়ো হবে, অবশ্য অকালেই হাঙরের পেটে যদি না যায়। আর মৃত্যু? মৃত্যু তো সর্বদাই একই।'

গাঢ় হয়ে উঠল গোধূলি, প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল ঘরখানা।

'এবার কিন্তু আমায় যেতে হয়'—উঠে দাঁড়িয়ে বলল অল্‌সেন। গুত্তিয়েরেও উঠে দাঁড়াল।

'দূর থেকে ও ওকে একবার দেখা যায় না?

'তা যাবে, তবে তুমি নিজে দেখা না দাও।'

'কথা দিচ্ছি, দেখা দেব না।'

ভিস্তিওয়ালার বেশ ধরে কালে-দে-করোনেল-ডিয়াস রাস্তা দিয়ে অল্‌সেন যখন গাড়ি হাঁকিয়ে ঢুকল জেলখানার আঙিনায়, তখন একেবারেই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

সেপাই হাঁক দিল :

'কে যায়?'

'দরিয়ার দানো'র জন্যে জল নিয়ে যাচ্ছি'—জেলর যা শিখিয়ে দিয়েছিল সেইভাবেই জবাব দিল অল্‌সেন।

সেপাইরা জানত সে জেলে আছে এক অসাধারণ কয়েদি 'দরিয়ার দানো', থাকে সে সমুদ্রের জলে ভরা চৌবাচ্চায়, অলবণাক্ত জল সে সইতে পারে না। মাঝে মাঝে তার জল বদলানো হয়, গাড়িতে করে মস্ত পিপে ভরে জল আসে তার জন্যে।

কোণের রান্নাঘরটা ঘুরে অল্‌সেন গাড়ি নিয়ে গেল আসল জেলখানা বাড়িটার কাছে, কর্মচারীদের ঢোকবার দরজাটার সামনে। জেলর আগেই সব ঠিক করে রেখেছিল। করিডোরে ও দরজায় যেসব প্রহরীরা থাকে, নানা ছুতোয় তাদের সরিয়ে দিয়েছিল সে। নির্বিঘ্নে জেলরের সঙ্গে বেরিয়ে এল ইকথিয়াণ্ডর।

জেলর বলল, 'নাও ঝট করে পিপেটায় ঢুকে পড়।'

ইকথিয়াণ্ডরও মোটেই দেরি করল না।

'চলে যাও এবার!'

লাগাম নাড়া দিল অল্‌সেন, জেলখানার আঙিনা থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে সুস্থে এগুতে লাগল আভেনিদা-দে-আলভেয়ার ধরে, রিতেরো রেলওয়ে স্টেশন, মাল স্টেশন পেরিয়ে।

অদূরে একটি রমণীর ছায়াও চলল তার পিছু পিছু।

অল্‌সেন যখন শহর ছাড়ল, তখন নিশুতি রাত। পথটা তীর বরাবর। বেশ হাওয়া উঠেছিল। পাথরে আছাড় খেয়ে সগর্জনে ভেঙে পড়ছে ঢেউ।

চারদিকে চেয়ে দেখল অল্‌সেন। রাস্তায় কেউ নেই। শুধু দূরে দেখা গেল দ্রুতগামী একটা মোটরের হেডলাইট। তাই একটু অপেক্ষা করল সে।

আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গর্জন করে শহরের দিকে চলে গেল মোটরটা, তারপর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এইবার!' অল্‌সেন ফিরে গুস্তিয়েরেকে ইঙ্গিত করলে যাতে সে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। তারপর পিপেয় টোকা দিয়ে বলল :

'বেরিয়ে এসো, পৌঁছে গেছি।'

পিপের ভেতর থেকে একটা মাথা বেরিয়ে এল :

চারদিকে চেয়ে দেখল ইকথিয়াণ্ডর, চট করে লাফিয়ে নামল মাটিতে।

'ধন্যবাদ অল্‌সেন'—ভেজা হাতে সজোরে পালোয়ানের করমর্দন করল সে।

হাঁপানির রুগীর মতো ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল সে।

'ধন্যবাদের কিছু নেই। বিদায়। সাবধান, তীরের কাছাকাছি এসো না। লোকজন থেকে দূরে থেকো, নইলে আবার হয়তো ধরা পড়ে যাবে।'

ইকথিয়াণ্ডরকে সালভাতর কী নির্দেশ দিয়েছেন সেটা অল্‌সেনও জানত না।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ'—হাঁপাতে হাঁপাতে বললে ইকথিয়াণ্ডর, 'আমি চলে যাব অনেক দূরে, নির্জন প্রবাল দ্বীপে, কোনো জাহাজই সেখানে যায় না। ধন্যবাদ অল্‌সেন।' বলে সে ছুটে গেল সমুদ্রের দিকে।

একেবারে ঢেউ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচাল :

'অল্‌সেন! অল্‌সেন! কখনো যদি গুত্তিয়েরের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে তাকে আমার অভিনন্দন জানিও, বলো যে তার কথা মনে রাখব চিরকাল।'

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বলল :

'বিদায় গুত্তিয়েরে!' এবং তলিয়ে গেল গভীরে।

পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে জবাব দিলে গুত্তিয়েরে, 'বিদায় ইকথিয়ান্ডর...'

ঝড় উঠল আরো জোরে, পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। উত্তাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র, সড়সড় করছে বালি, শব্দ উঠছে পাথরে।

গুত্তিয়েরের হাত ধরল অল্‌সেন, কোমল কণ্ঠে বলল :

'চলো যাই গুত্তিয়েরে।'

রাস্তায় উঠে এল তারা।

আরেকবার সমুদ্রের দিকে তাকাল গুত্তিয়েরে, তারপর অল্‌সেনের বাহুলগ্না হয়ে রওনা দিল শহরের দিকে।

কারাদণ্ডের মেয়াদ কাটিয়ে সলভাতর ফিরে আসেন। নিজের বাড়িতে, ফের বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে মন দেন। কোন একটা দূরযাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছে তিনি।

ক্রিস্টো এখনো তাঁর ওখানেই চাকরি করছে।

নতুন একটা জাহাজ কিনেছে জুরিতা, মুক্তো খুঁজে বেড়াচ্ছে কালিফোর্নিয়া উপসাগরে। আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো ধনী না হলেও ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার নালিশ করার কিছু নেই। ব্যারোমিটারের কাঁটার মতো তার মোচের প্রান্তদুটো সুদিনেরই জানানি দিচ্ছে।

বিবাহবিচ্ছেদ করে গুত্তিয়েরে বিয়ে করেছে অল্‌সেনকে। উঠে গেছে তারা নিউইয়র্কে, কাজ করে একটা ক্যানিং কারখানায়। লা-প্লাতা উপসাগরের উপকূলে 'দরিয়ার দানো'র কথা আর কারো মনে নেই।

শুধু মাঝে মাঝে গুমোট রাত্রির স্তব্ধতায় কোনো দুর্বোধ্য শব্দ শুনলে বুড়ো জেলেরা জোয়ানদের বলে :

'এইভাবেই শাঁখ বাজাত 'দরিয়ার দানো'। বলে যত কাহিনী ফাঁদে।

বুয়েনাস-আইরেসে ইকথিয়ান্ডরকে ভুলতে পারেনি কেবল একটি লোক।

শহরের সব ছেলেই চেনে এই আধখেপা বুড়ো নিঃস্ব রেড-ইন্ডিয়ানকে।

'ওই যাচ্ছে 'দরিয়ার দানো'র বাপ।'

কিন্তু রেড-ইন্ডিয়ানটি ছেলেদের কথায় কোনো কান দেয় না।

স্পেনীয় কাউকে দেখলেই বুড়ো মুখ ফিরিয়ে নেয়, থুতু ফেলে তার উদ্দেশে, সব অভিশাপ দেয় গজগজ করে।

তবে বুড়ো বালতাজারকে পুলিশ জ্বালায় না। পাগলামি ওর উদ্দাম নয়, ক্ষতি করে না কারো।

শুধু মাঝে মাঝে যখন ঝড় ওঠে সমুদ্রে, তখন অস্বাভাবিক উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে বুড়ো।

ছুটে যায় সে তখন সমুদ্রতীরে, ঢেউয়ের পরোয়া না করে দাঁড়ায় একটা পাথরের ওপর, আর ঝড় শান্ত না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাত কেবল ডাকে :

'ইকথিয়ান্ডর! ইকথিয়ান্ডর! ব্যাটা আমার!'

কিন্তু সমুদ্র তার রহস্য ফাঁস করে না।

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র